বরাক-কুশিয়ারার গল্প

বরাক-কুশিয়ারার গল্প

সম্পাদক

মিথিলেশ ভট্টাচার্য

barak-kushiarar galpa
edited by
Mithilesh Bhattacharjee

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রচ্ছদ ঃ শুভাশিস তলাপাত্র
মুখাবয়ব-এর পক্ষে কথাকলি চৌধুরী কর্তৃক অনিল লিথোগ্রাফিং কোং, ১৩ শশীভূষণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত এবং কৃষ্ণনগর, আগরতলা ও পি-১১১, কালিপদ মুখার্জী রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৮ থেকে একযোগে তৎকর্তৃক প্রকাশিত
দাম ঃ ২০০ টাকা

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্র কা শ ক . ক থ ন

বাংলা ছোটগল্পের ধারাটি বর্তমান সময়ে কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেরই জানা। বরাক বা কুশিয়ারার আঁকাবাঁকা গতিপথের মতোই পরতে-পরতে বৈচিত্র্য আর বিস্ময়কর নবতর যাপন-চর্যার ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছেন বাঙালি লেখকরা। বৃহত্তর পাঠক সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই এইসব লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন না, মূলত প্রকাশনার অপ্রতুলতার কারণে।

মুখাবয়ব-এর পক্ষ থেকে এই দায় আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি। কাছাড় অঞ্চলের বাংলা ছোটগল্পের এই সংকলনটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। আর এই কাজে সম্পাদক মিথিলেশ ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক তপোধীর ভট্টাচার্য এবং কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ-র কাছে আমাদের অপরিসীম ঋণ স্বীকার করছি।

আমরা বিশ্বাস করি পাঠকদের পাঠতৃপ্তির পাশাপাশি চিন্তার খোরাক যোগাবে বরাক-কুশিয়ারার গল্প।

কথাকলি চৌধুরী

বরাক-কুশিয়ারার সম্পাদনা করতে গিয়ে

বরাক। বড়বক্র। কলংমা। একটি নদীর কত নাম। এই নদীটির উল্লেখ আছে মহাভারতে। বরাক নদীবিধৌত বরাক উপত্যকা। একই নদী মধ্যগতিতে দু'ভাগ হয়ে নাম ধরেছে কুশিয়ারা-সুরমা। কুশিয়ারা চলে গেছে করিমগঞ্জের বুক চিরে অতীতের পূর্ব পাকিস্তান অধুনার বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগরে। শুধু শুধু উপত্যকা বেয়ে বইছে না বরাক নদী, এই উপত্যকার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই নদী। 'মমতাবিহীন কালস্রোতে/ বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে/ নির্বাসিতা ... . সুন্দরী শ্রীভূমি'-র মতো অতীত গৌরব সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সমাজ ওই নদীর মতো বয়ে চলেছে বর্তমান বরাক-কুশিয়ারা উপত্যকা.

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা এই বিস্তীর্ণ বরাক উপত্যকায় কতটুকু গভীরে প্রোথিত তা ১৯৬১ ইংরেজির ১৯ মে-র রক্তঝরা আন্দোলনই প্রমাণ করে। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে উপত্যকার আপামর বাংলাভাষী নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাঁকে পরম শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিল: আমাদের প্রাণের যত সুর বাঁধা সবকিছুই যে রবীন্দ্রনাথের দান! কী গভীরভাবে তাঁকে আমরা আঁকড়ে আছি প্রতিটি পলে তা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই নিরন্তর প্রমাণ করে চলেছে।

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রধান মুখপত্র, 'মুখাবয়ব' বরাক-কুশিয়ারার গল্প-সংকলন প্রকাশের যে সাধু উদ্যোগ নিয়েছেন সে পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান কথালাপ শুরু।

এ'কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাসাহিত্যের সবচে' বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে বাংলা ছোটগল্প। একসময় পশ্চিমবঙ্গই ছিল সার্থক বাংলা ছোটগল্প রচনার অবিসংবাদি কেন্দ্র। কিন্তু সময় পাল্টানোর সাথে সাথে বাংলা ছোটগল্প রচনা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই না, ভারতবর্ষের ভিন্ন বহুভাষী অঞ্চলে অত্যন্ত সার্থকভাবে এগিয়ে চলেছে। বিশেষত, উত্তর পূর্ব ভারতের (ত্রিপুরা, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র) বাংলা ছোটগল্প চর্চা খুবই সুসংহত, ব্যাপক ও ঋদ্ধ।

আমাদের অঞ্চলে, অর্থাৎ বরাক-কুশিয়ারা উপত্যকায় দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে সঠিক অর্থে সাহিত্য আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এর পূর্বে অবিভক্ত বরাক-সুরমা উপত্যকায় প্রান্তিক বাঙালির সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল শ্রীহট্ট বা সিলেট। দেশবিভাগের পর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বরাক-কুশিয়ারা উপত্যকার বাস্তুহীন মানুষের পায়ের তলায় একটুকরো শক্ত মাটি খুঁজে নেবার তাগিদই হয়ে উঠেছিল সে'সময়ের প্রধানতম লড়াই। সেই লড়াইয়ের অন্তঃস্বর উপত্যকার বাংলা কবিতায় প্রবলভাবে উঠে এলো না, কবিরা রচনা করলেন শুধু নিসর্গ ও ব্যক্তিসত্বার উত্থান-পতনের পদাবলী। আর যারা গদ্য/গল্পের কারবারী তাদের চারপাশে অজস্র জীবন ভাঙা-গড়ার অস্থির ও দুঃখময় ইতিবৃত্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও কোনো সুষ্ঠু প্রকাশনার সুযোগ না থাকায় তাও যেন দীর্ঘকাল বন্দী হয়ে থাকলো তাদের মনের বদ্ধকুঠুরিতে। তাই এই উপত্যকার কথাশিল্পের পরম্পরা গড়ে ওঠার জন্যে আরও অনেকদিন সময় ব্যয়িত হয়ে গেল—বরাক-কুশিয়ারায় বয়ে গেল অগাধ অগাধ জলরাশি।

কিন্তু সময় ও ইতিহাস দুটোর একটাও তো থেমে থাকে না। এই উপত্যকায় তার ব্যতিক্রম হল না। শিলচর সহ গোটা বরাক-কুশিয়ারার গদ্য/গল্প আন্দোলনের ভগীরথ হয়ে আবির্ভূত হলেন 'অনিশ' সম্পাদক-গল্পকার শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী। ৬১-র ভাষা আন্দোলনের ৮ বছর পর সঠিক অর্থেই যেন দানা বাঁধতে শুরু করল এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার গদ্যচর্চার বলিষ্ঠ ইতিহাস। শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর শ্রম ও তিতিক্ষায় তৈরি হল গদ্যচর্চার মসৃণ পথ। এবং সে পথ বেয়ে গদ্য/গল্পের জগৎ বর্তমান সময়ে এক বিস্ময় ও সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হয়েছে বৃহত্তর পাঠক সমাজের দরবারে। 'অনিশ'-এর পর পরই 'শতক্রতু' হয়ে উঠল বরাক কুশিয়ারাব গদ্য/গল্প আন্দোলনের অপরিহার্য মুখপত্র। সে আন্দোলনকে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিলেন বর্তমান সময়ের এক প্রধান চিন্তাবিদ, কবি-প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য। মূলত তাঁরই নেতৃত্বে একঝাঁক তরুণ গদ্য/গল্পের শাণিত পসরা নিয়ে হাজির হলেন সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বল প্রাঙ্গণে—কখনও পেছন ফিরে না-তাকিয়ে যারা অবিরামভাবে ঋদ্ধ করে চলেছেন বাংলা গদ্য সাহিত্যচর্চার এই তৃতীয় ভূখণ্ডকে।

ইতিমধ্যে বরাক উপত্যকার নিজস্ব ভুবন থেকে বেশ কয়েকটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়ে গেছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের এক বা একাধিক গল্প সংকলন ও কয়েকটি উপন্যাসও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত কিছুই বরাক উপত্যকার গদ্য সাহিত্যচর্চার ব্যাপকতা প্রমাণ করে।

বরাক-কুশিয়ারা গল্প সংকলনে উপত্যকার প্রতিষ্ঠিত সব গল্পকারের গল্পই আমরা অন্তর্ভূক্ত

করেছি। প্রবীনতম গল্পকার শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী থেকে শুরু করে তরুণতম গল্পকার রাহুল দাস সামিল হয়েছেন উক্ত সংকলনে। আরেকটি কথা, আমরা সেই সব প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের গল্পই সংকলনভূক্ত করেছি যারা দীর্ঘদিন থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গল্প লিখে যাচ্ছেন।

বরাক কুশিয়ারা গল্প সংকলন প্রকাশ করার যে বৃহৎ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন 'মুখাবয়ব' কর্তৃপক্ষ, উত্তর পূর্বের অন্যতম বিশিষ্ট গল্পকার দেবব্রত দেব, তাকে প্রশংসা ও ধন্যবাদের গন্ডীর ভিতর বদ্ধ করতে চাই না। আমি আন্তরিকভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য

১০. ০২. ১১

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা

সমকালীন অসমীয়া গল্প

শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ . ল্প . ক্র . ম

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

মানুষ মানুষের জন্য

লুইত অর্থাৎ লোহিত তার ঘূর্ণি স্রোত নিয়ে নিজের খেলায় নিজেই মত্ত। ওরা বসেছিল এপারের ঢালু তীরে গাছের ছায়ায়। দূরে টিলা ও গাছ-গাছালির সবুজিমায় উমানন্দ ভৈরবের মন্দির নিয়ে দ্বীপটি কাছিমের পিঠের মত নদীর উপর ভেসে আছে। আর তারই দু'পাশে প্রবল ঘূর্ণি সৃষ্টি করে ছুটছে লুইত তথা ব্রহ্মপুত্র।

রূপালি অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে আছে সেদিকে। হীরেন দাঁতে ঘাস কাটছিল। মাঝে মধ্যে রূপালির দিকে তাকিয়ে ময়ূরী দেখছে। ময়ূরপুচ্ছ রঙের শাড়ি ওর ফর্সা গায়ে অপূর্ব খোলতাই হয়েছে। হীরেনের এ মুহূর্তে কোনও কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে না। চেতনার গভীরে এক ভাললাগার অনুভূতিতে ও নিবিড় আবিষ্ট।

রাস্তার পাশের দেয়ালটি ওদের সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। নিস্তব্ধ দুপুরের এমন মুহূর্ত ওদের প্রথম নয়। হীরেন নিজের অফিস ছেড়ে কখনো-সখনো বেরিয়ে পড়ে। রূপালির হয়ত তখন সবে ডিউটি শুরু হয়েছে। এ সব সময় রূপালি ওকে ধমকায় —কিয় ফোনত মোক সুধিব নোয়ারা নে? (কেন ফোনে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পার না?)

হীনের তখন না শোনার ভান করে। নয়ত রূপালির সহকর্মীকে বলে—কাইগুলি একটু দেখবেন। ওকে একটু চা খাইয়ে আনছি।

অগত্যা রাগত চোখে রূপালিকে বেরোতে হয়। সহকর্মী বান্ধবীর টিপ্পনিতে কখনও বা গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে।

আজ অবশ্য কারও অফিস ছিল না। দু'জনেই দু'জনের উদ্দেশে বেরিয়েছিল। ফলে রাস্তায় দেখা।

জাজেস ফিল্ডকে পাশে রেখে দু'জনে বড় বড় শালগাছের ছায়ায় ঢাকা পথটা দিয়ে পোস্ট অফিসকে পাশ কাটিয়ে হাঁটছিল আর হাঁটছিল। কিছুদূর এগোবার পর পাশের দেয়ালে এক দরজা পেয়ে নদীর ধারে চলে এসেছে।

অনেকক্ষণ হল বসে আছে চুপচাপ। হীরেন এক ডাবওয়ালাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকে। লোকটি কাছে এসে হাতের দা দিয়ে সুন্দর করে মুখটা কেটে দুটো ডাব এগিয়ে দেয়। এরপর প্লাস্টিকের দুটো নল বাড়িয়ে ধরে।

—কিমান দাম হেঁ? (কত দাম?)

—দেড়টকামান দিয়ক আরু— লোকটি হেসেই উত্তর দেয়। লোকটি চলে যেতেই রূপালি বলে—তোমার মত মানুষ হয় না। ঠিক যা চাইছিলাম—'

একলা পেলে হীরেনের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে রূপালি। শুধু 'স' গুলোর উচ্চারণ এখনও পুরোপুরি রপ্ত হয়নি, না হলে হীরেনের ভাষায়—ফ্ললেস।

রূপালির কথার জের টেনে হীরেন বলে—তাহলে একটা টফি দাও না।

—অ্যাই বেয়া লরা—টফি খালে দাঁতর বেমার হব। (অ্যাই খারাপ ছেলে টফি খেলে দাঁতের রোগ হবে)

—কেন, তোমার পায়োরিয়া আছে কোনোদিন বলনি তো।

এবারে রূপালি রেগে যায়—ভাল হবে না বলছি—'

ঘাট হয়েছে বাবা—এই নাক মলছি। — তোমার এই দুধসাদা দাঁতের ওপর 'ইমান মরম' আমার মনেই ছিল না। ঠিক আছে, এখন আর টফি-ঠফি খাব না।

হীরেনের ভাবভঙ্গিতে মুচকি হাসে রূপালি, সঙ্গে সঙ্গে গালে টোল পড়ে।

ও ভাবে গালে টোল ফেলে হাসলে আমি টফি খাওয়ার লোভ সামলাতে পারবো না বলছি।

রূপালি তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এভাবেই সমস্ত দুপুর খুনসুটিতে কাটে ওদের।

পড়ন্ত রোদ তখন লুইতের জলকে লোহিত করে তুলছে। হীরেন তাগাদা দেয়—ওঠ, চল ইভনিং শো'তে।

রূপালি গা করে না। হীরেনের জোরাজুরিতে বলে—দেউতা (বাবা) ভাবিব ন হয়।

—কেন, বাবাকে বলনি যে আমার খোঁজে বেরুচ্ছ?

—আহা, কী মহাপুরুষ ওনার খোঁজে বেরুতে হবে!

—মহাপুরুষ না হই তোমার পুরুষ তো বটে এবং ভাবী গিরিযেক (স্বামী)—গিরি এক বুঝেছ? তোমার পর্বত আমিই।

—বুঝেছি গিরিমহারাজ, এখন চল।

—কেন, আর একটু বসি না—কেমন 'কোমলিয়া' অন্ধকার নেমে আসছে।

—কিয় এন্ধারত জেঁউতি হই জোনাক জ্বলিব নেকি! (আঁধারে প্রদীপ হয়ে জোৎস্না হয়ে উঠবে নাকি!)

—আমার আঁধারের আলো তো তুমি নাম যার রূপালি।

—খগেন মোহন্তও কিন্তু ওভাবেই বলেছিল।

—আহা, এই সুন্দর সন্ধ্যায় ও সমস্ত খগ কেন বাবা। সে তো কবেই বিদেয় নিয়েছে।

—বিদায় নিয়েছে ঠিক কিন্তু মনে হচ্ছে বিরাট আকারে ফিরে আসছে।

—কী ব্যাপার বল তো?

—কেন 'জয় আই অসম' কলরব শোননি?

—কেন শুনবো না, মা আসাম তো আমারও।

—নহয় হীরেন ঘোষ, আই অসম রূপালি বরার, খগেন মোহন্তর—হীরেন ঘোষ আরু দীপেন বোসর নহয়।

—ও, তাই বলছে বুঝি ওরা। বলুক-বলুক—কথায় কী আসে যায়।

—না হীরেন, এবার খুব সহজে থামবে বলে মনে হয় না। স্কুল-কলেজ-অফিসে ওরা সংগঠন গড়ে তুলছে।

—তুলুক। এখন চল ওঠা যাক। তা না হলে তোমার 'দেউতা' সত্যিই রেগে যাবেন। আর দেবতা বলে কথা!

রূপালিকে পৌঁছে দিয়ে হীরেন রিক্সা নেয়।

ক'দিন ধরেই চোখে পড়ছে সবাই কেমন যেন সিরিয়াস। পত্রিকাগুলোও একই সুরে গাইছে। ব্রহ্মপুত্রে ঢল নামতে দেরি নেই। ওর মনটা কেমন যেন বিষাদে ঢাকে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই লালকালিতে লেখা পোস্টারে চোখদুটো সেঁটে যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে—পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। বক্তব্য সেই একই—বহিরাগত তাড়াও। মুখে ব্রাশ নিয়ে রাস্তায় বেরোয়। এত এত পোস্টার লেখা হল কখন ও ভেবে পায় না। বঙ্গাল অসমর পরা গুছি যা—স্বাধীন অসম—আসামকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন কর ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাড়া খাওয়া মানুষের মত ফিরে আসে হীরেন। একসঙ্গে সবাই কি পাগল হয়ে গেল? স্বাধীন আসাম মানে—আসাম কি পরাধীন?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অফিসে বেরুচ্ছে এমন সময় পাশের বাড়ির নরেন শইকিয়ার ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটি এল। ওর সঙ্গে হীরেনের খুব ভাব! একটা কনভেন্ট স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে।

—আংকল, আপুনি বঙ্গালি নহয় জানো?

ওর আজব প্রশ্নে হীরেন দরজায় তালা দিতে ভুলে যায়।

—সোনটি, এনে কথা বারু কিয় সুধিছা?

ওর জবানিতে হীরেন জানতে পায় গতকাল স্কুলে কয়েকজন গিয়েছিল—আজ থেকে স্কুল বর্জন। বাঙ্গালিরা আসামের সর্বনাশের মূল ইত্যাদি নানা কথা ছাত্রদের বোঝানো হয়েছে।

—তেঁওলোকে বঙ্গালিক অসমর পরা উলিয়াই দিব বলি কৈছে।

—সোনটি, ইবিলাক ভাবিব নেলাগে দে। তুমি ভাল লরার দরে পঢ়ি থকা গৈ।

ঘরে তালা দিয়ে রিক্সা নেয়। পথে ছোটবড় ছেলেমেয়ে লাইন করে চলছে। গন্তব্য জাজেস ফিল্ড। রাতারাতি সব কেমন পাল্টে গেল হীরেন ভেবে পায় না। বেলা তিনটায় রূপালি ফোনে ডাকে।

—সাবধানে থেকো। তোমার যা স্বভাব হুট করে বেরিয়ে পড়বে।

—না-না, তুমি ভেবো না। বিকেলে আসছি।

—কী দরকার? রাত্রে ফিরতে অসুবিধে হবে।

—কিসের অসুবিধে। অনেকদিন দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে।

—অ্যাঁ, কাল বিকেলে কার সঙ্গে ছিলে?

—সে তো রূপালি বরার সঙ্গে। আজ রূপুর সঙ্গে কাটাব—জয় আই অসম।

পাগলকে আটকানো যাবে না। রূপালি ফোন রেখে দেয়। ভাবে রাতে ফিরতে না দিলেই হবে।

বিকেলে পৌঁছে একেবারে যাকে বলে তপ্ত কটাহে পড়ে হীরেন। খগেন মহন্ত ও আরও কয়েকজন উত্তপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত।

হীরেন যেতেই সবাই কেমন চুপ হয়ে যায়। মুখের ভাবে মনে হয় হীরেনকে কিছু শুনতে দিতে রাজি নয় ওরা।

—কী ব্যাপার মোহন্তবাবু? আলোচনা বন্ধ কেন? আমি আসায় অসুবিধা হল নাকি?

রূপালিই খেই ধরে—আপোনার কথাবোর মই মানিব পরা নাই মোহন্ত। আপোনার উদ্দেশ্য ভাল হব পারে—কিন্তু গোটে রাইজক কন্ট্রোলত রাখিব নোয়ারিব। স্বাধীন অসম বুলি যিহতে টিপ্পরিছে তেওলোকে আপোনার কথা নুশুনে।

হীরেন আলোচনায় পথ পায়—একটা কথা জিজ্ঞেস কোরব মোহন্তবাবু?

—কঁওক।

—অন-অসমীয়া যারা আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তাদের সবাইকে কি আপনারা

বহিরাগত মনে করেন?

—নহয় তেনে কথা আমি কোয়া নাই দে। ১৯৫১ চনর পিছত অহা মানুহবোরক বহিরাগত বুলি চিহ্নিত করিব লাগে।

—কেন বলুন তো? একান্নর পর যারা এসেছে তারা কী দোষ করেছে?

—দোষর কথা নহয়। বহিরাগতর কারণে অসমর সমস্যাবোর বহুতো বাঢ়ি গৈছে। আমার চাকুরি পোয়াটো টান হৈ পরিছে।

রূপালি হঠাৎ বলে ওঠে—অর্থাৎ আমি কম্পিটিছনত ঠিয় হব নোয়ারো বুলি কঁওক; খং (রাগ) সেই কারণে হে।

—না রূপালি, আমি সে কথাও বলছি না। লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যাও বাড়ে। কিন্তু সে সমস্যা কি শুধু অসমিয়া জাতির? আসামে তেল শোধনাগার ছাড়া আর কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটাই কি আসামের সমস্যা নয়?

—মই তাকেই কব খুঁজিছো—' খগেন মোহন্ত যেন আলো দেখে।

—কিন্তু আপনারা তা বলছেন না। আসামের সমস্যাকে আপনারা শুধু অসমিয়া জাতির সমস্যা বানিয়ে তুলেছেন।

—কথাটো একেই হল নহয়—'। মোহন্ত হেসে ওঠে।

—এক নয় মোহন্তবাবু—এক নয়। আসামের সমস্যা বলে যদি বুঝতেন তবে আসামে বসবাসকারী এক বিরাট সংখ্যক বাঙ্গালিকে আপনারা শত্রু মনে করে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। মনে রাখবেন আসামের প্রতিটি সুখ-দুঃখের সঙ্গে এরাও জড়িয়ে আছে।

—আমার আন্দোলনত অসমর গোটেই মানুহক মাতিছো আমি—'। খগেন মোহন্তর গলা কিছুটা দুর্বল।

—না, আপনাদের ইচ্ছাকৃত ভুল সেটাই। আপনারা খুব বাজে ও সস্তা সেন্টিমেন্ট দিয়ে একটা সত্যিকারের সমস্যাকে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছেন।

—আপুনি বুঝা নাই মিঃ ঘোষ—অসমিয়া ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আজি সংকটত—তার মৃত্যু ঘনাই আহিছে। আরু তার কারণে বঙ্গালি হে দায়ী।

হীরেন হো-হো করে হেসে ওঠে—

—মোহন্তবাবু, যাদের ভাষা-কৃষ্টি গতিশীল নয়, তাদের মৃত্যু অনিবার্য। অসমিয়া ভাষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আপনার ধ্যান-ধারণাকে আমি সমর্থন করি না। যে জাতি গতিশীল—তার ভাষাও গতিশীল—ক্রমবিবর্তনে তার কৃষ্টিও পরিশীলিত হবে। অসমিয়া সাহিত্য ও কৃষ্টিকে যারা ভাল করে লক্ষ্য করবেন তারাই বুঝবেন সেটি কোনও জড়বস্তুর মত থেমে নেই। তার গতিশীলতাকে বাঙ্গালির কৃষ্টি কেন, পৃথিবীর কোনো কৃষ্টিই গ্রাস করতে পারবে না। শুধু আপনাদের মত কিছু মানুষ যদি সংকীর্ণ বুদ্ধি দিয়ে তাকে গণ্ডিবদ্ধ না করেন।

রূপালি অবাক হয়ে হীরেনকে দেখছিল। এ যেন অন্য হীরেন। এ হীরেনকে সে যেন আজ প্রথম দেখতে পেল। গর্বিত এক ভাললাগায় তার মন ভরে ওঠে।

খগেন মোহন্ত বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকে। শেষে বলে—আপোনার নিচিনা বিশ্বাস মোর নাই। এতিয়া প্রোগ্রাম যি লোয়া হৈছে তাক এড়িব নোয়ারিম। আমাক আগ বাড়ি যাবই লাগিব।

—আগ বাড়া নয় মোহন্তবাবু—আপনারা সমস্ত আসামকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে দিচ্ছেন। আমার দুঃখ সেখানেই।

রূপালি উঠে পড়ে—খন্তেক বহক। মই চাহ বনাই আনো।

চা-পর্ব নীরবেই শেষ হয়। ওরা চলে যায়। হীরেন আরও কিছুসময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকে। রূপালি ওর পাশে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

—না রূপা, এদের এইসব অবরোধের ফল মারাত্মক হবে। আসামের ব্যবসা বাণিজ্য ভীষণ মার খাবে, মাঝ থেকে লাভ হবে কিছু মুনাফাখোরের।

—কিছু করার নেই হীরেন। ওরা তোমার-আমার কথা শুনবে না। সমস্ত আসাম জুড়ে এক থমথমে অবস্থা। যে কোনও মুহূর্তেই দাবানল শুরু হয়ে কিছু নিরীহ মানুষের ধন-প্রাণ যেতে পারে।

মাস তিনেক কেটে গেছে। আন্দোলন এখন তুঙ্গে। রূপালির সাবধানতায় হীরেন প্রায় গৃহবন্দী। স্কুল-কলেজ-অফিস সব লাটে উঠে গেছে। এটা নাকি ওদের শেষ সংগ্রাম। জীবনপণ।

অতি উৎসাহীরা একে আবার দ্বিতীয় সরাইঘাটের যুদ্ধ মনে করছে। মোগলদের হাতে আসামের স্বাধীনতা তখন বিপন্ন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পর আজ এ যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? নিজেকেই প্রশ্ন করে হীরেন। অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে। অদৃশ্য গোপন পথে আসছে এ-যজ্ঞের ঘি।

প্রতিদিনই ঘটছে ছোট-বড় ঘটনা। এক আতঙ্কের পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। আইন-শৃঙ্খলা ব্রহ্মপুত্রের দশ বাঁও নিচে। বিদ্বেষের ঢেউ বেনোজলের মত ঢুকছে মেঘালয়-মণিপুরে।

—রূপা, আমরা কোন্ দেশে আছি?

রূপালি ওর যন্ত্রণাকে অনুভব করে।

—তুমি ওসব ভেবো না আর। যা হবার হোক।

—যা হবার হোক! আমরা কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিরে যাচ্ছি? এটা কোনও কাজের কথা হল? কেউ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে—জেনেশুনে কি তাকে আত্মহত্যা করতে দেবে?

—তুমি একা কী করবে বল? তাছাড়া তুমি বললেও শত্রুর কথা কে শুনবে? দেখছ না সব নেতা ভয়ে মুখ বন্ধ করে আছে? বারুদের ওপর বসে আগুন নিয়ে খেলার দুঃসাহস

কারও নেই।

—কারও নেই? আসামের এককোটি মানুষের কারও নেই? এটা কোনও বিশ্বাসের কথা হল? না রূপা, তা হতেই পারে না। আসামে সবার চিন্তা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে—হতেই পারে না। আসলে কে প্রথমে বলবে ইতস্তত সে জন্যই। কাউকে প্রথম বলতেই হবে।

অত্যুৎসাহী আর সুযোগ-সন্ধানীদের কৃপায় আগুন জ্বলতে দেরী হল না। যে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছুটে এসেছিল কিছু মানুষ জন্মভূমি ছেড়ে, সেই প্রাণ গেল নিজের মানুষদেরই হাতে। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন দ্বিতীয়বার।

হীরেন অস্থিরপ্রায়।

—রূপা এদের থামাও। এরা সব আলো নিভিয়ে দেবে। নিজেদের কলঙ্কিত করছে এরা।

রূপালি শঙ্কিত। কী করবে ভেবে পায় না। টেবিলের ওপর পত্র-পত্রিকা নাড়াচাড়া করছিল ও। হঠাৎ বলে ওঠে—

হীরেন, দেখ-দেখ—মানুষ আছে—বলার মত মানুষ আছে—এই দেখ 'কলাখার'-এ কী লিখেছে।

পত্রিকাটি আগাগোড়া পড়ে হীরেন। পড়তে পড়তে ওর দু'চোখে জল ভরে আসে।

—না রূপা, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

রূপালি ওর শিশুর খুশি দেখে আশ্বস্ত হয়। দিন কয়েক পাখি ডানা মেলে ওড়ে। কিন্তু সত্য চিরকালই কঠোর। 'কলাখার'-এর সম্পাদক হীরেণ গোহাঁঞি স্পষ্ট ভাষণের জন্য লাঞ্ছিত হন—এরপর প্রাণ যেতে পাবে। নিরুপমা বরগোহাঁঞি নিরপেক্ষতার অপরাধে চাকরি থেকে বিতাড়িত। ডা: অঞ্জন চক্রবর্তী প্রাণ হারান স্টেটমেন্ট না লেখার অপরাধে।

হীরেন যেন বোবা। এর নাম আন্দোলন? এদের লাঞ্ছনা বা মৃত্যুতে কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

এমন সময় হঠাৎ একদিন উদয়ন এসে হাজির হল শিলং থেকে। হীরেন যেন বাঁচে।

—কী প্রফেসর, কলেজ ছেড়ে হঠাৎ?

—আর কলেজ। সাতদিনের নোটিশ পেয়েছিলাম। সিক্সথ ডে-তে এসে মনে করিয়ে গেছে ওখানে থাকার আজই শেষ দিন।

—আর তুই চলে এলি?

—কী করবো বল—পৈতৃক প্রাণটাকে বেঘোরে দেওয়ার কোনও অর্থ নেই।

—উদয়ন, এ অঞ্চল কি ভারতের মধ্যে?

—আমার তা মনে হয় না। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে যা চলছে তাতে মনে হয় সংবিধান বা আইন বলে কোনও বস্তু এখানে নেই। গোল্লায় যাক্—'

—কে যাবে?

—কেন, আমরা—যারা স্বাধীনতার বলির পাঁঠা। ফুটবলের মত সারা ভারত জুড়ে লাথি খেয়ে ছুটোছুটিই তো আমাদের ভাগ্য।

—ঠিক। কিন্তু আর কতদিন? স্বাধীন হওয়ার তেত্রিশ বছর পরও কি এভাবেই চলবে?

উদয়ন চুপ করে থাকে। হীরেন উঠে যায় স্টোভে চাল চাপাতে। এমন সময় রূপালি এল।

—আরে উদয়নবাবু, কী খবর?

—খবর তো জানাই।

—আপনার বন্ধুটি কোথায়?

—রান্নায় ব্যস্ত বোধহয়।

—যাই, সাহায্য করি কিছু।

—তাহলে খাওয়াটা আজ জমবে ভাল।

—এত এত খাওয়াচ্ছি আমরা এখনও পেট ভরেনি? আচ্ছা পেটুক দেখছি আপনারা। চা খাবেন তো?

—সে আর বলতে।

রূপালি রান্নাঘরে ঢোকে।

—যাও গল্প করো গিয়ে, আমি চা বানিয়ে আনছি।

—বাঁচা গেল।

রূপালি বলবে না ভেবেও জিজ্ঞেস করে—আজকের পেপার দেখেছ?

—না, পেপার পড়া বাদ দিয়েছি। কেন, বিশেষ কোনও খবর আছে নাকি?

রূপালি চট করে উত্তর দিতে পারে না। খানিকক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

—আমরা মানুষ নামের অযোগ্য। একটা তাজা মানুষকে এভাবে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে পারে—আমি ভাবতেও পারছি না। রূপালির গলা ধরে আসে।

হীরেন ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে উদয়ন এ-ঘরে এসে হাজির হয়। দু'জনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়।

—কী ব্যাপার, মান-অভিমানের পালা চলছে নাকি?

—উদয়ন, আজকের পেপার পড়েছিস?

—রবি মৈত্রের ঘটনার কথা বলছিস?

—রবি মৈত্র?

—হ্যাঁ, তেল-বিশেষজ্ঞ। আনানো হয়েছিল এ-অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য। কাল তাকে—'

এমন সময় বাইরে কারও গলা শোনা যায়। হীরেন গিয়ে দরজা খোলে। দু-তিনজন ভেতরে ঢোকেন। হীরেন সবাইকে বসতে বলে।

—হীরেনবাবু, আমাদের কিছু করা দরকার।

—কী করতে চান?

—আন্দোলনের নামে পরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালি উৎখাত পর্ব চলছে। পুলিশ হয় পক্ষে না হয় নীরব দর্শক।

—আমরা কয়েকজন মিলে কী করতে পারি বলুন? সমস্ত আসাম জুড়ে ওরা রীতিমত বিকল্প সরকার গড়ে তুলেছে। কেন, ওদের বলতে শোনেননি—কেরাচ চরকার—এখন এই কেরোসিন সরকারের শাসনে আছি আমরা।

—সে আমরা জানি। কেরোসিন সরকার চলছে ভালই—তা চলুক। আমরা নওগাঁ, গোয়ালপাড়া সব ঘুরে এসেছি। সব জায়গাতেই এক কথা—প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এভাবে নীরবে সহ্য করা ঠিক নয়।

—বুঝেছি। কিন্তু আপনারা কি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন? প্রতিবাদ সর্বত্র একসঙ্গে হওয়া দরকার এবং এর ফলে আরও বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়াটা অসম্ভব নয়—সব দিক ভেবেচিন্তে এগোনো উচিত।

—আমরা ঘুরেফিরে ওদের মনোভাব যা বুঝেছি তাতে মনে হয় সমস্ত রকম ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত। প্রতিদিন আতঙ্কে কাটাবার চেয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—এটাই চাইছে তারা। তাদের মূল কথা এ দেশটা তাদেরও—এই কথাটা বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে।

উদয়ন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবারে মুখ খোলে—আপনারা শুধু বাঙালীদের কথা না ভেবে—যে সমস্ত চিন্তাশীল অসমিয়া মানুষ রয়েছেন তাদেরও টানুন! তাদেরও অংশীদার করুন। তেমন মানুষও অনেক পাবেন যারা শুধু সেন্টিমেন্টকে সমর্থন করেন না। এরসঙ্গে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন বিলটি নাকচ করার দাবী তুলুন।

—আপনি যা বলছেন এত কম সময়ের মধ্যে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। অনেকের সঙ্গেই আমরা এর মধ্যে আলোচনা করেছি। প্রত্যেকেই বুঝছেন স্কুল-কলেজ বন্ধ করে, পরীক্ষা বাতিল করে, সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনা হচ্ছে। এমনকি দিনের পর দিন ছেলেমেয়েরা যেভাবে চলছে তাতে তারা আরও অনেক কিছুই আশঙ্কা করছেন। তবে তোপের মুখে পড়তে চান না কেউই। আগামী বুধবার আমরা প্রতিবাদ মিছিল বের করব। হীরেনবাবু, আপনি যাদের পাবেন নিয়ে আসবেন।

—ঠিক আছে। তবে দেখবেন পুওর শো যেন না হয়।

ওরা চলে যায়। রূপালি এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল। এবারে চা নিয়ে আসে।

—বুধবার তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।

হীরেন আপত্তি জানায়—কী দরকার। যদি কোনও গণ্ডগোল হয় মুশকিল হবে।

—এখানে কোনও গণ্ডগোল হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ মিছিলে শুধু তোমরা নয়, আরও অনেক মানুষও থাকবেন আমি জানি।

—তুমি জানলে কী করে?

খগেন মোহন্তরাও এ মিছিলের খবর পেয়েছে। ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসেছে মিছিলে যোগ দিলে গরিহণা (ধিক্কার) দিতে হবে।

ধিক্কারের ভয়ে মিছিল থেমে রইল না। আন্দোলন যেমন এক বিশেষ উন্মাদনায় এগিয়ে চলছে—এই প্রতিবাদ মিছিলও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমুদ্রের ঢেউয়ে পরিণত হল। সে ঢেউয়ের ভাঙন টের পেল নওগাঁ ও গোয়ালপাড়া। এমনটি বোধহয় কল্পনাতীত ছিল। খগেন মোহন্তরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু সে স্বরে ভয়ের কাঁপন যে ছিল না—সে কথা হলফ করে বলা যাবে না।

এ অনিবার্যকে ডেকে এনেছে ওরা। সে কথাই আলোচনা হচ্ছিল হীরেনের অফিসে। মাসের শেষ ক'দিন অফিস খোলা থাকছে শুধু বেতন না-হওয়া পর্যন্ত। নিজেদের মধ্যে নিচুগলায় কথাবার্তা চলে। কয়েকজন এসে হীরেনকে তারিফ করে যায় সেদিনের বক্তৃতার জন্য। এমন সময় ফোনে ডাকে রূপালি।

—বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে।

—কেন, তুমি আসবে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তবে এখনি চলে যাই বরং।

—ধামালি (ঠাট্টা) ন হয়।

—যা সব সিরিয়াস কাণ্ডকারখানা চলছে দেশে এরপর ধামালির উপায় আছে?

—ও সব কথা বাদ দাও। আমি তোমার অফিসে আসছি।

—তাহলে মিষ্টির অর্ডার দিয়ে রাখি?

—দেখ, আমার কিন্তু খং (রাগ) উঠছে।

—দোহাই তোমার খংটা আমার সামনে এসে করবে—রাগলে তোমার মুখ যা কাশ্মীরি আপেলের মত লাগে না—ওটা দেখার লোভ সামলানো দায়—

—আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আসছি—' ফোন রাখে রূপালি।

উদয়ন মালিগাঁও গেছে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। দু'জনে চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসে। রূপালির মুখ আজ বেশ গম্ভীর। হীরেন মাঝে মধ্যে আড়চোখে ওকে দেখে। একটা কিছু বলার জন্য উসখুশ করে ওর মন। এমন সময়ই কলরবটা ভেসে এল কানে।

—বঙ্গালটোক উলিয়াই (বের করে) আনা— শব্দের সঙ্গে কয়েকটি ঢিল এসে পড়ে

দরজায়।

রূপালি টানটান দাঁড়িয়ে যায়। ওর সারা মুখে উদ্বেগ। হীরেন প্রথমটায় অবাক। চিৎকারের শব্দ বেড়ে গেছে অনেক। হীরেনের মুখ থমথমে। সে সটান উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগোতেই রূপালি ওকে টেনে ধরে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। রূপালি হঠাৎ গিয়ে দরজা খোলে। হীরেন এগিয়ে যাওয়ার আগেই শব্দ শোনে—উঃ।

রূপালি এক হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে আছে। ওর চাঁপারঙের আঙুলের ফাঁকে কৃষ্ণচূড়ার রক্তের ধারা। ওকে এক হাতে সাপ্টে ধরে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায় হীরেন। দেখে দশবারো জন ছেলে ও যুবক। নিস্তব্ধতা ভাঙে হীরেনের গলা—

—মোক কুনে বিচারিছা? (আমাকে কে খুজছ?)

ভিড়ের মধ্য থেকে কোনও উত্তব আসে না। ও আবার বলে—বঙ্গালটোক লাগে নহয় নে? অসমর পরা উলিয়াই দিবা? (আসাম থেকে বের করে দেবে?) মনত রাখিবা মইও অসমরই। (মনে রাখবে আমিও আসামেরই)। কারও ক্ষমতা থাকলে এস বের কর আসাম থেকে—

ওদের মাথার ওপর দিয়ে হীরেনের গলা গমগম করে ভাসতে থাকে বাতাসে।

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

আশ্রয়

সকালের কচি রোদ্দুর তার রক্তিমাভা হারিয়েছে অনেকক্ষণ। বৃদ্ধ রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। ষাট বছরের কোঁকড়ানো চামড়ার ওপর অনেক ঝড়ের দাপট আঁকিবুকি কেটে রেখেছে। আজ এই পুত্র-পুত্রবধূ ও নাতির সংসারে ওই কুঞ্চিত চামড়ায় খেলা করে তেল-মসৃণ স্নেহ অবিরাম।

একবার চোখ দু'টো চারদিকে ঘুরিয়ে আনে বৃদ্ধ। নারকেল গাছ দু'টো চিকচিকে পাতা নেড়ে হাওয়া করে। ঘরের কার্ণিশে কয়েকটি চড়ুই টুইটুই শব্দে বয়ে আনছিল একটা স্থায়ী সুখের আনন্দ। জীবনের এটুকু আনন্দের জন্য অনেক অনেক বসন্তকে ক্ষয় করতে হয়েছে বৃদ্ধকে।

পুরানো কথা মনে হতেই মন-উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের পুকুরটির দিকে। বৃদ্ধ যেন দেখতে পায় লালপেড়ে শাড়ির ঘোমটা ঢেকে সিঁদুর মাখা আমের পল্লব সহ মাটির ঘট নিয়ে যাচ্ছে গঙ্গাপূজা দিতে নিভা। আজ পুকুর কাটা শুরু হবে। মাটি কাটার জন্য লোকগুলো কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে।

দাদু তোমাকে কে ডাকছে—নাতির কথায় অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ফিরে আসে বৃদ্ধ। ছেলে বাইরে চাকরি করে। ফলে গ্রামের সব কিছুতেই এখনও বৃদ্ধকেই যেতে হয়। বাইরের ঘরে এসে দেখে গ্রামের কয়েকটি তরুণ বসে।

—দাদু আজ স্কুলের উদ্বোধন, আপনাকে থাকতে হবে।

বৃদ্ধ অতীতের পৃষ্ঠা থেকে তখনও পুরোপুরি নির্বাসন নিতে পারেনি। গ্রামে প্রথম পুজোমণ্ডপ হবে। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, নিজের তদারকিতে গড়ে উঠেছিল সে মণ্ডপ। গ্রামের সব ব্যাপারেই

বৃদ্ধকে ছাড়া চলত না, এখনও না।

মাথা নাড়তেই চলে যায় তরুণদল। একটা চেয়ারে বসে দেয়ালের একটি ফটোর দিকে তাকায় বৃদ্ধ। ছেলে কোলে তার পাশে দাঁড়িয়ে নিভা। পুত্রলাভের আনন্দ আর প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার লজ্জা দুটোই জড়াজড়ি করে আছে মুখে। কোন মেলায় গিয়ে এ ফটো তোলানো হয়েছিল মনে পড়ে না। বহু যুদ্ধের সঙ্গী ওই হাসিমুখ আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। এক নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধকে। কবে এসেছিল এখানে মনে পড়ে না। এই জলমাটি কবেই আপন করে নিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছিল জন্মসূত্রে এ ভূমি তার নয়। আজকে তার চিন্তা-ভাবনা, আশা-আনন্দ সবকিছুই এই মাটিকে ঘিরে।

কাছে গিয়ে ছেলের কচি মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকে। কত বড় হয়ে গেছে অরিন্দম। এমন সময় নাতিটি একটি চিঠি নিয়ে হাজির হয়—দাদু চিঠি, বাবার চিঠি। দাদুর হাতে দিয়েই ছোট্ট পায়ে ছুটে যায় ভেতরে মা'কে খবর দিতে।

চিঠি খোলে বৃদ্ধ। অরিন্দম জানতে চেয়েছে গ্রামে বসবাস আর সম্ভব কিনা। সমস্ত চরাচর জুড়ে শকুনের ডানার কালো ছায়া ঢেকে দিতে শুরু করেছে খুশির রোদ্দুর। রাতারাতি এতগুলো মানুষের বুক শেষে শুষে নিয়েছে স্বস্তি। সবাই এখন এক বুক নিঃশঙ্ক নিঃশ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে। এতদিনের সহজ ভালবাসায় কোথায় যেন ধ্বস নেমেছে। চিঠি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ।

পুত্রবধূ দরজার কাছে এসে উসখুস করে। চিঠিটি বাড়িয়ে দিয়ে আবার নিজের চিন্তার রাজ্যে ফিরে যায় বৃদ্ধ। অনেক রক্ত ঘাম হয়ে মিশেছে এ মাটিতে। এর সাথে নাড়ির যোগকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে—কিন্তু কেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন-র অন্ধকার গাঢ় হয়ে জমে কিছু মানুষের না-ঘুম চোখের চারদিকে

সকালে নাতির পড়ার শব্দ ভেসে আসে—ঈশ্বর তুমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার আশীর্বাদে এই পৃথিবীব জল-বায়ু-শস্যে আমরা—'

বৃদ্ধ ভাবতে থাকে, এ পৃথিবীর আলো-বাতাস যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি তবে এর মাটি নিয়ে আমরা ভেদাভেদের প্রাচীর তুলছি কেন? আরও অজস্র কেন-র মধ্যেই বিছানা ছাড়তে হয়। সময় যেন সীসের জুতো পায়ে হাঁটছে। বৃদ্ধ গ্রামের রাস্তায় হেঁটে যায়।

সূর্য অকৃপণ ছড়িয়ে দিয়েছে তাপ ও আলো, পাখিগুলো আগের মতই গাছ থেকে গাছে উড়ে উড়ে শব্দ তুলছে, গাছ-গাছালিতে একইভা ব খেলে যাচ্ছে হাওয়া। বৃদ্ধ চেষ্টা করে বুঝতে কোথাও কোনও পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ে না তার। শুধু দেখতেপায় কিছু নতুন মুখ গ্রামের পথে পথে, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরছে। ওদের মুখে যেন এক উদ্ধত ব্যস্ততা, তোয়াক্কা না করার আগুনে-আলো দুচোখে। বৃদ্ধের চোখে চিন্তার রেখা—এরা কী খুঁজছে এ গ্রামে। দুদণ্ড আলাপ করার মত কাউকে না পেয়ে আবার ঘরমুখো হয়।

বাড়িতে ঢুকতেই নাতিটি ছুটে আসে—দাদু দাদু, কারা এসেছিল—এই দেখ কাগজ দিয়ে গেছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজটি পড়ে বৃদ্ধ। ছাপানো লিফলেট। পনেরো দিনের মধ্যে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ!

শেষ হলো বন্দরের কাল—নোঙর তোল এবার। কিন্তু নোঙর তুলে এ জাহাজ কোন দরিয়ায় ভাসবে?

সারাটা দিন কর্মহীন নিঃশব্দ সময়ে শুধু একটি কথাই বাজতে থাকে—গ্রাম ছাড়ো—তুমি বাইরের মানুষ—এ মাটির কেউ নও।

নাতিটিও যেন বাতাসে গন্ধ পায়। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তার সমস্ত চঞ্চলতা যেন উবে গেছে। রাতে শোওয়ার সময় বুকের কাছে নাতিটিকে জড়িয়ে রাখে বৃদ্ধ। এমনি করেই তো একদিন একবস্ত্রে ছেড়ে আসতে হয়েছিল একটি গ্রাম, যেখানে তার জন্ম হয়েছিল। মানুষের কীর্তির কাছে মানুষকেই বারবার পরাভব মানতে হয়। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় টুপ করে ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় বৃদ্ধ।

দেখতে পায় এক বিরাট মাঠ। লক্ষ লক্ষ কীট-পতঙ্গে ভরে গেছে। পৃথিবীতে যে এত আকার-প্রকারের কীট-পতঙ্গ রয়েছে তাই কি জানতো বৃদ্ধ! মাঠের মাঝখানে এক মঞ্চ। মঞ্চে একগাল দাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সাহেব। কিছুক্ষণ পরই ভেসে আসে তার গলা—পৃথিবীতে মানুষকে আনা হয়েছে অন্য গ্রহ থেকে। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক অদ্ভুত শব্দ ওঠে এ কথা শোনার পর। বৃদ্ধ জানে না সে আজকের বক্তা দানিকেন সাহেব। মানুষ ভিন্ন গ্রহবাসী এ তত্ত্ব নিয়েই তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তার বক্তৃতা থামার পরই এক পতঙ্গ ডানায় ফড়ফড় শব্দ করে উড়ে যায় মঞ্চে। মাইকের সামনে বসে তার চিক্কণ গলায় শব্দ তোলে—আজ পৃথিবীর সব দেশের সব জাতের প্রতিনিধিরাই এ সভায় উপস্থিত। আমি প্রস্তাব রাখছি—যেহেতু মানুষ ভিন্ন গ্রহ থেকে এখানে এসেছে তাহলে আমরাই পৃথিবীব আদিম বাসিন্দা অর্থাৎ ভূমির সন্তান। মানুষ পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে অতএব মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে অবিলম্বে। আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এখনই কার্যকরী করব।

বৃদ্ধ দেখতে পায় মঞ্চের সাহেবকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে অজস্র কীটপতঙ্গ। বাকি হাজারে হাজারে—লাখে লাখে ধেয়ে যাচ্ছে চারদিকে—মানুষকে উৎখাত করতে এ পৃথিবী থেকে। যতই ওরা আসছে ততই যেন আকারে ও সংখ্যায় বেড়ে চলেছে। প্রাণভয়ে বৃদ্ধ উঠে দৌড় দিতে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘামে ভেজা বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে যায়।

শুয়ে শুয়েই ভাবে—এরাও তো তাই বলছে। ভূমিপুত্র ছাড়া কারও স্থান হবে না এ রাজ্যে। বৃদ্ধ ভেবে পায় না কোথায় যাবে নোঙর তুলে।

সেই কবে ছোট্ট অরিন্দমকে বুকে নিয়ে একবস্ত্রে ভিটেমাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালাতে হয়েছিল প্রাণের মায়ায়। সেদিন সঙ্গে ছিল নিভা। সেদিন মাটির সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র নিপুণ হাতে কে কেটেছিল জানে না বৃদ্ধ। কিন্তু ভাসতে ভাসতে যেখানে নোঙর ফেলার সুযোগ পেয়েছিল সেটি এই মাটি। তারপর ভাষা এক না হলেও আত্মীয়ের আন্তরিকতায় পুরানো স্মৃতির ওপর কবেই পলিস্তর জমে জমে আশ্রয়ের দ্বীপ হয়ে উঠেছিল এ মাটি।

সে মাটিই যে এত রুক্ষ হতে পারে কোনোদিনই ভাবতে পারেনি বৃদ্ধ।

কী সব লিখছে এরা! আমরা বিদেশী, বহিরাগত! কিন্তু কোন বাইরের দেশ থেকে এলাম আমরা? একই দেশে তো ছিলাম। আমরা বিদেশী হলাম কী করে? বৃদ্ধের মাথার ভেতর প্রশ্নটি জোঁকের মতই লেপ্টে থাকে।

এ দেশটি আমাদের নয়। তাহলে আমরা এলাম কোত্থেকে? ভূমিপুত্র মানে কি আদিম অধিবাসী? সে আদিমকে কি এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে? নাকি ভূমিকে যে মায়ের মত ভালবাসে সে ভূমিপুত্র? বৃদ্ধের মাথায় ঢোকে না গ্রাম ছাড়তে হবে কোন অপরাধে।

প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন মুখ এসে শাসিয়ে যায়—গ্রাম ছাড়ো না হলে প্রাণে মরবে। কিন্তু মাটির গভীরে শেকড় ঢুকলে সহজে কি সেটি টেনে তোলা যায়? সেজন্যই গ্রামের প্রত্যেকের মনেই ইতস্তত ছিল। ছিল অনিশ্চিত নিরালম্বন হওয়ার আশঙ্কা।

কিন্তু সংশয়ের প্রতীক্ষা খুব দীর্ঘ হয় না। একদিন আগুন লাগে ঘর-বাড়িতে। জল ঢেলে নেভাবার সুযোগও দেয়নি সে'সব রুক্ষ মুখ। অথচ ক'দিন আগে এরাই ছিল আত্মার আত্মীয়। কোন সে কালো যাদু রাতারাতি ছিন্ন করে দিল আত্মার সে বন্ধনকে! বৃদ্ধ জানে না—জানে না গ্রামের অন্যরাও।

দ্বিতীয়বারের জন্য নাড়ি ছিন্ন করা হয়। প্রথমবার নাড়ি ছিন্ন করেছিল ধর্ম, দ্বিতীয়বার করল ভাষা। বৃদ্ধ নাতি ও পুত্রবধূকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছেলের উদ্দেশে। পেছনে পড়ে থাকে সব কিছু যা নিয়ে তার এ জীবন ও দৈনন্দিনতা। আশ্রয়ের খোঁজ কবে শেষ হবে মানুষের—সে সব কিছুই জানে না বৃদ্ধ। শুধু জানে প্রথমবার বেরিয়েছিল ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে, আর এই দ্বিতীয়বার চলতে হচ্ছে ছোট্ট নাতির হাত ধরে। আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের এ যাত্রার বোধহয় শেষ নেই।

বদরুজ্জামান চৌধুরী

অন্নদাত্রী

স্কুল থেকে ফেরার পথে চরণযুগল আর হাওয়াই জোড়া ধুলিধূসর, বাড়ির বাইরের পুকুরঘাটে নেমে পা ধুচ্ছি. খানিক তফাতে আমাদের এজমালি পাঞ্জেগানা মসজিদের অবস্থান, ওদিক থেকেই শুনতে পেলাম আমার পাশের বাড়ির বড় চাচার বড় গলা—রাখো রাখো তোমাদের ও'সব মুছলা টুছলা আর যত্তোসব বড় বড় কথা। তুমি আর দেখেছ কী, সেদিনকার বাচ্চা, নাক টিপলে দুধ বেরোবো—

খুব গরম চলছে ক'দিন। গনগনে রোদ পৃথিবী পোড়াচ্ছে। বড় চাচার মন মেজাজও আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খুব ক্ষিপ্ত বুঝতে পারি। এমনিতেও খুব রাগী বলে পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তার একটা সুনাম আছে। মসজিদের পূর্বদিকে ঘর বরাবর লম্বা বারান্দা টানা, তার এক অংশে বাঁশ মূলির তর্জা বেড়া বসিয়ে কোঠামতন করে দেওয়া, তাতে একখানা তক্তপোষ, চেয়ার-টেবিল ফেলে মুল্লা ছেলেটি থাকে। আমাদেরই সম্পর্কিত এক আত্মীয়-পুত্র সে, বড়জোর বয়েস-টয়েস সতেরো-আঠারো, কিলোমিটার কয়েক দূর গঞ্জের মত যে আধা শহর একটা, সেখানে মাদ্রাসা একখানা, কওমী, সেটাতে সে পড়ে। আসলে মাদ্রাসার শ্রেণী-ট্রেনির খবর আমার অজানা, তবে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে যা জেনেছি, এই মাদ্রাসায় আরও মাস আষ্টেক পড়া বাকি রয়েছে তার

আমাদের এটা পাড়া-গাঁ। এ'সব গ্রামে-গঞ্জে মুল্লাকে সম্বোধনে শুধুমাত্র 'মুল্লা' না বলে ডাকা হয়—'মুল্লাবেটা'। মুল্লার পিঠে 'বেটা' শব্দটা জোড়া দিলেও অন্তত আমাদের মুসলমান অন্তঃপুরিকারা কেউই 'মুল্লা' কাউকে বেটা বা পুত্রের মত দেখেন না। আমার নম্বর তিন পুত্রধন এই 'মুল্লাবেটা'র সমবয়সী এবং সম্পর্কে গলাগলি বান্ধব হওয়া সত্ত্বেও মুল্লা যখন চা পান অথবা ভাত খেতে ভেতর বাড়ি আসে, তখন আমার স্ত্রীও পর্দা পালন করেন। বেগানা

পর পুরুষের সামনে বালেগা আওরতের বেপর্দা বাহির হওয়া, কথা বলা, হাস্য লাস্য বিলকুল হারাম, না-জায়েজ! অথচ আমার বাড়িতে রোজকার কাজকর্মের লোক, ফেরি, মাছওলা, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের সহপাঠী সহচর যারাই আসে সবার সামনে স্ত্রী আমার বের হন, কথা বলেন, দরকার মত চা-পান আপ্যায়নও। পরিহাসবশত স্ত্রীকে একদিন জিজ্ঞেস করেই বসেছিলাম, তোমরা কী ভেবে মুল্লা-মৌলবি তালেবাদেরই শুধু এত পর্দা করো? চোখে কি তোমাদের ওরাও শুধু একমাত্র পুরুষধন?

শুনেছি মুল্লা ছেলেটি এবার হাইস্কুল লিভিং দেবে। মাদ্রাসার পড়া আছে, তারপর ক্লাশ, তারপর পাঞ্জেগানার নমাজ পড়ানো, ফজিরের নামাজ পড়ে আট-ন'টা পর্যন্ত বাচ্চাদের নিয়ে বসা মসজিদের বারান্দায়, ইশকুলি পড়ার ফাঁক কোথায়, তবু সময়ের থেকে একটু একটু ফাঁক করে নিতে হয় তাকে, শুনেছি সে উভয় ধরণের পড়াশোনাতেই ভাল, এখন হয়তো মাদ্রাসা ফেরত পড়তে বসেছে, এই সময়ে বড় চাচার এই উত্তপ্ত আবির্ভাব—!

গৃহ প্রবেশান্তে স্ত্রীকে এক কাপ চা করে দিতে বলি, ঘর্মাক্ত প্যান্ট-শার্ট-গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার ছেড়ে শুধুমাত্র লুঙ্গি কোমরে সুইচ দেবার সময় দেখি কারেন্ট উধাও। গোষ্ঠীর মধ্যে জীবিত একমাত্র সবচেয়ে বয়স্ক মুরুব্বি বড় চাচার গলাবাজিতে বিরক্ত এমনিতে, বয়েস হলে যেন সবাই সবজান্তা, ছেলেটার পরীক্ষা, তার আসন জুড়ে বসে উদ্ভট বকবকুনি, চেঁচামেচি, চিৎকার, গা-পোড়ানো পাষণ্ড গরম, খুব একটা ইতর কথা উচ্চারণ করি। হাঁড়িতে সফেন ভাত উথলে উঠলে যেমন করে ঢাকনা সরিয়ে দেন আমার স্ত্রীর।

হাতপাখা হাতে নিই, পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসি, স্ত্রীর দিকে তাকাই বিরূপ দৃষ্টিতে—কই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কী, রূপ-টুপ কি ফেটে বেরোচ্ছে আমার!

সে ঠোঁট একটু বাঁকায়, বাঁকানোর ধবণটা বড় চমৎকার—আহারে আমার রূপকুমার!

বললাম—আগেকার দিনের স্বামীবস্তু রোদে ঘেমে এলে সতী-সাবিত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা হাওয়া করতেন। আহা কী দিন গেছে। সে দিনে কেন জন্মালুম না। এখন শাহবানু আর তসলিমা তোমাদের মাথা খেলো। চা'টা আনো, পার যদি এক সঙ্গে এক গ্লাস লেবুর শরবতও অথবা তেঁতুলের, বিস্কুট-টিস্কুট যদি কিছু থাকে।

ফিরোজা বলল না কিছু, অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল, যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে আমি ডাক দিয়ে ফেরালাম—তিন কাপ, এক কাপ ঐ মুল্লাবেটা, এক কাপ বড়ে চাচা।

—কোন বড়ে চাচা?

—কোন আবার, ঐ বাড়ির বড়ে চাচা, গোষ্ঠীর মাথা! কোনো কাজ নেই তো! বেচারার পরীক্ষা সামনে। বসে বসে মছলা নিয়ে তর্কাতর্কি।

ও'সব পাখা-টাখা ঘুরানোর অভ্যেস নেই আমার। আমার চাচি পারতেন। তার পেটের

ছেলে যেদিন মারা যায় সেদিনই আমার আসা। তিনদিন যখন আমার, মা অচেতন ঘুমে, আমি নাকি অবিরাম কাঁদছি আর হাত-পা ছুঁড়ছি, চাচি চুপিসাড়ে এসে তুলে নিয়ে গেলেন। মায়ের দুধ খাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়েনি। আর খাবার সুযোগও ফুরিয়ে যায়, শিগ্‌গির।

মা বাইরে থাকতেন বাবার সঙ্গে। আমার জন্মের আগে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন বাবা। মায়ের মৃত্যুর চল্লিশ দিনে চাচি শিরনি করলেন। অনেক গরীব-দুঃখীকে খাওয়ানো হল। মৌলবি-মৌলানারা এসে পড়াশোনা, দুয়া-দরুদ করলেন, কোরমা-পোলাও খাইয়ে বিদায় দেবার সময় জনে জনে দেওয়া হল পারিতোষিক। বাবা তাঁর নব-অর্ধাঙ্গিনী সহ চল্লিশা শিরনির দাওয়াতে এসেছিলেন। ফিরে যখন যাচ্ছেন তখন চাচা বললেন—তুই তো আরেকটা বিয়ে করেছিস। ছেলে তোকে আল্লা আরো দেবে। এই ছেলেটা আমাকে দে। বড় খারাপ তকদির এর, জন্মাতেই মা-খাওয়া।

বাবা আপত্তি করেননি।

তা সেই চাচির আমসত্ত্বের বয়াম সরানোর তালে ছিলাম আমি, তিনি ঘুমিয়ে, চোখ বন্ধ, অথচ পাখাটা চক্কর খাচ্ছে দিব্যি ক্যাঁচক্যাঁচ, শব্দ কখনো মৃদু কখনো দ্রুতলয়ে, কখনো থেমে যাচ্ছে, হাতটা কখনো পাখাসুদ্ধ এলিয়ে তাঁর বুকের উপর পড়ে যাচ্ছে, আমি ভাবছি এই বুঝি ঘুমটা গাঢ় হয়ে এল. আলমিরার ডালা খুলতে যাব, ওটা খুলতে গেলেই ক্যাক্ করে যা বিশ্রী একটা শব্দ করে না, তাকিয়ে দেখি পাখা আবার যথারীতি ঘুরছে, তাঁর হাতখানা আর এলানো নেই।

চাচির দুধ খাবার কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নাক টিপে দুধ বের করার কথা। নাক টিপিলে কি দুধ বের করা যায়, হয়? কথাটা অনেকেই বলে বটে, মৃত্যুর পর মানুষেরা কবরগাহে মৃতদেহ দাফন-কাফন করে চল্লিশ কদম চলে আসার পর নাকি চারপাশের মাটি এসে মৃতকে এমন করে চেপে ধরে যে জন্ম নেবার পর খাওয়া সমস্তটুকু নাকমুখ দিয়ে বের করে ছাড়ে। পাখাটা ঘোরাচ্ছিলাম ডানহাতে, সেটা বামহাতে নিয়ে ডানহাতে নিজেই নিজের নাকটা টিপে ধরি। বেরিয়ে আসে আঠালো কিছু তরল, থিকথিকে, ধুলোটে। চোখের সামনে তাই তুলে ধরে দেখছিলাম, ভাবছিলাম কত কী ধুলোবালি নাসিকা দিয়ে এই দেহযন্ত্রে প্রবেশ করে, কোন রাজা বাদশার নাকি নাক দিয়ে মশা ঢুকে গিয়েছিল, তার মৃত্যু ঘটে, মৃত্যু চিন্তা কেন যে সম্প্রতি আমায় বারবার অবশ করছে, কালরাতে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি মরে গেছি, চাচি এসে জিজ্ঞেস করছেন—ফিরে কখন এলি?' এ যেন নিজ নিকেতনে ফেরা অথবা কোন স্বজন-গৃহ, ঘাম দিয়ে ঘুম ছাড়ে, পাশ ফিরে দেখি ফিরোজা অঢেল ঘুমে, ওর নাক দিয়ে এক ধরণের বিদ্‌ঘুটে শব্দ বেরোচ্ছে। ওটা বদ্-অভ্যেস ওর।

ফিরোজা এল ট্রে হাতে করে, তাতে চা, শরবত, বিস্কিট, নাসপাতির টুকরো। টেবিলে সে সব কিছু নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় খেঁকিয়ে ওঠে—এই কী হচ্ছে ও সব,

হচ্ছেটা কী, ছিঃ ঘেন্না করে না তোমার, ছিঃ ছিঃ তুমি মানুষটা মানুষ না অন্য কিছু! যাও বাথরুমে গিয়ে ভাল করে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসো। খবরদার বলছি ওই নোংরা হাতে আমার গ্লাস-কাপ কিছু ছোঁবে না।

বাথরুম থেকে এসে প্রথমে শরবতটুকু খাই, তারপর নাসপাতির টুকরোগুলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফিরোজাকে আমি খবরটা বলি—এই, কাল রাতে চাচিকে স্বপ্নে দেখলাম।

চাচির আর ছেলেপুলে হয়নি। চাচা মারা গেলে তাঁর মেয়েরা বাড়ি-জমি বিক্রি করে মা'কে তাদের কাছে নিয়ে যায়। আমি তাঁকে আমার কাছে থেকে যেতে বলেছিলাম। তিনি থাকেননি। তা ছাড়া বাড়ি জমি বিকি-কিনি, ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সে কারণে চাচিকে কখনো আমি দেখতে যাইনি। শুনতাম তিনি একে-তাকে প্রায়ই আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন।

ফিরোজার হাতে উলের কাঁটা ঘুরছে। আমার কোনা কথায় তার কান আছে কি না বুঝতে পারি না। সে আমাকে না জানিয়েই মাঝেমধ্যে চাচিকে দেখতে যেত, জানি। আমি না জানার ভান করে থেকেছি। এই ক'দিন হয় মেয়ের বাড়িতে সাধ পাঠিয়েছে ফিরোজা। সম্ভাব্য নব জাতক-জাতিকার জন্য সোয়েটার বোনায় ব্যস্ত। এরই মধ্যে কারেন্ট এসে যায়। আমি তাকে বলি—ফ্যানটা দাও।

সে প্রথমে না শোনার ভান করে। আবার বললে বলে—কাজ করছি দেখতে পাচ্ছ না?

—সামান্য স্যুইচটা দিতে গেলে তোমার কাজটা তো চলে যাবে না।

সে নড়ে না, বলে—তুমিও তো দিতে পার, অন্যকে বলা কেন?

—তোমাকে বলা মানে অন্যকে বলা হল?

—হল।

সুইচটা আমিই দিই। দিয়ে বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াই। আকাশটা এমন যে তাকানো যাচ্ছে না। ওর দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, তুমি কেয়ামতে বিশ্বাস করো?

—কেন, যেহেতু আমি মুসলমান, করি। হঠাৎ এ কথা কেন?

—কেয়ামত, হানার, শেষ বিচারের দিন সবাই, সব মানুষ একসঙ্গে এক মাঠে জড়ো হবে, তাই না?

—হবে। তো—?

একটা নাম-না-জানা পাখি দূরে কোথাও ডেকে যাচ্ছে। চাচির কথা মনে পড়ছিল আমার। স্বপ্নে তাঁর জিজ্ঞেস করা 'কখন এলি' কথাগুলো বারবার আমার কানে বাজছিল। আমি তাঁর চেহারা, তাঁর প্রিয়মুখ স্মরণে আনতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর—উফ্! কতো কতো বৎসর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে আমার! কী এক ধরণের কষ্ঠ, এক ধরণের অপরাধবোধ পীড়িত করছিল আমাকে! আমি নিজেকে ভিন্নতর কোনো চিন্তা-চেতনায় সরিয়ে নিতে চাইছিলাম,

বলি—আমার ছোটমামাকে তো চেনো, দেখোনি অবশ্য, শুনেছো আমার কাছে, তাঁর ছোট ছেলে আহমদ, ছোটমামা যখন ছোটমামীকে তালাক দিল, আহমদ কত বৎসরের, বড় জোর পাঁচ/ছ', তখন অহেতুক, তোমাদের মেয়েলোকদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ওরা ওকে জিজ্ঞেস করত—হ্যাঁরে আহমদ, তোর মা'কে মনে পড়ে? তাঁর জন্যে তোর মন কেমন করে না? তখন আহমদ কী জবাব দিত জানো?

ভেবেছিলাম ফিরোজা জিজ্ঞেস করবে আহমদ জবাবে কী বলত, তার দিক থেকে কোনোপ্রকার সাড়া নেই, আমি তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো, ফিরে তাকালাম, তার চোখ উলের কাঁটায়, আঙুল চলছে খুব দ্রুত, বললাম—সে এখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরাজি বিভাগে প্রধান, মামা'রা সবাই পার্টিশানের পর তখনকার পাকিস্তান এখনকার বাংলাদেশ হিজরত করেছিলেন, সে বলত—কিন্তু বাবা যে যেতে দেয় না। বরঞ্চ অপেক্ষা করে থাকবে সে, কেয়ামতের ময়দানে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে তার, তখন তো বাবা আর চড়-চাপড় চালাতে পারবে না।

ফিরোজা এই সময় উলের কাঁটা থামায়, বলে—অথচ এই ছেলেটিই বড় হলে স্ত্রীকে পেটাবে। তালাক দেবে।

—বড় হবার আর কী বাকী? বললাম না ইংরাজির হেড! সত্যিই, শুনেছি সে তার প্রথমাকে তালাক দিয়ে প্রাইভেট পড়ার এক ছাত্রী—

—বললাম তো।

শান দেয়া নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর তার। যেন চকচকে ধারালো ইস্পাত। আমি তা উপেক্ষা করে বললাম—আসলে কী জানো?

—কী?

—ছেলেরা যখন বউ পোড়ায়, তখন শাশুড়ি-ননদেরা উৎসব আনন্দ করে।

—জানি এই কথাই বলবে।

সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি এবার এসে বসলাম।

—চাচি নিশ্চয়ই বাড়ি নেই?

—কোন চাচি?

—বড় চাচার চাচি। উত্তরবাড়ির বড় চাচি।

—ওর বোনের মেয়ের মেয়ের বাড়ি।

—থাকেন ক'দিন বাড়ি?' বিরক্ত হই।

যুবতী কমবয়সী মেয়ে, বুড়ো-কাণ্ঠার ঘরে বসে করবেটা কী, পাকা চুল বাছবে? ফিরোজার কণ্ঠে ক্রোধ ঝরে পড়ে।

বড় চাচা হানিফ মিঞার বয়স, তিনি বলেন আটানুব্বই, আমরা অনুমান করি পঁচাশি-ছিয়াশির একটু উপর-টুপর। আমি আরেকটা সিগারেটে আগুন দিলাম।

এই চাচার প্রথমা স্ত্রী ফিরোজার আপন ফুপু। তিনি মারা গেছেন। যখন জীবিত তখন মাঝে মধ্যে ফিরোজা এসে থাকত তাঁর কাছে সে সময় তাকে দেখা। কিশোরী ফিরোজা, ছটফটে, কখনো ওর ফুপুর সঙ্গে আমাদের বাড়িও বেড়াতে আসত। তখন আমি কলেজে। অবশ্য আমাদের মধ্যে কোন তথাকথিত প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার ঘটার সুযোগ এবং সম্ভাবনা ছিল না। ওর ফুপু মারা যাবার অনেক বৎসর পর সম্বন্ধ করে আমাদের বিয়ে।

পাখিটা আর ডাকছে না অনেকক্ষণ। হয়তো সে স্থান ত্যাগ করে কোথাও উধাও। হয়তো তার গলা ধরে গেছে। To the cuckoo কবিতাটির substance আমি আমার নিজের ইংরাজিতে লিখে ফেলায় হেড স্যার আমাকে তাঁর নিজের কলমটাই দিয়ে দেন। আমার ছোটভাই সেটা হারিয়ে ফেলে। মানুষের সুখ নাম বস্তুটাও এমনি করে কেন যেন হঠাৎ করে কোথাও না কোথাও হারিয়ে যায়!

আমি লক্ষ্য করি ফিরোজার কপালে উড়ে আসা কেশগুচ্ছে ধবধবে সাদা রংএর প্রলেপ। পাতলা হয়ে যাওয়া কেশের ফোঁকর দিয়ে তালুদেশ দৃশ্যমান। অথচ একসময় তার ছিল মাথাভরা চুল। আমাদের বিয়ের পর চাচি প্রায়ই দু'একজন মেয়েকে কাজ দিতেন ফিরোজার চুল আঁচড়ে, তেল মাখিয়ে ঠিকঠাক করে খোঁপা অথবা বিনুনি বেঁধে দিতে। আমি চাচিকে চাচিই ডাকতাম, সে ডাকত মা।

দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ফিরোজা বলে—তোমার দুই মা—এক মা গর্ভধারিণী, অন্যজন বুকে তুলে নিয়েছিলেন। দু'জনই মা।

আমার কখনো কখনো বিচিত্র সব ইচ্ছে হয়, বিচিত্র ভাবনা। একদিন কথায় কথায় কী একটা ব্যাপারে আমাকে একজন বলেছিল—আপনার বয়েস হয়েছে, বুড়োমানুষ, সব কিছু আপনার খেয়াল না করাই ভালো, আগেকার সঙ্গে এখনকার দিনকে মেলাবেন না, না-পছন্দ হবে, সুখ পাবেন না। আমার সত্যিই সুখ লাভ হয় না। 'বুড়ো' বললে আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। অথচ বুড়ো তো, হতে আর বাকি কী, আমি ফিরোজার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি।

আমাদের গ্রামের এক গরীব ক্ষেতমজুর মুতলিব শেখ। সে তার স্ত্রীর কথার খুব বাধ্য। তার স্ত্রীকে সবাই বলে 'মুতলিবের আয়না'। বেচারি বেজায় চটে গালাগাল করে। আমি আমার নিজস্ব দর্পণে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে চমকে যাই। 'হরি দিন তো গেল' ...

আমি ফিরোজাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করি—তোমার দিন কেমন হল?

—মানে?' ফিরোজা চমকে যায়। বোঝা যায় সেও ভাবছিল এমন কিছু যে ভাবনা তাকে তার এই এখনকার অবস্থান এবং আমার উপস্থিতি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে, আমার গলা তাই তাকে চমকে দেয়, যেন তার ভাবনার জগতে আমার উপস্থিতি খুবই সামঞ্জস্যহীন, বেমানান, জিজ্ঞেস করে—দিন কেমন হল মানে?

আমার যে 'হরি দিন তো গেল' গানটা মনে পড়াতে কথাটা বলা সে'কথা তো সে জানে

না, জিজ্ঞেস করি—তোমার বয়েস?

—ও। সে বিরক্ত যথেষ্ট, তার হাতের কাঁটা ফের সচল হয়—তুমি মাঝে মধ্যে এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন কেন যে করো? আমার ভালো লাগে না।

—তোমার ফুপুর কথা মনে পড়ে? কী যে ভালো ছিলেন ভদ্রমহিলা। অনেকদিন দেখা গরম-গরম ভাত-তরকারি, চাচা জোহরের নামাজ পড়ে খেতে বসেছেন, প্লেটে ভাত লাগিয়ে মাছের কয়েকটা বড় বড় টুকরো চামচে তুলে চাচি বলছেন—এই মাছগুলোও খান, আপনি তো ইলিশ খেতে বড় পছন্দ করেন। চোখ জুড়িয়ে যেত, বড় সুখী সংসার, বড় আদর্শ। ফিরোজাকে খোঁচা দিই—তুমি তো কখনো এ'সব পছন্দ করো না ... ...!

ফিরোজার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য—তুমি দেখবে! যার যা দেখার বাসনা ... ...'

—মানে?

—মানে এ'দৃশ্য তোমার কখনো চোখে পড়ার নয়, কল্পনা করতে পারো, ফুপু মাছ কুটছেন, তোমার চাচা এসে পান চাইলেন, ফুপু বললেন তরকারি বসাতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, জোহরের নামাজ মসজিদে পড়ে এসেই সঙ্গে সঙ্গে ভাত না পেলে কুরুক্ষেত্র, থালিতে পান-চুন-সুপুরি সবই জুৎ করে রাখা, একটু কষ্ট করে নিজের হাতে খিলি তৈরি করে ... ...

টেবিল থেকে দৈনিকখানা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখি।

ফিরোজা বলে—তোমরা পুরুষেরা স্ত্রীকে দাসী থেকে বেশি কী ভাবো? ফুপু মাছ কুটছেন। হাত ধোবেন। তারপর পান-সুপুরি সব সাজিয়ে দেবতাব সম্মুখে নৈবেদ্য তুলে ধরবেন। দেবতার হাত-পা নেই। পানটা সেজে খেতে পারেন না। অথচ স্ত্রী পেটাবার বেলা সেই দেবতারই হাত-পা সব ঠিকঠাক চলে। প্রথমে লাথি, ঘুঁষি, তারপর ভারী পানের থালা ছুঁড়ে মারা হয় তাঁর কপালে। আমি ছিলাম সামনে। মরার পর ফুপুকে যখন শেষ গোসল করানো হচ্ছে তখনো কপালে গভীর ক্ষত। শুকোলেই দাগ আর গর্তটা থেকে গেছে। আমার চোখে চোখে তাকায় সে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—বড় সুখের সংসার! বড় আদর্শ! তাই না?' কথাগুলো বলে সে তার কাজে মন দেয়।

টেবিলে রাখা খানকয়েক ডাকে আসা কার্ড, এনভেলাপ ইত্যাদি। সবগুলোই পড়ে রাখা, আমি সেগুলো নাড়াচাড়া করি, এক দু'খানা আবার পড়ি। একজন লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন, অনুগল্প, আমার ইচ্ছে হয় সম্পাদককে লিখি, কী মশাই, ক'দিন পর আবার পরমাণু গল্প চেয়ে পাঠাবেন না তো? টেবিলে কাগজ-কলম রাখা থাকে, একখানা সাদা কাগজ টেনে নিই, মাননীয় মহাশয় লেখা হয়,.তারপর দু'ছত্র, তারপর লেখা আর এগোয় না, ছিঁড়তে থাকি কাগজখানা।

ফিরোজা আবার উলের কাঁটা থামায়। আমার কাগজ ছেঁড়া দেখে। তারপর আমি ভেবেছিলাম আমার কাগজ ছেঁড়া দেখে সে কিছু বলবে, কারণ কিছু টুকরো ফ্যানের বাতাসে

উড়ে উড়ে মেঝেয় পড়ছিল, কিন্তু না, তেমনই রাগী গলা তার, তিক্ততায় ভরা, সে প্রশ্ন রাখে—বলবে আমাকে তোমাদের পুরুষ আর নারীতে কী পার্থক্য? এই বুক, এই ... ...

অত্যন্ত অশ্লীল কিছু শব্দ উচ্চারণ করে সে। আমি তার কষ্ট বুঝতে পারি, কিন্তু তার এই নির্লজ্জতা, আমি অপ্রস্তুত বোধ করি, সে তার প্রশ্নটা এইভাবে শেষ করে—এই, এই তো পার্থক্য, দৈহিক, শারীরিক, এতে কী? এতে কী? কী এসে যাচ্ছে? কেন তোমরা এত নীচ, এত জঘন্য আচরণ করবে আমাদের প্রতি?

আমার বসে থাকা হয় না। লুঙ্গি, গামছা, সাবান, জোগাড় করে বাইরের পুকুরে গোসল করতে যাই। ফিরোজা রান্নাঘরে কাজ করতে গেছে। আজ একটা মুরগি জবাই হয়েছে, ডিমা মুরগী, ডিমগুলো নাকি ভেতরে ভেঙে গেছে, দিন কতক থেকে ঝিমোচ্ছিল, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, বাধ্য হয়ে জবাই করতে হয়েছে, ফিরোজা মুর্গীটাকে শুধু গাল পাড়ছিল, ওটাই নাকি এর জন্য দায়ী! ভাবছিলাম আজ খেতে বসে একটু বেশিই খাওয়া যাবে। একটু পোলাও করতে বলেছি ফিরোজাকে।

জোহরের নামাজ পড়ায় মুল্লা ছোকরাই। বাকী নামাজটা আমি। আজ ও পড়া শেষ করার পর আমার কাছে এগিয়ে আসে। বুঝলাম কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করলাম—কিছু বলবে?

সঙ্কোচে সে কুঁকড়ে যাবে প্রায়—আজ উনার ঘরে খাবার কথা ছিল, মানে আপনার বড় চাচার।

—তো?

—হানিফ দাদার ঘরের দাদি তো বাড়ি নেই।

—জানি।

—তিনি সকাল বেলা রাতের ঠাণ্ডা ভাত ছিল, তাই খেয়েছেন। দুপুরে রাঁধেননি। আমি সকালেও না খেয়ে মাদ্রাসায় গেছি।

বড় চাচাকে দেখলাম নামাজ শেষ করে কবর জিয়ারত করছেন। কবরখানা মসজিদের সামনেই। তাঁর দোয়া-দরুদ পড়া শেষ হলে আমি ডাকলাম—চাচা।

—কে? ও রহমত। কী ব্যাপার?

গলার স্বর তাঁর বেশ রুক্ষ। লোকে বলে আম পাকলে মিঠা, মানুষ পাকলে তিতা। খুব দরকার না পড়লে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলি না। বললাম—ব্যাপার কিছু না, আজ দুপুরে আমার ঘরে আপনার দাওয়াত।

—হঠাৎ?

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়—অর্থাৎ আজ কিনা ফিরোজার মরহুমা ফুপুর ওকাতের দিন।

অদ্ভুত কী রকম করে যেন তাকালেন তিনি, বললেন না কিছু, কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর সম্মতি জানালেন—ঠিক আছে, যাব, একবার বাড়ি থেকে আসি।

মুল্লা ছেলের খাবার মসজিদে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ছেলে তিনটে, আমি আর চাচা একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসলাম। ফিরোজার মুখ কালো। সে পরিবেশন করছিল। আমি খেতে খেতে বড়চাচাকে বললাম—আমার মনে পড়ছে মরহুমা চাচি আপনাকে কী আদরে পাখার বাতাস করতেন, কী আদরে মাছের সব বড় টুকরো আপনার পাতে তুলে দিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না।

তাঁর চোখের ভুরু খুব ঘন আর লম্বা। বয়সের কারণে অক্ষিগোলক বেশ ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, চামড়াও ঝুলে পড়ে সেগুলো অন্যের চোখে প্রায় অদৃশ্য করে রেখেছে। তিনি চোখ তুলে প্রথমে আমাকে দেখলেন। তারপর ফিরোজাকে। আমার ছেলেগুলো একটু গা-টেপাটেপি, হাসাহাসি করছিল। আমি চোখে চোখে তাদের সতর্ক করে দিলাম। তিনি তাদেরও দেখলেন। তারপর ভাতের থালায় আবার চোখ রেখে বললেন—সবদিন আর কি সমান যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই—চাচি তো প্রায়ই বাড়ি থাকেন না। আপনি এই বয়েসেও রান্না করে খেতে পারেন বেশ। আমার হাতে তো এক কাপ চা করাও হয় না।

একটু হাসতে চেষ্টা করি।

তিনি কোনো উত্তর করেন না।

ফিরোজা এখন আর বড় চাচাকে ফুপা বলে ডাকে না। আমার সম্পর্কে সম্পর্ক রাখে। জিজ্ঞেস করল আচমকা—পান-সুপারি এখনো খান বড় চাচা? নিজের হাতে খিলি করে? নাকি এখনকার চাচি ... ?'

খোঁচাটা ধরতে পারলেন না বড় চাচা, ভাত মাখছিলেন, আঙুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করে, বললেন, কণ্ঠে নিরুপায়তার হাহাকার—সকালে আমার ভুখ মরেনি বৌমা, রাতের কিছু ভাত ছিল, আলস্য করে রাঁধলাম না, খেতে গিয়ে দেখি পিঁপড়ে উঠেছে, ধুয়ে খেলাম, তাও সব পিঁপড়ে গেল না, চোখেও কম দেখি।

আমি ফিরোজার দিকে তাকালাম। জীবনে এই প্রথম ইচ্ছে হল তাকে মার দিই। দেখি সে হাসছে। আমাকে তাকাতে দেখে সে আমার কাছে এগিয়ে আসে—তোমাকে আর একটু পোলাও দিই, অনেকদিন পর পোলাও হয়েছে ঘরে, তুমি খুব শখ করো তাই ... ..'

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী

গভীর অসুখ

হাসান আপত্তি করেছিল। আসলে সেবু'র বোঝা উচিত ছিল। এ কি ধরণের অদ্ভুত, আপত্তিকর আব্দার! বলেছিল, 'না সেবু, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আদর্শ বল্‌বো না, তবে আমার একটা বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস নষ্ট করতে বলিস না।'

সেবু একটা সিগারেট ধরিয়েছে। অনেক দামী সিগারেট। প্যাকেটটা পকেটে রেখে বসেছে—তোকে দিলাম না। জানি তুই নির্বি না।

হাসান বলেছে—না, আমার চার্মিনারই চলে। খুব সাধারণ একটা ইস্কুল মাস্টারের বিলাসিতা পোষায় না!

সাহাবুদ্দিন ওরফে সেবু হেসেছে।

—তুই একটুও বদ্‌লাস্‌ নি। সেই আগের মতো জিদ্দি ... ...

—দিল্লি থাকতে থাকতে তুই বাংলাটা ভুলে যাচ্ছিস দেখছি! কথাটা হবে জেদী।' হাসান বলেছে—তা জেদ জিনিসটা কি সব সময় খারাপ বলে মনে হয় তোর?

—কি জানি বাপ, তোর সঙ্গে কথা বলতেই ভয়! তোর কথা যখন মনে এল, তখন থেকেই ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাকে জিততেই হবে, পার্টি বলে দিয়েছে, যে কোনো উপায়ে, বাই হুক অর ক্রুক!

—ক্রুকদের মাঠে নামিয়ে তোরা তো গতবারও জিতলি, এবারও নামাবি, তাতে অসুবিধেটা কি! আমাকে বাদ দে। তোদের লাইনের রাজনীতি আমি কোনোদিন করিনি।

—তোর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব না সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি। কিন্তু তোর লাইন, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোর লাইনের লোকগুলো কী করছে? খবর রাখিস্‌?

—না। অনেকদিন আমি এ সবে নেই। আমার অনেক কাজ। পারিবারিক অশান্তি। শরীরটা

ভালো যাচ্ছে না। লেখালেখিও ছেড়ে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ, শুনেছি এখন নাকি লিখছিস না। কিন্তু কেন?

—ও কথা থাক। তুইও তো একসময় লিখতিস্!

—লিখতাম। এখন লিখি না। লেখার সময় পাই না।

কাজের মেয়ের হাতে চা, বিস্কিট ট্রে-তে করে। নঈমা এসে ঢোকে। সেবুকে বলে—যা হোক এতোদিনে অমাবস্যার চাঁদ দেখা গেল, স্লামালিকুম!'

—ওয়ালিকুম, ভালো আছেন নিশ্চয়ই, জিভ দেখছি আরো ধারালো হয়েছে!

—মুখ নেড়েই তো আপনার বন্ধু রোজগার করে, ইস্কুলের মাস্টার, আর আমি তো মেয়েমানুষ, মুখ নাড়ার বদনাম মেয়েদের চিরকাল, আপনার বন্ধু এই নিয়ে ঝগড়া করে দু'দিন থেকে কথা বলছে না।

—তাই বুঝি? মিঞা-বিবি'র মান-অভিমানের পালা চলছে, ভাবীর জন্যে গোঁসা-ঘর একখানা তৈরী করলে পারতিস্!' সেবু পরিহাস করে।

—থাকার জন্যে ঘর তৈরী করতে পারিনি এতোদিনে, বিবির জন্যে গোঁসাঘর?

হাসান একটা চার্মিনার ধরায়।

সেবু চায়ের কাপটা টেনে নেয়, নঈমাকে বলে, 'ভাবী, এবারও ভোটে দাঁড়িয়েছি, পুরানো পাপী! ভোট দেবেন কিন্তু। গতবার তো শুনেছি ভোট দিতেই যাননি।'

—গিয়ে প্রাণ হারাবো নাকি? আমাদের সেন্টারে তো মারামারি হয়েছিল। শুনেছি কারা নাকি বন্দুক-টন্দুকও নিয়ে এসেছিল। ভাগ্যিস, গুলিগোলা চলেনি!

—ওরা ওর দলের লোক!' দু'দিন পর নঈমার কথার উত্তরে প্রথম কথা বলল হাসান।

সেবু এবারও হাসল, 'তোর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেই এসেছি, তোকে তো আগেই বলেছি।'

হাসান কথা বলল না। চুপ করে থাকল।

—শুনলাম লেখালেখির কথা চলছে,' নঈমা কথা বলে—আপনার বন্ধুও এখন লেখা ছেড়ে দিচ্ছে। আপনি তো লিখেনই না। কেন? শুনেছি একসময় খুব ভালো লিখতেন।

—ভালো কি না জানি না, তবে লিখতাম। এখন সত্যিই সময় পাইনা। আর লিখেটিকে কী হয়? আপনার স্বামী তো লিখছে অনেকদিন। কী হয়েছে? কী পেল? একখানা বই পর্যন্ত ছেপে বের করতে পারে নি।

নঈমা জিজ্ঞেস করল—বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? ভাবী কেমন? একদিন নিয়ে এলে পারতেন।

—আপনার ভাবী তো দিল্লি ছেড়ে আসতেই চায় না। ছেলেমেয়েদের ওখানকার ইস্কুলে পড়াচ্ছে। তখন আসে যখন ওর বাপের বাড়ির কারোর অসুখ-বিসুখ, বিয়ে-টিয়ে হয়।

আমার ভাইয়ের মেয়ের গতবার বিয়ে হল। আমার তখন বিদেশ যাবার কথা। ওকে বললাম। ও এলো না। বুঝতেই পারছেন। আছে ভালো একপ্রকার।

—অথচ বলছিস্, এখানকার লোকগুলো তোকে ভোট দেবে,' হাসান বলল—আর তোর জন্য আমি ওদের বলতে যাব! আগে তো আরো দুইবার গেলি, কী করেছিস মানুষের জন্যে?'

নঈমা বাধা দিল—এতোদিনে সেবুভাই এলেন আমাদের এখানে আর তোমার কথা বলার ধরণ কি?

সেবু বলল—দেখুন না, হাসানের কী ধরণের ভদ্রতা, আমার দলকে তো সে কখনো ভোট দেয় নি, এমনকি আমি নিজেও যে গত দু'বার দাঁড়িয়েছি, দেয়নি আমাকেও। আপনাকেও গতবার দিতে দিল না।

হাসান চুপ করে সিগারেট টানে। সেবু বলে—অথচ পাঠশালার প্রথম শ্রেণী থেকে কলেজের শেষ বছর পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়েছি। শুধু পড়া নয়, বন্ধুত্বটাও। একসঙ্গে আড্ডা, সিনেমা দেখতে যাওয়া, লেখালেখি। এমনকি, সেবু একটু মৃচকি হাসে, এমনকি, মেয়েদের পেছন লাইন-মারা পর্যন্ত।

হাসান ধমক দেয়—এই ভালো হবে না বলছি!

—কেন বাপজান, ভাবী শুনে ফেলছে এজন্য? বলতো তাকে সেই যে মেয়ে, কি যেন নাম, তুই চিঠি লিখেছিলি, মেয়েটা তোকে একদিন সবার সামনে দাঁড় করিয়ে একটা থাপ্পড়, তারপর চিঠিখানা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়! বছর-দুই আগে গুয়াহাটিতে এক সভায় দেখি তাকে। একটা কলেজে পড়াচ্ছে। এখনও বিয়েটিয়ে করেনি। খবর নিয়ে দেখবি?

নঈমা হাসল—ছিঃ। ওসব গোপন কথা কি অন্য কারোর সামনে বলতে আছে? আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ করছেন সেবুভাই, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাত!

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—আপনি কথা বলুন। আমার একটু কাজ আছে। আসছি শিগ্‌গির।

সারাদিনের গরম, ধুলোবালি, এক জনসভা থেকে আরেক পথসভা, হাসানের খুব ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল। সেবু গাড়িতে বসেই মাঝেমধ্যে অল্পস্বল্প ড্রিংকস্ নিচ্ছিল। গাড়িতে শুধু সে আর হাসান। চেলাচামুণ্ডা, পেটি গেঁয়ো—শহুরে নেতৃবৃন্দ সঙ্গের অন্যান্য গোটা পাঁচেক গাড়িতে। চা-টা, এটা-সেটা খাওয়া অনেক হয়েছে। আর কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না হাসানের। অনেক কিছুই দেখছিল সে, মানুষের লোভ, চক্রান্ত, দ্বেষ, দলাদলি, চাটুকারিতা, এ'সব তাকে আরো ক্লান্ত, বিমর্ষ করছিল। মানুষের উপর বিশ্বাস যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার, আজ সেটুকুও হারাল। দেশে দলের অভাব নেই। কোন দল থেকে কোন দল ভালো, কোন মানুষ থেকে কোন মানুষটা? এ'দেশ একদিন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবছিল সে। সেবু বলছিল, 'একটু গলা

ভেজা। ভালো লাগবে।'

হাসান বলেছে—না, তুই খা।

সেবু তবু জোর করেছে—অনেক বড় বড় লেখকরা খায়। ওরা অনেকেই আমাদের কাছে আসে। বলে, না খেলে নাকি লেখা আসে না ওদের। তুইও খা। লিখতে পারিস না। তোরও লেখা আসবে।

—না থাক। এখনও মাঝেমধ্যে লিখি, ভাবছি এখন পুরো ছেড়ে দেব। আচ্ছা, তুই কি খুব নামাজ রোজা করিস্?

—না তো!' সেবু আশ্চর্য হয়।—এখন আবার নামাজ-রোজার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?'

—দেখলাম পেটে মদ নিয়ে তুই একেক জায়গায় গিয়ে একেকবারে জোহর—আছর দু'ওয়াক্তের নামাজ আজ ক'বার পড়া হল মোট?

—ওহ্ এই কথা! বেওকুফ্, এটা ভোটের নামাজ! তুই একেবারে গর্দভ থেকে গেলি। মানুষ হ। সময় আছে এখনো।

চাকরী ছেড়ে দে। কন্ট্রাক্টরী ধর, অথবা অন্য কোনো লাইনের ব্যবসা। আমার সরকার হলে তোকে লাখ-লাখ টাকার কাজ পাইয়ে দেব। শালা জানিস্ না, ভোটের জন্য আমাদের অনেক কিছু করতে হয়।

হাসান বোতলটা ওর হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখল. বলল—বেশী হয়ে যাচ্ছে, মুখ থেকে গন্ধ বেরোলে অথবা টালমাটাল পায়ে হাঁটলে ওরা বুঝে ফেলবে তুই একটা আস্ত মাতাল।

সেবু রাগ করে—শালা, তুই আমাকে গাল দিচ্ছিস!

—না, মাতালটা গালি নয় বন্ধু! সমস্ত দেশটা আজ মাতাল, মাতাল শাসক, মাতাল শাসিত। বলছিলাম নামাজের কথা এই জন্যে, তুই দেখছি মুসলমানদের কাছে গেলে কতো বড় মুসলমা, হিন্দুদের কাছে গেলে আহা কতো সংহতি সংহতি, ভাই-ভাই, ওম্ শান্তি শান্তি!

সেবু রাগ করে—শালা আহাম্মক, তুই কি ভাবিস হিন্দুরা আমাকে একটা ভোটও দেবে, ওদের কাছে গেলে আমাকে বাধ্য হয়ে মেনি বেড়াল সাজতে হয়, পার্টির বলাই আছে, যে কোনো উপায়ে, হিন্দুরা হিন্দুদের, মুসলমানরা মুসলমানদের—'

—বাই হুক অর ক্রুক, তাই নয় কি?' হাসান খোঁচা দেয়।

সেবু রাগে না, বলে—আয়, তোকে একটা হিন্দু গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি। নিজের চোখে দেখে আসবি।

বাড়ি বাড়ি যাওয়া হল। গ্রামের শেষমাথায় শেষবাড়িতে ওরা গিয়ে যখন ঢুকল, তখন সাদা থান পরা পরিষ্কার এক মহিলা বেরোলেন। সেবু চেয়ার ছেড়ে উঠে খুব বিনীত নমস্কার

জানাল—'আমি সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ভোটে দাঁড়িয়েছি, এলাম আপনাদের কাছে, ভোটটা দেবেন দয়া করে।'

ভদ্রমহিলা বললেন—আপনার নাম শুনেছি। আমার বাড়িতে তো মাত্র দু'টো ভোট। আমার আর আমার মেয়ের। মেয়েটা ম্যাট্রিক দিয়ে বসে আছে অনেকদিন। চাকুরী নেই। ছেলেটা বি.এ পাশ করে বসে বসে এখন আইজলে আমাদের গ্রামের এক মুসলমান ভদ্রলোকের ভুষিমালের দোকানে কাজ করে।

সেবু বলল—ভোটটা হয়ে যাক। তারপর আপনার ছেলে-মেয়েকে কাগজপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন, একটা ব্যবস্থা করে দেব।

ভদ্রমহিলা বললেন—আপনাদের তো এম.পি-র এখন নতুন করে নির্বাচন হচ্ছে। গত নির্বাচনে যিনি এম.এল.এ বলেছিলেন চাকুরী দেবেন!

ওর মেয়ে সম্ভবত আঠারো-উনিশের, এসে একসময় দাঁড়িয়েছিল মায়ের কাছে। বলল—আপনাকে ভোট আমরা দেব না, আগে চাকরী, পরে ভোট। ও'সব ভুয়া প্রতিশ্রুতি আমাদের অনেক পাওয়া হয়ে গেছে।

হাসান জিজ্ঞেস করল—তোমার নাম?

—নাম দিয়ে কী করবেন?' উদ্ধত প্রশ্ন করল মেয়েটি—পুলিশে দেবেন?'

—না, আমি পুলিশের লোক নই। আর নাম তো জানি ব্যক্তিকে জানাচেনার জন্যেই রাখা হয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে। নাম জানতে চাওয়া শুধু পুলিশে দেবার জন্যেই, এ ধারণা তোমার কেন হল?

ওর মা বললেন—ও আমার মেয়ে। ওর নাম অপরাজিতা।

—বেশ সুন্দর নাম! অচ্ছা বলো তো অপরাজিতা, পৃথিবীর সবাই, সব দেশের, সরকারী চাকুরী পাবে এমনটা কি সম্ভব?

—সবার কথা জানি না। আমি আমার, আমাদের কথা বলছি।

—হ্যাঁ আমাদের, আমাদের কথাই বলছি আমিও। শুধু তোমাদের একভাই, একবোন মিলিয়ে আমাদের না, এ দেশের সবার আমাদের। বলো তো, এটা কি সম্ভব? কে গেলে, কাকে ভোট দিলে সবাইর চাকরী হয়ে যাবে?

মেয়েটা এবার স্পষ্ট করে বলে—অতো সব জানি না, পরিষ্কার কথা, আমরা কোনো মুসলমানকে ভোট দেব না।

ভদ্রমহিলা ধমকে ওঠেন—এসব কি বলছিস, চুপ কর অপরাজিতা! আপনারা কিছু মনে করবেন না।

হাসান বলল—ওকে ধমকাবেন না। ওকে যা শেখানো হয়েছে, ও সে কথাই বলছে, লুকোয়নি। অনেকেই লুকোয়। কিন্তু একজন মুসলমানকেও বলা হয় কাজ-টাজ-যোগ্যতা দেখার দরকার নেই শুধু মুসলমান দেখে ভোট দাও, হয় সে অসৎও হোক! আসলে এ দেশে

এখন নিয়ম হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানেরা মুসলমানদের ভোট দেবে, হিন্দুরা হিন্দুদের। এর ফলে কী দাঁড়াচ্ছে? হিংসা, রক্তারক্তি, ভাইয়ে-ভাইয়ে ... ...'

মেয়েটা ঠোঁট ওল্টালো—হুঁহ্, ভাই!

হাসান জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ভাই। অপরাজিতা, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ভাই। এ আমি বলছি সাহাবুদ্দিন চৌধুরী তোমাদের কাছে ভোট চাইতে এসেছেন এজন্যে নয়। ওকে তোমরা ভোট না দিলেও আমার কিছু এসে যাবেনা। কিন্তু আমি বলছি, হিন্দু-মুসলমানেরা পরস্পরের ভাই। একই দেশে একই আবহাওয়ায় একই খাদ্যাভ্যাসে মানুষ। এই আমাকে দেখো, পিছিয়ে গেলে ছ'পুরুষ আগে আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু। আমরা কেউই আরব-ইরান থেকে আসি নি। কোনো কার্যকারণে ওদের কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে থাকবেন, কিন্তু রক্ত তো বদলে যায় নি—'

সেবু পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি আমার বন্ধু হাসান ফারুক, বিখ্যাত সাহিত্যিক—'

হাসান বাধা দিল—আহ্ সেবু—'

ভদ্রমহিলা যেন নতুন করে দেখলেন হাসানকে। মুহূর্তখানেক, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে কিছু করো না বাবা, তোমার বাবার নাম?'

—আব্বাছ্ মজুমদার। তিনি নেই।

—কী ভাগ্য, তুমি আব্বাছ্ ভাইয়ের ছেলে হাসান?

ভদ্রমহিলা যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, 'কিছু মনে করো না বাবা, চেনতে পারিনি আমি, খুবই লজ্জার কথা! এই অপরাজিতা, মাফ চা, মাফ চা এঁদের কাছে। আমরা তোমাদের ভোট দেব বাবা। আসলে কি জানো বাবারা, কিছু মানুষ এমন সব কথা বলে—'

সেবু ঢোঁক গিলল।

ম্লান কণ্ঠে বলল—জানি।

হাসান জিজ্ঞেস করল—আপনি বাবাকে চেনেন?

—ঠিক আমি চিনি না বাবা। চেনতেন ওর বাবা। তোর বাবার নামটা বল্ না অপু।

অপু বলল—তিনি মারা গেছেন। নাম ছিল অভয় চক্রবর্তী।

হাসান যেন হোঁচট খেয়ে থমকে গেছে!

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন—চেনতে পেরেছো? উনি তো তোমাকে চেনতেন! বলতেন তোমার কথা সবসময়। বলতেন 'হাসান আববাছের ছেলে। ছেলেটা কি ভলো! ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছি শুনে কি আদরই না করল! তোমার দেয়া একশোটা টাকা সেদিন আমাদের খুব কাজে এসেছিল। দু'দিনের উপোস—'

হাসান অসুস্থ বোধ করছিল এক ধরণের কষ্টদায়ক বিষণ্ণতা এসে তাকে ঘিরে নিচ্ছিল ক্রমশ। সেবুকে সে বলল—আমি বাড়ি যাব সেবু, আমার ভাল লাগছে না। তোর আর

কোথাও যাওয়ার থাকে তুই যা। আমাকে পাঠিয়ে দে—'

সেবু বলল—আজকের বাকী কাজটা ওরাই করবে। আমিও ফিরব। তোর কি হঠাৎ অসুবিধে হচ্ছে?

হাসান জবাব দিল না। উঠে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল, 'আমাকে মাফ করবেন, অভয়কাকুর কাছে আমার অনেক অপরাধ, তিনি নেই, আসলে আমার কখনো কখনো কেন এমন হয়ে যায়! আমি কার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি?

ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—কি ব্যাপার বাবা, তুমি আবার ক্ষমা চাইতে যাবে কেন? উনি তো তোমার কত প্রশংসা করলেন, বললেন আবার কোনো অসুবিধা পড়লে তুমি যেতে বলে দিয়েছ, লজ্জায় আর যাননি, ওনার ক্যান্সার হয়েছিল গলায়, বলতেন 'হাসানকে খবর দিলে ... ..., ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছি,' আবার আমাদের খবর দিতে নিষেধ দিতেন, বলতেন, ' ও শুনলে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, অযথা টাকাপয়সা খরচ, দৌড়োদৌড়ি, ওরও তো অভাব অনটন, ছেলেপিলে আছে, তোমার বাবার সঙ্গে ওর খুব ভালোবাসা ছিল বাবা—'

হাসান চুপ করে থাকে। কিছু বলে না।

সেবু ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়িতে হাসান চুপচাপ বসেছিল। সিগারেট একটার পর একটা পোড়াচ্ছিল। দেখতে দেখতে একসময় সেবু জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি বলবি?

অনেকক্ষণ পর হাসান কথা বলল—কিছু না। তুই বুঝবি না।

সেবু জেদ ধরে—বলে দেখ না। বুঝি কি না বুঝি!

—শুনলি তো অভয় চক্রবর্তী বাবার সঙ্গে পড়ত, ক্লাসমেট।

—সে তো শুনলাম। অমন ক্লাসমেট তো সবারই থাকে। তাতে কি?

—তাতে অনেক কিছু। তুইও তো একসঙ্গে পড়ার দোহাই দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলি। অভয় চক্রবর্তী একদিন আমার বাড়ি গিয়েছিলেন সেদিনও তোর ভাবীর সঙ্গে আমার ঝগড়া। কি একটা দরকারী কাগজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না ... . .'

হাসান সেদিন কাগজটা খুঁজে দিতে বলছিল নঈমাকে। নঈমা একখানা গল্পের বই পড়ছিল। গা করেনি। দু-তিনবার তাড়া দেয়াতে বলেছিল, 'তোমার কাগজ তুমি কোথায় রাখো আমি কি জানি! তুমিই দেখে বের করো। আমি এখন পড়ছি।'

হাসান বলেছিল—আমার কথা থেকে তোমার পড়া বড় হল? আলমারিতে রাখা ছিল। সেখানে পাচ্ছি না। তুমি খুঁজে দেখতে পার না?

—না পারি না। আমি তোমার কাগজপত্র নাড়ি না। কি সব কোথায় রাখো কে কার জানে? ভালো করে খুঁজে দেখ, পাবে।

আরো কিছুক্ষণ কাগজপত্র, বই-টই উলোট-পালট, ছুঁড়েটুড়ে ফেলে খুঁজেছে হাসান।

তারপর ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করেছে, 'খুঁজে দেখবে কি না বলো!'

নঈমা রাগ দেখিয়ে বই ছুঁড়ে ফেলে উঠেছে। অনেক সময় কাগজখানা খুঁজেপেতে দেখেছে। তারপর হাসানকে বলেছে, 'আমি আর পারবো না! তুমিই খুঁজেপেতে দেখো। আমার কাজ আছে।'

হাসানের মেজাজ সেদিন কী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, নঈমা হয়তো বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে, একটু ধৈর্য ধরে কথা বল্লে, সেদিন যা ঘটে গেল তা হয়তো ঘটত না। হাসান নিজেও পরে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন তো ঘটনাকে ফেরানো যায় না। হাসান খুব জোরে পর পর দুটো থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছিল নঈমার গালে।

নঈমা বসে কাঁদছিল আর হাসান শুয়ে শুয়ে সিলিং ফ্যানে চোখ রেখে যখন একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছিল, তখন কাজের মেয়েটা এসে বলল, 'বাইরে একজন লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

—তাকে বল্ গিয়ে এখন দেখা হবে না। পরে আসতে বলবি।

—বলেছি। লোকটা কথা শোনেনা। বলে তার খুব দরকার।

—তোকে বললাম না, বল্ গিয়ে যা, এখন দেখা হবে না। যেতে বলবি ওকে।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটা ফিলে এল—যায় না তো লোকটা!'

—যায় না।' রাগটা কিছু থিতিয়ে এসেছিল, আবার পূর্বে অবস্থায় ফিরে এল।

বাইরের ঘরের বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে বসেছিল লোকটা। বেরিয়ে এলো হাসান। স্পষ্ট রাগ কন্ঠে, জিজ্ঞেস করল—'কে আপনি? কী চান?'

ময়লা ধূতি একখানা হাঁটু পর্যন্ত, ততোধিক ময়লা একটা শার্ট কাঁধে ফেলা, ধুলোয় ধূসর গোড়ালি ফাটা একজোড়া পা— লোকটা ধমক খেয়ে, উঠে দাঁড়াল, কাঁপা গলায় বলল, 'বাবা আমি—'

আর বলতে পারল না। কেঁদে ফেলল হু-হু করে। অনেক কষ্টে এরপর কান্না গিলে বলতে পারল—'বাবা, আমি দু'দিন ধরে খাইনি, তাই তোমার কাছে এলাম।'

লোকটার 'তুমি' করে কথা বলা ভালো লাগল না হাসানের। একহাতে চেয়ারটা টেনে কাছে আনল, বসল না, না বসেই বলল—তুমি খাওনি, তা আমার কাছে কেন, কে তুমি?

—তুমি আমাকে চেন না। আমি একটা চাকরী করতাম। হঠাৎ করে একদিন চাকরীটা চলে গেল। এক ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে বড় কষ্টে আছি। জমিজমা যা ছিল সব শেষ। এখন উপোস। আমাকে দেখছ, এই রোগা শরীর। পরিশ্রমের কাজ করতে পারি না। আমাকে যদি কিছু সাহায্য করতে, আমি তোমার বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছি। ক্লাসমেট। আব্বাছ আমাকে খুব ভালবাসত। আমার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল।

বুড়োর বিয়ের স্মৃতিকথা শুনে হাসানের হাসতে ইচ্ছে হল। ওকে বসতে বলেনি। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। হাসান চেয়ারে বসে চুপ করে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল। চাগিয়ে ওঠা রাগটাকে সামাল দিতে চেষ্টা করছিল সে। লোকটা বলল, 'আমার নাম অভয়, অভয় চক্রবর্তী। এই পাশের গ্রামে পরের গ্রামে আমার বাড়ি। সেদিন একজন বলল তুমি আব্বাছের ছেলে। পত্রিকায় নাকি লেখালেখি করো। তোমার তো কিছু জমিজমাও আছে। অবশ্য তোমার বাপের বাপ তার বাপের কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন তার সবটা রাখতে পারেন নি। খানদানি পরিবারগুলো ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। খুব আশা করে এসেছি তোমার কাছে, অনেকেই বলল, আব্বাছের ছেলে থাকতে তুমি কেন অনাহারে থাকবে!

হাসানের রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল কথা শুনে। তবু যথাসম্ভব সংযত হয়ে কাজের মেয়েটাকে ডাকল গলা চড়িয়ে, 'এই জোবেদা, জোবেদা—'

জোবেদা এলে তাকে বলল—'ছোট আমূলের টিন দিয়ে একটিন চাল এনে দে এঁকে—'

অভয় বললেন—একটিন চাল দিয়ে কী করব আমি?

—কেন ভাত রেঁধে খাবেন! আপনি তো বলছিলেন দু'দিন খাননি!

—আমি তো ভিখারী নই বাবা। এসেছিলাম তুমি আব্বাছের ছেলে, আব্বাছের সঙ্গে আমার এতো বন্ধুত্ব ছিল যে ওর বাড়িতে এলে আমি ওর পাতে খেতাম, আমাব বাড়িতে গেলে সে আমার পাতে। আমার মা'কে ও মা ডাকত, ওর মা'কে আমি মা ডেকেছি। বিশ্বেস করো তার মায়ের কাছে নিজের মায়ের চেয়ে কম আদর পাই নি। তুমি আব্বাছের না হয়ে আমার ছেলেও হতে পারতে!

হাসান রেগে গেল—খুব তো কথা বলতে শিখেছেন দেখছি, আরেকজনের ছেলে আপনার ছেলে হয়ে গেল? আর এসব ভিক্ষে নয়তো কি? এতো যদি মানের বড়াই, তবে এসেছেন কেন? কোথাকার কে, না তোমার বাবার ক্লাসমেট, যত্তোসব!

হাসান সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

সন্ধের পর বাড়িতে থাকলে লেখার টেবিলে চা নিয়ে আসে নঈমা। হাসান লিখছিল না। সেদিনের দৈনিকখানা পড়তে চেষ্টা করছিল। পারছিল না। নঈমার বদলে সে সন্ধ্যায় চা নিয়ে এল জোবেদা। হাসান জিজ্ঞেস করল—তোর আম্মা কোথায় রে?

—শুয়ে আছে।

—শোয়া থেকে ওঠেনি একেবারে?

—উঠেছিল একবার। সেই লোকটা, যাকে তুমি বকা দিলে, সে যাচ্ছিল না। বসেছিল। বসে বসে কাঁদছিল। আমি দেখে এসে আম্মাকে বললাম।

—আমাকে বললি না কেন?

—তুমি আবার গিয়ে ওকে বকা দেবে!

—তাই বুঝি?' কাজের এই মেয়েটাকে হাসান কখনো বকাঝকা কখনো আবার খুব আদর করে। ছোট্ট ন' দশ বছরের। ওর বাবা রিকশ চালায়। মা নেই। হাসান ওকে একেবারে নিয়ে এসেছে। এখন খাওয়া-পরা দেবে। ওর বেতন ব্যাঙ্কে জমা হবে। বড় হলে বিয়ে-টিয়েরও ব্যবস্থা করবে সে। অবসর সময়ে ওকে পড়ায় কখনো হাসান, কখনো নঈমা। হাসান মেয়েটার কানে একটা মৃদু টোকা দিল, 'তাই বুঝি দুষ্টু মেয়ে! তোর বুঝি ভালো লাগছিল না ওকে বকতে দেখে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে মেয়েটা বলল—জানো, আম্মা শুনে কি করল, ওকে চা-বিস্কিট আমাকে দিয়ে পাঠাল। তারপর নিজে গিয়ে একশ'টা টাকা দিল, ঘরে কলা আছে না, তাই থেকে দু'হালি কলাও দিয়েছে। আব্বা, তুমি কেন খামোখা আম্মাকে মারতে গেলে?

মেয়েটা কখনো তাকে 'আপনি', কখনো 'তুমি' বলে, যখন যেমন ইচ্ছে।

সেবু ওকে বাড়ির পথে নামিয়ে দিয়ে গেল। বলল, 'ভোটের আরো পাঁচদিন বাকি। খুব ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। দেখা হবে তোর সঙ্গে। ভাবীকে বলিস্ আর একদিন আসব, পারলে সবাইকে নিয়ে। চলি, ভালো থাকিস্।'

ভালো থাকা হচ্ছিল না হাসানের' মাথাটা অসম্ভব ধরেছিল। কানের দু'পাশের রগ, ঘাড়ের পেছনটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। অসহ্য কষ্ট। কোনোমতে বাড়ি গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। শুয়ে পড়ে ডাকল জোবেদাকে। জোবেদা এলে জিজ্ঞেস করল—তোর আম্মা কোথায় রে?

—মাছ কুটছে।

—একটু আসতে বলিস।

নঈমা এল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল—'আমাকে ডেকেছিলে?'

রাগটা এসে যাচ্ছিল হাসানের। সংযত করল।

বলল—বসো। আমার কাছে বসো। উফ্, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু হাত রাখবে?

নঈমা ওর মাথাটা টিপে দিতে থাকল। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল—একটু আরাম হচ্ছে?

হাসান বলল—জানো আজ হঠাৎ অভয় চক্রবর্তীর বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সেই যে অভয় চক্রবর্তী, মনে আছে তোমার?

নঈমা বলল—মনে আছে। ওর বাড়িতে ভোটের জন্যে গিয়েছিলে?

—আমি তো জানিনা ওটা ওর বাড়ি। সেবু ওদের গ্রামে বাড়ি-বাড়ি যাচ্ছিল। গিয়ে জানতে পারলাম।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'ভদ্রলোক মারা গেছেন। গলায় ক্যান্সার। বেঁচে থাকলে ওর মুখোমুখি সত্যি দাঁড়াতে পারতাম না।'

—কেন তুমি মানুষের সঙ্গে মাঝেমধ্যে এমন খারাপ ব্যবহার করো?

—মনে নেই সেদিন তোমাকে মেরেছিলাম? মন-মেজাজ সেদিন এত্তো খারাপ ছিল।

আচ্ছা কখনো কেন আমার এমন হয়ে যায় বলতে পারো?

নঈমা উত্তর করে না। উঠে।

হাসান জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাচ্ছো?

— তোমার জন্য এককাপ চা করে আনি। ঘরে খুঁজলে একটা দুটো মাথাব্যথার ট্যাবলেটও পাওয়া যেতে পারে। খুঁজে দেখি।

হাসান উঠে বাথরুমে যায়। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে আগুন ধরায়। শুয়ে পড়ে ধোঁয়া ছাড়ে। নঈমা ট্যাবলেট আর চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে আসে। সঙ্গে জোবেদা আসে জলের গ্লাস নিয়ে। নঈমা বকুনি দেয়, 'এই মাথা ব্যথায়ও সিগারেট টানছ? ওঠো, ওটা রাখো। ট্যাবলেট আর চা'টা খেয়ে নাও।'

জোবেদা জলের গ্লাস রেখে যায়। ট্যাবলেটটা খেয়ে হাসান চায়ের কাপে চুমুক দেয়। বলে, 'জানো, অভয়বাবু নাকি বাড়ি গিয়ে এ'সবের কিছু বলেন নি। উল্টে বলেছেন আমি নাকি তাঁকে খুব খাতির-যত্ন করেছি! মিথ্যে করে ও'সব বলার কি দরকার ছিল! একটা খারাপ লোককে ভালো বলার কি যুক্তি থাকতে পারে?

মৃদু তাড়া দিলে নঈমা—চা'টা খেয়ে নাও তো শিগ্‌গির। খেয়ে শুয়ে পড়ো।

বাধ্য ছেলের মত হাসান শুয়ে পড়ল। ওর লম্বা অবিন্যস্ত চুলে বিলি কেটে দিতে থাকে নঈমা। একসময় বলে, 'তুমি তো লিখো, কতো গল্প, কতো কাহিনী, জানো না মানুষ আসলে কখনো খারাপ না, সবাই ভালো। মানুষ খারাপ তখনই হয় যখন তার গভীর অসুখ করে।'

নঈমার হাতে হাত রাখে হাসান।

টের পায় আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যাবার মতো, তার মাথাব্যথাটাও কমে যাচ্ছে।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য

অজগরটি আসছে তেড়ে

এমন যেন ক্রুফোর 'ডে ফর নাইট' ছবির টুকরো দৃশ্যটি, বেশ ক'মিনিট সময় ধরে বিড়ালের ডাক অথচ পর্দায় দেখা যাচ্ছে না. কিছু সময় পর একটি বিড়াল দৃশ্যমান হল, আরও কিছু পর একে একে বেশ ক'টি বাচ্চা বিড়াল আর এখানে নগরীর উপকণ্ঠে এক বিশাল আবাসনের দোতলার গ্রীলঘেরা চিলতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গো-বাথানের পরিচিত দৃশ্য আর ওখানেই গোবর-চোনায় মাখামাখি থকথকে কাদার 'পর এক দলছুট সারসের সাবধানী পায়চারি, লম্বা গলা একবার টান আবার সংকুচিত করে তির্যক দৃষ্টিতে ইতি-উতি তাকিয়ে খাদ্য সন্ধান এবং এই দৃশ্যের পনেরো-বিশ মিনিট পর আবাল্য সহচর হিমাদ্রির পাঁচতলা আবাসনের গ্রীলঘেরা চিলতে বারান্দায় ... ...

—দ্যাখ্ দ্যাখ্, ওই গাছটায় কেমন বকফুল ফুটেছে।

হিমাদ্রির মস্করাপ্রিয় কণ্ঠ এবং সাথে সাথে ওদিকে তাকিয়ে বিস্ময়,—চারদিকের অবিরাম কংক্রীটের আকাশছোঁয়া জঙ্গলের মাঝখানে হঠাৎ অবকাশের মতো একটু ফাঁকা জায়গায় ডালপালা ছড়ানো একটি গাছে (কি গাছ দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না) বেশ ক'টি ধবধবে শাদা সারস ঝুম মেরে বসে,—হঠাৎ তাকালে প্রাণীগুলোকে ম্যাকসি সাইজের বকফুল বলেই মনে হবে।

চোখের পলক ফেলতে না-পারা বিনিদ্র দিবস-রজনী এই নগরী-মহানগরীর ঘিঞ্জি পথঘাট নোংরা আবর্জনাময় জলকাদায় থকথকে, উপচে পড়া ডাস্টবিনের পুঁতিতে দমবন্ধ বাতাস; গলি থেকে রাজপথ সন্ত্রাসীদের অস্ত্র পাচারের নির্বিঘ্ন অথচ পাজামা-কুর্তা শোভিত সহাস্য মন্ত্রীর বিজ্ঞাপিত ছবি দৈনিকের পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু উন্নয়ন আর সাফল্যের বিবৃতি, জয়গাথা,

আর ওই দৈনিকগুলো বিজ্ঞাপনের টাকার লোভে বিরুদ্ধতাহীন, শহর-নগর-বন্দরে মানুষিক অস্তিত্ব বিপন্ন মুরগিতে ঠাসা খাঁচা-সদৃশ গৃহস্থালিতে, বনজঙ্গল-টিলা-পাহাড়-কোদাল-শাবল বুলডোজারের সম্মিলিত শাণিত আক্রমণে বিধ্বস্ত পশুপাখি বন্যপ্রাণী ক্রমশ সম্পন্ন গৃহস্থের দেয়াল-শোভিত আর্টপ্লেট, রকমারি ক্যালেণ্ডার ও পিকচার কার্ডে মেটামরফিক ... ...।

এই মুহূর্তে খণ্ডদৃশ্যের মত ও সমস্ত ভাবনা আর ওই শাদা করুণশঙ্খের মত নিঝুম পাখিগুলো ভিতরে বড্ড উতলা করে তোলে অভীককে। 'খুব খারাপ, অসহায় লাগছে, জানিস।' কাতরকণ্ঠে প্রায় স্বগতোক্তি করে অভীক।

—নিজেকে না ওই পাখিদের?' হিমাদ্রি জানতে চায়।

—দু'তরফেই।

—বন্ধু, আজকের জীবনের মূল ট্র্যাজেডি এটাই।' হিমাদ্রির কণ্ঠ পলকে গম্ভীর। 'দ্যাখ, রামায়ণ ও মহাভারত, ও দুটো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু আমরা গ্রাহ্য করিনি।'

নিমেষে রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গ—ভিতরে একটু চমকায় অভীক। সকৌতুকে বন্ধুর দিকে গাঢ় দৃক্‌পাত করে। বালকবেলা থেকে ক্রমে প্রৌঢ়ত্ব, এই দীর্ঘ সময়ের সুতীব্র অভিঘাতও বদলাতে পারেনি হিমাদ্রিকে। সে একনিষ্ঠ, অবিচল তার পুরনো ধ্যানে, অতিকথাবাদে!

ওই যে রাম, রামচন্দ্র, লঙ্কা থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে অথৈ সাগরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিন রাত ধ্যান করেও সাগরদেবতার দেখা না পেয়ে প্রচণ্ড রেগে বাণ মেরে সাগর শুকাতে প্রস্তুত হলে করজোড়ে সাগর তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দেখুন, আমি অগাধ ও অতরণীয়। কামনা, লোভ, ভয় বা অনুরাগের বশে জলরাশি স্তম্ভিত করতে পারি না। এতে সৃষ্টি নষ্ট হবে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাম বাণ মেরে সাগর শুকাতে পারতেন কিন্তু সৃষ্টি যাতে নষ্ট না হয় সে চিন্তা করে তিনি সাগরের কথানুযায়ী লঙ্কা জয়ের আয়োজন করলেন। আর এখন দ্যাখ, দুনিয়ার যত হীন, কুমতলবী, শক্তিধরেরা সবকিছু একসাথে কেমন সাবাড় করে দিচ্ছে—জীবজগৎ কী ভয়ানক বিপন্ন...!

এ যেন আরেক সেতুবন্ধন। আধুনিক মনন মহাকাব্যের আলোয় বর্তমানকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করছে।

২.

খুব নিকট একদিন কয়টি ছোট রাজ্যের পশ্চাদভূমি নিজের ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ শহরে ফিরে যেতে যেতে হিমাদ্রির কথাগুলো নিভৃতে নাড়াচাড়া করে অভীক। এবং 'বিপন্ন জীবজগৎ' শব্দদুটি সমূহ অমোঘতা সহ তাকে আচ্ছন্ন করে, কেননা এটিই বর্তমানে সবচে' আলোচ্য বিশ্বের কোণে কোণে, নিত্য চর্চিত হচ্ছে খবরের কাগজে, ভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে, যেমন বাঘ

লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে, ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মারা যাচ্ছে, বানর আঁচড়ে দিচ্ছে মানুষকে, আকছার ওসব খবরে দৈনিকের পাতাগুলো ভরে উঠছে। বনের পশুরা খাবারের খোঁজে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে হানা দিচ্ছে লোকালয়ে, আক্রমণ করছে মানুষকে আবার আক্রান্তও হচ্ছে, কোথাও বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। বিগত দু'মাসে, ফেব্রুয়ারি আর মার্চ দু'হাজার আট-এ, কি স্থানীয় কি বাইরের কাগজে, চোখ-কান-খোলা পাঠকের নজরে এসেছে অন্যতম ওই খবরের শিরোনামগুলো :

১. পায়ে কামড়, আমাকে নিয়েই ঝাঁপে দিল পুকুরে।
   গ্রামে ঢুকে পড়ায় বেদম মার, ছেঁকা, বন্দি নিস্তেজ বাঘিনি।

প্রাণের ভয়ে নিয়ম ভেঙেই গাছে ওঠে বাংলার বাঘ।

২. জঙ্গলে ফিরিয়ে দেয়া হল কুলতলির গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘিনীকে। উলু-পুষ্প বৃষ্টির মধ্যেই লঞ্চবাহনে বনের রাণী বনে।

৩. বানরের উপদ্রবে জনজীবন দুর্বিষহ মনাছড়ায়।

৪. পাড়ায় ঢুকছে আমাজনের অ্যানাকোণ্ডা, আতঙ্কে ব্রাজিল।

৫. চিতাবাঘের মাংসে ভোজের আয়োজন আসামের গ্রামে।

ইত্যাদি।

ও'রকম আতঙ্কিত হবার মতো পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যারাতে তনুময় এলো অভীককে নিজের সুখবর জানাতে। সঙ্গে আরেকটি সুখবর এবং তারপরে একটি ভীতিপ্রদ। প্রথমে নিজের কথাই বলল সে। তার দীর্ঘদিনের শ্রম সফল হয়েছে। প্রাকৃতিক বাসস্থান হাবানো বন্যজন্তুই আগামী বিশ্বের সবচে' বড়ো সমস্যা—এই শিরোনামে গবেষণাপত্র নিয়ে একটি সেমিনারে যোগ দিতে আগামী মাসে সে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। পরের যে সুখবরটি ঝুলি থেকে বার করলো সে তা সত্যিই চমকপ্রদ ও অপ্রত্যাশিত। শেষ পর্যন্ত তরুণের একটি চাকরি হয়েছে। যদিও প্রতিষ্ঠানটি সরকারী না, আর সরকারী চাকরীর বয়স কবে পার করে বসে আছে তরুণ, ওটা কোনোদিন উঠবে না, বা দেউলেও হবে না। উচ্চশিক্ষিত, সুযোগ্য তরুণ বয়স খুইয়ে একটি ভাল চাকরি পেয়েছে তা বিশ্বাস করতে তার শুভানুধ্যায়ীরাও বিষম খেতে পারে। গুণের সঙ্গে তরুণ-চরিত্রে যথেষ্ট দোষও আছে। যেমন সে রগচটা, একগুঁয়ে। বড়ছোট ভেদাভেদহীন, একটু বেশি পরিমাণে স্বার্থপর এবং মুখের ওপর যা নয় তাই বলে দেয়া ইত্যাদি।

—ওর আগের চাকরি?

—ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য ওটা ছাড়া না-ছাড়া দুই-ই সমান।

—মানে?

—অনেকদিন হল ওখানে কোনো টাকাকড়ি পেত না।

—বলছ কী!

—ওদের প্রতিষ্ঠান এখন দেনার দায়ে হাঁসফাঁস করছে।

—তাই?

—তবে আর বলছি কি? ব্যাঙ্কলোনের একটাকাও শোধ করতে পারেনি ওরা।

যাক্ তরুণটাও বেঁচেছে। নাহলে বউছেলেমেয়ে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হত ওকে। আব তখন হয়ত ওর পুরনো মাথার অসুখ আবার চাগাড় দিয়ে উঠত।

ভীতিপ্রদ খবরটি শোনাল তনুময়।

—আজ দিনভর শহরে হুলুস্থুল, আপনি জানেন না?

—না। কী হয়েছে বলতো, উগ্রপন্থীর হামলা?

—না না। তরুণদের অফিসঘরে একটা অজগর ঢুকে বসেছিল। গা শিউরানোর বদলে আমার ভীষণ অবাক লাগছিল তখন। তরুণটার যেন রাহুগ্রস্ত জীবন, যেদিকে যাচ্ছে, যেখানে যাচ্ছে—'

—ওম্মা, বলছ কী। যেখানে তরুণ চাকরি পেয়েছে সেখানে?

—না-না। ওটাই তো রক্ষে। ওর পুরনো অফিসে, যেটা সে ছেড়ে এসেছে। তালাবন্ধ ছিল। কি একটা কাজে চৌকিদার দরজা খুলতেই—'

—কিন্তু শহরের মাঝখানে অজগর এলো কোত্থেকে?

— সেটাই তো প্রশ্ন অভীকদা।

—এ তো ভীষণ ভয়ের ব্যাপার! ধরা পড়েছে সাপটি?

—ফরেস্টের লোক এসেছে শুনেছি। ধরা পড়েছে কিনা বলতে পারব না।

—হুম। বিপদ তাহলে ধীরে ধীরে কাছে আসছে। ওই মুক্ত বিশ্ব, মুক্ত বাণিজ্যের মতো মুক্ত হয়ে যাচ্ছে বন্যপ্রাণী জগৎও। ওরা আর পাহাড়-বন-জঙ্গল-নদী-নালায় বদ্ধ থাকছে না!

৩.

তরুণ—

জীবনটা শুরু থেকে সংঘাতময়। বয়সে ক'বছরের বড় পাড়ার এক দিদির সঙ্গে প্রেম, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে এবং বিধবা মা ও বোনকে ফেলে সংসার ত্যাগ। ত্যাগও না ঠিক। ওই জীর্ণ সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। ওই বয়সের প্রেম পুরুষ-নারীকে বড় স্বার্থপর করে

তোলে। নিজেদের কথা ছাড়া অন্য কারোর কথা ভাবে না ওরা। তরুণও ব্যতিক্রম না। তরুণের সবচে' বড় গুণ সে অসম্ভব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, স্কেচ করতে পারে। ওটা তার জন্মগত এবং ওটাই তার অটুট প্রাণশক্তি। ছবি আঁকতে বা স্কেচ করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। যে মফস্বল শহরে তরুণ বউকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল সেখানে রুটিরুজির সন্ধানে সে প্রথমে বিপর্যস্ত হয়ে গেছিল। ছবি এঁকে তো আর দু'জনের পেট ভরানো সম্ভব না।

একটি দৈনিক সংবাদপত্রে সাংবাদিকের কাজ নিয়ে মাস শেষে ভাউচারের শাদা পৃষ্ঠায় সই করে পাঁচশো খানেক টাকাতে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টায় সে যখন দিশেহারা তখন সহসা পড়েছিল রাজনৈতিক দাদাদের নজরে। ওদের হয়ে রাতের অন্ধকারে শহরের দেয়ালে দেয়ালে রক্তের অক্ষরে এক অলীক স্বপ্নের ফুল ফোটাতে গিয়ে চাপা পড়ে যাচ্ছিল তার আসল প্রতিভা। যারা প্রায় শুরু থেকে তার তুলির গুণমুগ্ধ, ওরকম কিছু লোক সামলালো তাকে, রক্ষে করল অনিবার্য হারিয়ে যাওয়া থেকে।

—তরুণের পুরনো অফিসটার কি হাল এখন, এমনি পড়ে থাকবে?' কৌতূহলী অভীক জানতে চায়। উঁহু। ওটা এক রাজনৈতিক নেতা বেনামে কিনেছে শুনেছি।

—আরে ওটা তো অনেক টাকার সম্পত্তি, হার্ট অব দি টাউন, কি বলো?

—যে কিনেছে তার কি টাকার অভাব অভীকদা।' কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকল অভীক। তার দৃষ্টির সামনে সহসাই যেন রয়্যাল বেঙ্গলের মস্তবড় হাঁ দেখতে পেল সে। ক্ষুরধার হলদেটে দাঁত, লকলকে রক্তিম জিভ, কপিশ চোখের শরীর হিম করে দেয়া জ্বলন্ত দৃষ্টি—!

—শুধু কি ওটাই—'

—জানি জানি—।

তনুময়ের না-বলা কথার ইঙ্গিত সহজেই ধরতে পেরে মাথা দোলায় অভীক। এ'শহরের শরীরে অনেক আগেই তীক্ষ্ণ তীব্র কামড় বসিয়েছে ওই লোকটি। গলা, হাত-পা—যেন অজগরের মতো আস্তোটাই গিলে ফেলতে উদ্যত। অভীকের ঐতিহ্যশালী মামাবাড়ির অর্ধেক বেশ কিছুদিন আগে ওর খপ্পরে চলে গেছে। মামারা অর্থগৃধ্নু, ঐতিহ্য রক্ষায় নিতান্ত অনাগ্রহী। টাকার চিক্কণ শরীরের দ্যুতি ও গন্ধই ওদের আচ্ছন্ন করে দেয়, একসাথে লক্ষ লক্ষ টাকা, প্রায় অর্ধকোটি, পাগল নাহলে কেউ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! তিনপুরুষে তিল তিল করে গড়া সম্পত্তি, ভিতরবাড়িতে টলটলে জলের পুকুর, কলাবাগান, উঠোন—দক্ষিণের পুরো ভিটেটাই কিনে নিয়েছে ওই লোকটি। ছেলেবেলার কত স্মৃতি যে মামাবাড়ির আনাচ-কানাচে ছড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে বেড়াতে গেলে নাকে পুরনো স্মৃতির গন্ধ পেত সে। দুর্গাপূজা, বাসন্তীপূজা, দোল উৎসব, ঝুলনযাত্রা, কোনও বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার আঁধারে কালী, শিব বা অন্যকিছু সেজে বহুরূপীর রহস্যময় আনাগোনা উঠানে-বারান্দায়, গানের আসর-জলসা—বড্ড জমজমাট ছিল একসময়। সব লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ। এখন ওখানে শপিং মল-বিগবাজার বসবে হয়ত।

আপনি শহর বা শহরতলির যেদিকে তাকাবেন দেখবেন বেনামা সম্পত্তির রমরমা ব্যবসা—

—আচ্ছা, ওদের আলটিমেট গোল কি বলতে পারো?

—ওটা একটা নেশা। তীব্র আদিম নেশা। সবকিছু কুক্ষিগত করার, দখল করা, রাজ করার এক সর্বনাশা নেশা—।

—ওই লোকগুলো কি ধীরে ধীরে আমাদের শহরছাড়া করবে?

—না না অভীকদা।' হাসে তনুময়। 'অতো সোজা নাকি? আপনি যেভাবে বলছেন। আর ওরা সংখ্যায় অনেক কম।

—কম। বলছ কী তুমি? নিত্য ওদের সংখ্যা বাড়ছে। ধরা দিচ্ছে না। পর্দায় দৃশ্যমান হচ্ছে না।

কথাটা বলেই মনে হল অভীকের, আচ্ছা, ত্রুফো অনেক বছর পূর্বে যে দৃশ্যরচনা করেছিলেন, যা তার স্মৃতিতে হুবহু উজ্জ্বল হয়ে আছে, তা কি ওরকম কোনও অনিশ্চিত, ক্রূর সময়ের কথা কল্পনা করেই?

মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে অভীকের। 'জানো আজকাল না আমার খুব ভয় করে হে।'

—ভয় কিসের?

—চারদিকে যা সব ঘটছে। একেক্টা শহরকে যেভাবে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিচ্ছে ওরা—'।

—ওসবের আসল কারণ হচ্ছে মাসল্ পাওয়ার। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যাকে বলে। ধনজন-বিষয় সম্পত্তি হাতের মুঠোয় নিয়ে অন্যদের কোণঠাসা করে দেয়া—যেমন ইচ্ছে ওঠবোস করানো—পুতুল নাচানো—।'

—তাই তো বলছি ভয়ের কথা। আমরা ওদের হাতের পুতুল। আমাদের অবস্থা না বেলেম শহরের লোকেদের মতো হয়—'.

—বেলেম শহর। আপনি জানেন?' বিস্মিত প্রশ্ন তনুময়ের।

—জানি ভাই। ইস্ট আমাজন উপত্যকার সবচে' বড় শহর হচ্ছে বেলেম। অ্যানাকোণ্ডা ঢুকেছে ওই শহরের পাড়ায়—'।

—জানেন, ওগুলো কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। পেঁচিয়ে ধরে শিকারকে মারে। দমবন্ধ হয়ে মরে সবাই—।'

—অজগরও তো সেম প্রসেসে শিকার গেলে

—দুটো একই প্রজাতিরই কিনা।

—দ্যাখো, সাপের ভয়ে পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে লোক আর এখানে লোভী ক্ষমতাবানদের ভয়ে না শহর ছেড়ে পালাতে হয় আমাদের!

দু'জন একটু সময় চুপ করে থাকে। প্রথমদিকের হালকা হাসিখুশি পরিবেশটা কেমন

অবধারিত ভাবে ঘোলাটে আর গুরুভার হয়ে ওঠে ক্রমে। চারধার নিঝুম। যদিও বেশি রাত হয়নি। বাইরে ঝিঁঝিঁপোকার কলরব আর অন্ধকার শুধু।

—আমরা কি একটু বেশি ভাবছি অভীকদা?' নীরবতা ভেঙে শুধোয় তনুময়।

—কমবেশি বলতে পারি না ভাই। তবে ওই বিষয়গুলো আমাকে বড্ড ভাবাচ্ছে। চারদিকের উথালপাথালের মাঝখানে নিজেকে স্থির রাখতে পারি না।

তনুময় তাকায় অভীকের মুখের দিকে। এবং দেখে দূরমনস্ক অভীকের দৃষ্টি যেন অতীত সময়ের কোনো ধূসরতর পৃষ্ঠায় তন্ন তন্ন করে বর্তমানের চারপাশকে খুঁজে ফেরার চেষ্টায় পরিক্লান্ত ... ...।

ফ্রাঙ্কো ত্রুফো (Francois Truffaut)

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি চিত্র পরিচালক। ফরাসি চলচ্চিত্রে New Wave-এর জনক বলা হয় তাঁকে। ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ জীবন। সিনেমা হল, সিনেমা এবং নিরন্তর পড়াশোনার মধ্যেই জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির সন্ধান করতেন। ১৯৫৯ ইংরেজিতে কান ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য

১৫ অগস্ট

দুপুরবেলার ভাতঘুমের জন্য সবে প্রস্তুত হয়েছে সুবিনয়, এমন সময় কলিংবেল। মনে মনে খুব বিরক্ত হল সে। এত বেলাতে পিওন আসে না। অর্ডিনারি, স্পিডপোস্ট বা মানিঅর্ডার, যা হোক না কেন সব ডাক দুপুর ১টার ভিতর বিলি করে যায়। গ্যাস সিলিণ্ডার ডেলিভারি দেবার লোকও হবে না। দু'দিন আগে নতুন সিলিণ্ডার দিয়ে গেছে। এমনকি মাসে ২/১ বার বেশ বেলা করে ভিক্ষে করতে আসা মলিন চেহারার একহারা মাঝবয়েসি লোকটা, এক বা দু'টাকার কয়েন পেলেই যে খুশি, সেও কোনোদিন এত বেলাতে আসে না।

এক্ষুণি গিয়ে দরজা খুলবে কী খুলবে না এই দোলাচলে একটু থমকে যায় সুবিনয়। ওরকম ইতস্তত অবস্থায় অনেক সময় স্বাতী এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে আগন্তুকের ওজন বুঝে কাউকে বলে, উনি তো এইমাত্র শুয়েছেন, আবার কাউকে, একটু বসুন, ডেকে দিচ্ছি—।

তবে কলিংবেল বাজলে বা ল্যাণ্ডলাইনে ফোন এলে বেশিরভাগ সময় সুবিনয়কেই অ্যাটেণ্ড করতে হয়। এটার প্রধান কারণ মোবাইল, ল্যাণ্ডলাইন এবং কলিংবেলের শব্দ শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে সুবিনয়কেই চায়—।

ঘুমের আবেশে ঢুলু ঢুলু শরীর, তবু গিয়ে দরজা খুলে দেয় সুবিনয়।

প্রণয় মাস্টার।

এ সময়ে ওর উপস্থিতি এত অপ্রত্যাশিত যে ভিতরে চমক লাগে সুবিনয়ের। পরমুহূর্তে প্রথমেই যে কথাটি ভাবে সে বা ওকে দেখামাত্র যে ভাবনাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মনে উদয় হয় তা'হল নিশ্চয় ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে উকিল নোটিশ পেয়েছে বা ব্যাঙ্ক নিযুক্ত কোনো নাছোড় রিকভারি এজেন্ট হানা দিয়েছে ওর বাড়িতে।

সুবিনয়ের এই চকিত ভাবনা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক না। কারণ, ব্যাঙ্ক থেকে ব্যক্তিগত লোন নিয়ে প্রণয়মাস্টার অর্ধেক শোধ করে আর ওমুখো হয়নি এবং সুদসমেত বাকি টাকাটা এন.পি.এ অর্থাৎ নন পারফর্মিং অ্যাসেট হয়ে ব্যাঙ্কের খাতায় পড়ে। বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য সুবিনয়ের অনেকদিনের পরিচিত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তার সাহায্য চেয়েছিল। সে জানত প্রণয়মাস্টার সুবিনয়ের বিশেষ পরিচিত, সুবিনয়কে দাদা বলে ডাকে এবং দু'জন একই পাড়ার বাসিন্দা। সুবিনয়ের মধ্যস্থতায় প্রণয়মাস্টার লোন শোধ করতে শুরু করেছিল। গত পুজোর পর বাইরে বেড়াতে যাবার আগে প্রণয়মাস্টার সুবিনয়কে পুরো টাকা একসাথে দিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু শেষ অব্দি সুবিনয়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে অবশিষ্ট টাকা ফিরে এসে মিটিয়ে দেবে এমন কথা বলেছিল।

বেড়ানো থেকে ফিরে আসার পরও ওই টাকা নিয়ে কোনো কথা হয়নি দু'জনের মধ্যে, আর ওটি খরচ করে ফেলার দরুণ সুবিনয় প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত। তবু হঠাৎ করে প্রণয়মাস্টার টাকাটা ফেরৎ চাইতে পারে ভেবে বলে রেখেছিল পোস্টাল এজেন্ট বাণীকে। ওরই পীড়াপীড়িতে একটা আর.ডি করেছিল সুবিনয়। বাণী বলেছিল বিপদে পড়লে জমানো টাকা থেকে ৫০ ভাগ লোন নিতে পারবে।

সুবিনয়দা কী করছিলেন—উফ্, যা গরম—বলতে বলতে চিলতে উঠান থেকে বারান্দার ছায়ায় উঠে দাঁড়ায় প্রণয়মাস্টার।

—কী আর করব ভাই, বেকার মানুষ, একটু ঘুমোতে যাচ্ছিলাম—উঠানের আগুনে রোদের দিকে চোখ দুটি কুঁচকে তাকায় সুবিনয়। সূর্যে সুনামির কথাটা বোধহয় জানেনা মাস্টার, তাই দুপুরের রোদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে হাঁসফাঁস করছে।

—এসো, ঘরে এসো—পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে সুবিনয়।

—আপনি দুপুরবেলা ঘুমোন?

—খুব বেশি ঘুমোই না। এই ধরো বিশ মিনিট, খুব বেশি হলে আধঘন্টা—'

—পাখাটা চালু করুন দাদা—' ক্লান্ত সুরে বলে প্রণয়মাস্টার।

ফ্যানের সুইচ অন করার মুহূর্তে সুবিনয় আড়চোখে ইনভার্টারের দিকে তাকায়। লাল আলো কোথায় জ্বলছে, ইউ.পি না মেইনে, দেখে নেয়।

আপনার কাছে একটা দরকারে এলাম—।' ঘামে ভেজা শরীর সোফায় এলিয়ে দিয়ে বলে প্রণয়মাস্টার।

বুকটা ঈষৎ ধ্বক্ করে ওঠে সুবিনয়ের। এবার বোধহয় গচ্ছিত টাকার কথা পাড়বে। নাহলে এমন অসময়ে বাড়ি বয়ে আসে! ঘুমের চটকা উবে যায় চোখ থেকে, শরীর থেকে। সোজা তাকায় সে প্রণয়মাস্টারের মুখের দিকে। লম্বাটে শুকনো মুখ। ভাঙা গালে আকামানো খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি। কোটরে পোরা চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বলিরেখা আঁকা কপালের

কোঁচকানো চামড়ায় বিনবিনে ঘামবিন্দু।

—এবার পাড়ার কমিটি আমাকে পনেরোই আগস্ট উদ্‌যাপন করার দায়িত্ব দিয়েছে— !'

বুকের ভিতর একদলা আটকে থাকা বাতাস নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। কী যে গভীর স্বস্তি অনুভব করে সুবিনয়।

—দেখুন তো কী ঝামেলা— !' খুশি খুশি সুরে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রণয়মাস্টার।

—ঝামেলা কীসের, তুমি তো সুন্দর ম্যানেজ কর পাড়ার ফাংশন—'

সুবিনয় ফুরফুরে মেজাজে ওকে তারিফ করে। যদিও পাড়ার বেশিরভাগ ফাংশনে সে অনুপস্থিত থাকে। কমিটির ইচ্ছে হল পাড়ার অভিজ্ঞ কেউ একজন স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে বলুক।

—বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে এলে হয় না?

—না না! বাইরের কেউ না। পাড়ার প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি কেউ। আমি আপনার কথা ভেবেছি।

—আমি ... ...!'

—হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন তাহলে খুব ভাল হয়।

—না না। আমি কেন? আমার থেকে অনেক সিনিয়র আছেন পাড়ায়। ওদের কাউকে বল। তুমি এক কাজ কর মাস্টার, নীতিশ দত্তের কাছে যাও। উনি আমার থেকে অনেক বড়, স্বাধীনতা সম্পর্কে বলবেনও খুব ভাল—'

—নীতিশ দত্ত—বলছেন?' একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বলে প্রণয়মাস্টার।

—হ্যাঁ। কেন, আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি নেই। তবে আমাদের ফার্স্ট চয়েজ ছিলেন আপনি।

—বুঝলাম। কিন্তু আমাকে বাদ দাও ভাই। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার অস্বস্তি হয়।' অকপট স্বীকারোক্তি সুবিনয়ের।

—ঠিক আছে দাদা, তাহলে নীতিশ দত্তকেই বলব।' একটু মিয়োনো সুরে বলে প্রণয়মাস্টার।

নীতিশ দত্ত যে ওর ঠিক পছন্দের লোক না তা বেশ বুঝতে পারে সুবিনয়। পাড়াতে সকলের মাঝে থেকেও উনি চোখে পড়ার মত আলাদা হয়ে থাকেন। হয়ত বয়সের ভারের জন্যই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলাফেরা করেন। ওর উগ্র রাজনৈতিক আদর্শও সকলের পছন্দ নয়। তা যাক্‌গে। দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে যায় সুবিনয়।

—আর কী কী প্রোগ্রাম তোমাদের?

—এই যেমন ধরুন বাচ্চাদের দৌড়, সাইকেল রেস, মেয়েদের মিউজিক্যাল চেয়ার আর সন্ধ্যাবেলা ছোট্ট একটা ফাংশন—'

—বাহ্, সুন্দর প্রোগ্রাম তো!

—ফান্ড লিমিটেড, নাহলে আরো কিছু করার ইচ্ছা ছিল।

—ওগুলোই বা কম কীসে।

—তাহলে এখন উঠছি সুবিনয়দা—'

—হ্যাঁ, এসো।' প্রণয়মাস্টার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই সুবিনয় উঠে দাঁড়ায়।

২.

ঘুমের আবেশ পুরোমাত্রায় কেটে গেছে সুবিনয়ের। তবুও অভ্যাসবশে বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শু'ল সে। ভিতরের অস্বস্তি সাময়িক থিতু হলেও ব্যাপারটি আর দীর্ঘায়িত করা কোনোভাবে ঠিক হবে না। বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসার পর যখনই মাস্টার তার সামনে এসেছে বা দূর থেকে ওকে দেখেছে সুবিনয় তখনই অপরাধবোধের মত এক অপ্রস্তুত ভাব তাকে আঁকড়ে ধরেছে। যত শিগ্‌গির সম্ভব ওর হাতে টাকাটা ফেরৎ দিতে পারলেই রক্ষে। সে স্থির করে আজই তার পোস্টাল এজেন্ট বাণীর সঙ্গে দেখা করবে। এতক্ষণে মন যেন একটু শান্ত হল তার। এবার আগের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে শুরু করে সে। স্বাধীনতার বয়স যেন কত হল? দু'হাজার দশ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ মনে মনে বিয়োগ করে। তেষট্টি পূর্ণ করে চৌষট্টিতে পা দিয়েছে স্বাধীনতা। দু'জনের বয়স প্রায় সমান। বাষট্টি পূর্ণ করে তেষট্টিতে পা রেখেছে সুবিনয়।

কত কত সভা-সমিতির আমন্ত্রণ সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছে সে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে কেমন এক আড়ষ্টতা বোধ পেয়ে বসে তাকে। তাই সহজে ও'পথ মাড়ায় না সুবিনয়। যদিও প্রায়শই আয়োজিত সভার উদ্দেশ্য জেনে মনের ভিতরে কথার হাট বসে তার। এই যেমন এখন। ১৫ অগস্ট শব্দ দু'টি তাকে যারপরনাই উস্‌কে দিয়েছে। কত কথা যে বলার আছে, কত কথা যে মুহূর্তে ভিড় করে আসে মনে। কত বঞ্চনা, কত লাঞ্ছনা আর না-পাওয়ার ইতিবৃত্ত যে ওই সুপক্ক দিনটির পরতে পরতে জমে আছে!

পাড়ার কমিটি আর প্রণয়মাস্টারের নাছোড় অনুরোধে যদি স্বাধীনতার পতাকাতলে দাঁড়িয়ে সত্যিই কিছু বলতে হত তাহলে কী বলত? সাথে সাথে তার উস্‌কে ওঠা মন, অনুভব তাকে বিষয় বলে দেয়। ১৫ অগস্ট, পরিপ্রেক্ষিত বরাক উপত্যকা।

১৯৫০-এর বাস্তুহারা সুবিনয় বাবা-মা, ভাইবোন ও আত্মীয়-পরিজন ও নিকট প্রতিবেশীর সঙ্গে একদা এই ভূখণ্ডেই আশ্রয় নিয়েছিল। এখানেই সে ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়ে আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষপর্বে পৌঁছেছে।

সিলিং ফ্যানের দিকে চোখ যায় তার। দু'দণ্ড স্থির চোখে ওদিকে তাকায় সে। বন্ বন্ করে ঘুরছে কারেন্টবিহীন ইনভার্টার নির্ভর ফ্যান।

এভাবেই তার কথা শুরু করত সে—

সাতবোন চম্পা উত্তর-পূর্বের অনেক জায়গাতেই ১৫ অগস্ট ও ২৬ জানুয়ারি ভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর বন্‌ধ পালন একটি বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বন্‌ধের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব এ'উপত্যকায় কখনো পড়েনি। যদিও পরোক্ষ প্রভাব মারাত্মক। এই তো আগামীকাল থেকে তিনদিন রাতের বেলা মেঘালয়ের ভিতর জাতীয় সড়কে কোনো গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না। এর ফলে সড়কপথে আমাদের উপত্যকা, ত্রিপুরা ও মিজোরাম তিনদিন তিনরাতের জন্য গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। মানুষ ও প্রয়োজনীয় পণ্যের চলাচল ঘন ঘন রুদ্ধ করে দেবার সস্তা রাজনীতি এক শ্রেণীর ছাত্রসংগঠন ও জঙ্গি গোষ্ঠীর এক অতি নিষ্ঠুর কৌশলে পরিণত হয়েছে। এদিকে মান্ধাতা আমলের মিটারগেজ রেলের পরিষেবা খুবই অনিশ্চিত ও নিম্নমানের এবং জঙ্গি নাশকতার ভয়ে রাতের বেলা পাহাড় লাইন বন্ধ থাকার ফলে এ অঞ্চলের জনগণ দীর্ঘ তিনটি দিন অন্ধকারেই পড়ে রইবে।

স্থানীয় খবরের কাগজ জানিয়েছে উত্তর-পূর্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গিগোষ্ঠী আলফা এবার ২৪ ঘন্টার পরিবর্তে ১৭ ঘন্টার বন্‌ধ ঘোষণা করেছে। বরাক উপত্যকা প্রতিবছরই ওদের বন্‌ধের আওতার বাইরে থাকে। কেননা বঙ্গভাষী অঞ্চল এ'উপত্যকাকে আলফা আসামের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করে না! . . ...

বহুদিন হ'ল ১৫ অগস্টের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার তাগিদ আমি অন্তরে অনুভব করি না। যতদিন যাচ্ছে, বয়স বাড়ছে, স্বাধীনতা দিবস পালনের আগ্রহ যেন আমার ভিতর থেকে কমে যাচ্ছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেশবাসীর কাম্য ছিল তা অধরা থেকে গেছে। দেশের একাংশ জনগণের মধ্যে সবকিছু লুটেপুটে খাবার এক সর্বগ্রাসী মানসিকতা দিন দিন এত উৎকট আকার ধরছে যা ১৫ অগস্ট দিবসের সুমহান অর্থময়তা নিরন্তর কলুষিত করে চলেছে। ... ...

আপনারা সকলেই জানেন, আজকের এই স্বাধীনতা পাবার জন্য একদিন দেশভাগের মত গভীর দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। আমরা যারা বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে এই খণ্ডিত ভূখণ্ডের চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছি তাদের বেশিরভাগের লাঞ্ছনা ভোগ এখনও কমেনি। কোথাও কোথাও এই মাত্রা আরো বেড়েছে। পূর্ববাংলার বাস্তুত্যাগীরা আন্দামান, দন্ডকারণ্য বা দেশের অন্যত্র কেমন আছে সঠিক জানি না। ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে ফেলা, ডি. ভোটার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবার চক্রান্ত এবং ১৯৫১ বা ১৯৭১ কোন সাল হবে বহিরাগত নির্ণয়ের ভিত্তিবর্ষ, ওসব কূটপ্রশ্নে এখানকার মানুষ বাস্তবিকই দিশেহারা, বিপন্ন ... ...।

৩.

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ সুবিনয়ের মোবাইল বেজে উঠল। শো কেসের ওপর থেকে ওটা

হাতে তুলে নিয়ে দেখল স্ক্রীনে নামহীন নম্বর ফুটে আছে। একটু সতর্ক হল সে। হাই ফ্রিকোয়েন্সির জন্য পাঁচটি মোবাইল নম্বরকে বহুদিন পূর্বেই রেড কালার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওগুলোর মধ্যে কোন একটি নম্বর নয়তো! গত দু'দিন আগে সুবিনয়ের এক আত্মীয় ওই মেসেজটি ফরোয়ার্ড করেছিল তার মোবাইলে। সেও সাথে সাথে ঘনিষ্ঠ ক'জনকে জানিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন তো, নাশকতার জন্য জঙ্গিবাহিনী হয়ত মুখিয়ে আছে। কোনদিক দিকে বিপদ আসবে কে বলতে পারে!

মোবাইল বেজেই চলেছে।

ওই নির্দিষ্ট নম্বরগুলো টুকে কাগজের টুকরোটা যে কোথায় রেখেছে সুবিনয়। এখন মনে করতে পারছে না। ধেৎতেরিকা। এদিকে আবার লোডশেডিং চলছে। এখন সুইচবোর্ড হাতড়ে আলো জ্বালতে সময় লাগবে। রান্নাঘরে শুধু একটা বাতি জ্বলছে। ওখান থেকে স্বাতী চেঁচিয়ে সাবধান করল তাকে।

—নম্বরগুলো মিলিয়ে দেখে ফোন ধরো।

অন্ধকার ঘরে ক'পা হেঁটে দেয়ালের কাছে গিয়ে সুইচবোর্ড হাতড়ে তবে সুইচ অন করে সুবিনয়। কাগজটা খুঁজতে শোকেসের সামনে গিয়ে দেখে ওটি জোয়ানের ডিবে দিয়ে চাপা দেয়া। হাতের মোবাইল কাগজের পাশে রেখে দৃষ্টি এদিক-ওদিক করে দ্রুত নম্বরগুলো পরখ করে সবুজ বোতাম টেপে সে।

—হ্যালো, কে বলছেন?

—আপনি কি সুবিনয়দা?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমি সরোজিনী গ্রন্থালয় থেকে বলছি, কৌশিক।

—ও কোশিক, কী ব্যাপার বলো তো—'

—আগামীকাল বিকাল পাঁচটায় আমার দোকানে বছরভর বইমেলার উদ্বোধন। আপনাকে আসতে অনুরোধ করছি।

—বাহ্, খুব ভাল খবর তো!

—কলকাতা থেকে একজন লেখক এসে উদ্বোধন করবেন।

—তাই নাকি, ঠিক আছে, যাবো।

—ধন্যবাদ দাদা, আসবেন অবশ্যই।

সত্যিই শহরটা বড় হয়ে গেছে। হাতের মুঠোয় আর ধরা যাচ্ছে না ছোটবেলার একরত্তি শহরকে। ভাবে সুবিনয়। এখন রোজই চারদিকে কত অনুষ্ঠান লেগে থাকে। সঙ্গীত-নৃত্য-শিল্প কলা-সাহিত্য-খেলাধূলা-রূপচর্চা এবং আরো কত কিছুর জন্য কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই থেকে সেলিব্রেটিরা এসে ভিড় জমায় এখানে। সবচেয়ে বেশি লোক আসে কলকাতা থেকে। কলকাতার

ছাতা মাথার ওপর থেকে একচুলও সরেনি। তুমি যতই উত্তর-পূর্বের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বল না কেন, কখনও কলকাতাকে টেক্কা দিতে পারবে না, ও নামে যাদু আছে।

৪.

বছরভর বইমেলার উদ্বোধক শুরুতেই শহরের ভাঙাচোরা বেহাল পথঘাট নিয়ে নিজের তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন। তারপর একটু থেমে সামনের টেবিল থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল হাতে নিলেন। এখন উনি জল খাবেন। অনেকদূর পথ পাড়ি দিয়ে নিশ্চয় উনি ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত।

জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে লেখক বলতে শুরু করলেন ... ...

দেখুন আমি কলকাতা থেকে প্লেনে সোজা কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্টে এসে নেমেছি। ওখান থেকে এই সভার উদ্যোক্তাদের গাড়ি করে আপনাদের শহরে আসতে গিয়ে রাস্তার ঝাঁকুনিতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে। সভা শেষ করে আবার হোটেলে ফিরতে ভয় করছে। রাস্তায় যা বড় বড় গর্ত! আপনারা কেমন করে দিনের পর দিন ওরকম গর্তভরা রাস্তার ঝাঁকুনি সহ্য করে চলাফেরা করেন? কেন এই শহরের পথঘাট ঠিক হয় না, কেন শহরকে সুন্দর করে রাখতে আপনারা সচেষ্ট হন না? স্বাধীনতার বয়স আজ চৌষট্টি হয়ে গেল, তবু কেন মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে আপনাদের ভয়, আপনারা কী পরাধীন দেশের নাগরিক!

সাধু! সাধু!!

ওসব বলেই কিন্তু লেখক ক্ষান্ত হলেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে এই অপার দুরবস্থার তদন্ত দাবী করলেন।

কিন্তু কে করবে তদন্ত? জনতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

—আমি আমার সৃষ্ট গোয়েন্দাকে কাজে লাগাব!' লেখক সদর্পে, সদর্ভে ঘোষণা করলেন।

—পারবে আপনার তরুণ গোয়েন্দা এখানকার জটিল চেইন সিস্টেমের রহস্যভেদ করতে?

—কেন পারবে না, ওইটুকু বয়সে কত বড় বড় রহস্যভেদ করেছে সে, জানেন তো!

—জানি। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি।

—হ্যাঁ বলুন?

—আচ্ছা, এজন্য তো আমরা ফেলুদা, ব্যোমকেশ বক্সী, কিরীটি রায় বা হুকাকাশি ওরকম কোনো দিক্‌পাল গোয়েন্দার সাহায্য নিতে পারি!

এই কথা শুনে লেখক দু'মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন ... ..

—দেখুন, আপনাদের এই বছরভর লাঞ্ছনার ওপর আমি একটি উপন্যাস লিখতে চাই। তাই আমার সৃষ্ট গোয়েন্দা ... ...।

হা ঈশ্বর, এই ছিল তোমার মনে!

হতচকিত সুবিনয় ভাবে প্রতিষ্ঠানের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা লেখক কিনা এসেছে অন্যের বাঁধন খুলতে, ঝুলিয়ে যার উদ্ভট, অবাস্তব সব কল্পনা ... ...।

৫.

ওসব কথা ভাবতে ভাবতে ভাঙাচোরা, জলকাদা আচ্ছন্ন সংকীর্ণ গলিপথের আলো-আঁধারে সতর্ক পা ফেলে ঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটছিল সুবিনয়। মাঝপথে কান্তর দোকানের পাশের খোলা জায়গায়, যেখানে বুড়ো আমগাছটি পাশের মান্দার গাছের গায়ে বিশ্রামের ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিয়েছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল প্রণয়মাস্টারের সঙ্গে। সে হাতে টর্চ জ্বালিয়ে হাঁটছিল।

—আরে সুবিনয়দা—'

—হ্যাঁ।

—সবাইকে দেখলাম, শুধু আপনাকেই দেখিনি।' সামান্য অভিযোগের সুরে বলল প্রণয়।

—কোথায়?

—পার্কের মাঠে।

—ওহ্ হো, আমি তো সারাদিন এনগেজড ছিলাম—এই তো ফিরছি বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে।

—আপনাকে দেখব খুব আশা করেছিলাম।

—যেতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু কখন কী প্রোগ্রাম তোমাদের তা তো জানতাম না।

—কেউ বলেনি আপনাকে?

—না তো। প্রত্যেক বছরই তো বাড়িতে নোটিশ আসে, এবার কিন্তু পাইনি।

—ঠিক বলতে পারব না সুবিনয়দা। আমার তো গতকাল থেকে শ্বাস ফেলার সময় নেই। এই তো এখন যাচ্ছি আর্টিস্টদের জন্য মিষ্টি আনতে।

—যাক্, সব ভালভাবে হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, তা হয়েছে।

এখন তো ও ইচ্ছে করলে টাকাটার কথা বলতে পারে। হঠাৎ করে ভাবল সুবিনয়। বলছে না কেন? লজ্জা করে বলছে না বুঝি। লজ্জা পাবে কেন, টাকাটা তো ওরই। ভুলে যায়নি নিশ্চয়। অতগুলো টাকার কথা ভুলে যাবেই বা কেমন করে। যে ক'বার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে একবারও কিন্তু টাকার কথা বলেনি প্রণয়মাস্টার। আর ও বলবে ভেবে সুবিনয় ওর

সামনে কেমন আড়ষ্ট থেকেছে, সহজ হতে পারে নি। তবে কী ওর মনে কোনো অন্য মতলব আছে? একটু শঙ্কিত মনে আড়চোখে তাকায় ওর মুখের দিকে। লোনের বকেয়া টাকা সব সুবিনয়ের হাতে তুলে দিয়েছে—ওরকম বলে যদি নালিশ জানায়! তাহলে তো লজ্জার একশেষ হবে। ভিতরে শিউরে ওঠে সুবিনয়। নাহ্ এখন কাউকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। উপলব্ধিটা বড্ড বেদনাদায়ক, তবে সময়টাই যে এমন!

—একটা কথা মাস্টার, তোমার টাকাটা—' উপযাচক হয়ে বলে সুবিনয়।

—কোন্ টাকা দাদা—' হঠাৎ করে যেন একটু অবাকই হয় প্রণয়মাস্টার।

— ওই যে বাইরে বেড়াতে যাবার আগে আমার কাছে রেখে গেছিলে।

—ও হ্যাঁ। মনে আছে সুবিনয়দা।

—নিয়ে যেও টাকাটা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। অবশ্যই নেব। এরই মধ্যে আসব আপনার ঘরে। মুহূর্তে বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল সুবিনয়ের। নিজেকে বড্ড নির্ভার আর হালকা বোধ হল। এতটাই হালকা, যেন হাত দুটি দু'দিকে ডানার মতো মেলে হাওয়ায় ভাসতে পারে সে।

স্বাধীনতার ওরকম স্বাদই তো কাঙ্ক্ষিত তার!

অরিজিৎ চৌধুরী

সামসুলের সীমানা

সামসুল হাতে দা নিয়ে বেড়া বানানোর জন্য বাঁশ কাটছিল। সাতপুরুষের ভিটেটা যখন তখন ধ্বসে যেতে পারে। আজ এদিকের ছাদ ফুটো হচ্ছে তো কাল ওদিকের বেড়া। বর্ষার দিন। প্রায় কোনোদিনই রাত্রে ঘুম হয় না। কখনো বিছানায় বৃষ্টি পড়ে, কখনো বা ঘরের বেড়া ভেঙে কুকুর ঢোকে ঘরে। চোর অবশ্য ঢোকে না। কারণ এই অঞ্চলের সব চোরকেই চেনে সামসুল। তাছাড়া তার মত গরীবের ঘরে ঢুকে সময় নষ্ট করবে এমন বেকুব চোর এ তল্লাটে জন্মায় নি। সকালবেলা খুব বৃষ্টি হয়েছে। এখন ধরেছে। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য কখনো কখনো উঁকি মারছে। এমন সময় কয়েকটা গাড়ির শব্দ হল। প্রথমে সামসুল গা করেনি। বি.এস.এফ বা বর্ডার রোডসের লোকেরা কখনো কখনো দু-তিনটে গাড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে গাড়ির সংখ্যাটা একটু বেশি। সামসুলদের গ্রামটা পড়েছে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে। অর্থাৎ গ্রামটা ভারতের হলেও সামসুলরা হয়ে গেছে না ঘরকা না ঘাটকা। কয়েক বছর আগে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। নিয়ম নাকি হয়েছে যেখানে বর্ডার রয়েছে তার ঠিক দেড়শ গজ দূরে বেড়া দেওয়া যেতে পারে। সামসুলদের গ্রামটা একেবারে বাংলাদেশ সীমান্তের গায়ে লাগানো। ফলে দেড়শ গজ দূরত্ব রাখতে গিয়ে সেটা পড়ে গেছে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে। কাঁটাতারের বেড়ায় একটা মস্ত লোহার গেট রয়েছে। বি.এস.এফ সেটা সকাল ছ'টায় খুলে দেয়, আর সন্ধে ছ'টায় বন্ধ করে। সন্ধে ছ'টার আগে কাজকর্ম সেরে না ফিরতে পারলে থাকো গ্রামের বাইরে। রাতবিরেতে অসুখ হলে, কেউ মরলে, আগুন লাগলে বা বিয়েসাদির সময় চরম দুর্ভোগ। বেড়া যখন দেওয়া হয় তখন গ্রামের মুরুব্বিরা বিস্তর হাঁটাহাঁটি করেছেন, শহরে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অফিসারদের কাছে মেমোরান্ডাম দেবার সময় সামসুলদের মতো খেটেখাওয়া লোকগুলোও শহরে গিয়ে ধর্ণা

দিয়েছে। কিন্তু কাজ বিশেষ কিছু হয়নি। এ নিয়ম নাকি একেবারে আন্তর্জাতিক নিয়ম। কিছুতেই ঢিলে হবার নয়। গ্রামের কুদ্দুস মাস্টারের বাড়িতে একদিন বেগুন বিক্রি করতে গিয়েছিল সামসুল। তখন কুদ্দুস সাহেব 'আন্তর্জাতিক' শব্দটা খুব করে বুঝিয়েছিলেন। নিরক্ষর সামসুলদের মাথায় অতোসব ঢোকে নি। তবে সে এটা বুঝেছিল যে এ নিয়ম শিথিল হবার নয়। বাংলাদেশ থেকে নাকি কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে ইণ্ডিয়ায়, সেজন্যে গৌহাটিতে বিরাট আন্দোলন হয়েছে। সরকার এই 'অনুপ্রবেশ' রুখতেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। 'অনুপ্রবেশ' শব্দটাও কুদ্দুস মাস্টারের মুখেই শোনা। হান্নান মিঞার বাড়িতে একটা রেডিও আছে, টেনজিসটার না কি বলে ওটাকে। সেই রেডিওয় সকাল সন্ধে যে খবর হয় সেই খবরেও শব্দটা শুনেছে সামসুল। তবে কাতারে কাতারে লোক ঢোকার ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। দু-কুড়ি দশ বছর বয়স হল তার। এর মধ্যে একদিনও সে কিন্তু কাউকে এভাবে ঢুকতে দেখে নি। অবশ্য বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় সে ছিল আলাদা ব্যাপার। তা তখন তো গরমেন্ট বর্ডার কিছুদিনের জন্য খুলেই দিয়েছিল।

মকলিসের পেয়ারা গাছের নীচ থেকে একটা কাদামাখা পেয়ারা কুড়িয়ে নোংরা লুঙিতে মুছে এক কামড় দিয়েছে সামসুলেরই পাশের বাড়ির জলিল, দেখা গেল কায়ুম ঝড়ের গতিতে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জলিলকে দেখেই কায়ুম উত্তেজিত ভাবে বলল, 'হালার ঘরর হালা, অখন শফ্রি খাইত্রে নি বেটা? অখন শফ্রি খাওয়ার সময় নি? গাড়ির সাউণ্ড হুইনছত্ নানি?'

সামসুল দা'টা আযেযাবিবিকে সমঝে দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনার বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিতা অইছে বা কায়ুমভাই?' কায়ুম ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, 'ধুর বেটাইন, আউয়া নি তুমরা? দিল্লীত্ তনে গৌহাটিত্ তনে বড় অফিসার আইছইন্, গৌহাটিত তনে বড় বড় অসমীয়া ছাত্রনেতা অকল আইছইন, করিমগঞ্জ তনে ডিসি এসপি আইছইন, আর তুমিতাইন বওয়াত নি অখনও?' সামসুল ব্যাপারটা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কেনে আইছইন্ তে? হেঁ—'। কায়ুম ধমক দেয়, 'আর হেক্কুত্ মারাইও না বে। জলদি আও, জলদি আইলে দিল্লীকা লাড্ডু পাইলে পাইতায়, নায় না।'

কায়ুম এপার-ওপার ব্যবসা করে ইদানিং কিছু পয়সা করেছে। গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি রয়েছে এবং সে শহরে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে। সুতরাং তার কথার একটা ওজন রয়েছে। সামসুল আর জলিল তাই কালবিলম্ব না করে গেটের দিকে ছুটে যায়। বেশি দূর যেতে হল না, একটুখানি এগোতেই দেখা গেল সাহেবসুবোরা সবাই গেট পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছেন। গ্রামে একটা বাড়ি আছে যার অর্ধেকটা বাংলাদেশে, অর্ধেকটা ভারতে। গৌহাটি থেকে কিছু কমবয়সী সাংবাদিক এসেছে তারা ফটো তোলার জন্য কাদা মাড়িয়ে ঐ বাড়ির দিকে ছুটছে। বাড়ির উঠোনে পৌঁছে ওরা ছবি নিল। তারপর বাড়ির লোকের সঙ্গে

কথা বলার জন্য আরো ভেতরে যেতে চাইলে দূর থেকে একজন অসমীয়া ভাষায় মানা করল, 'এই বাংলাদেশের ভিতরত নাযাব।' গৌহাটি থেকে হোম ডিপার্টমেন্টের যিনি সবচেয়ে বড় অফিসার এসেছেন তিনি স্বগতোক্তি করলেন, 'ওভার এনথুজিয়াস্টিক'। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অফিসার, ছাত্রনেতা আর সাংবাদিকরা মিলে অসমীয়া ও ইংরেজিতে কিসব কথাবার্তা বলছেন সামসুলরা সে'সব বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না। সামসুলের মতো হাভাতে আরো অনেকেই জড়ো হয়েছে। আশা, যদি কিছু পাওয়া যায়। যদি তাদের সমস্যার কিছু সুরাহা হয়। যদি খাঁচায় মুর্গির মতো তাদের যে বন্দিদশা তার অবসান হয়।

একই বাড়ির এক অংশ ভারতে অন্য অংশ বাংলাদেশে—এটা দেখে গৌহাটির ছাত্রনেতা ও সাংবাদিকরা ভীষণ উত্তেজিত। নানা মন্তব্য শোনা যাচ্ছে—'এ নেকুয়া অবস্থা চলি থাকিলে ইন্‌ফিলট্রেশন চেক্ হব কেনেকৈ?' 'এনেকুয়া বেড়া দিয়ার কী অর্থ?', 'বাংলাদেশীর কারণে এই ব্যবস্থা হইছে' ইত্যাদি। একজন অফিসার বোঝাচ্ছেন, 'ফর্টি সেভেনত পার্টিশন যেতিয়া হৈছিল তেতিয়ার পরা বস্তুটো এ নেকুয়াই আছে। ঘরটোও বহুত পুরনা, দেখিছে নে নাই? ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারর বাউণ্ডারি তো আপুনি চেঞ্জ করিব নোয়ারে।' একজন দাড়িওলা লম্বা চশমা পরা ভদ্রলোক রয়েছেন, উনি নাকি ছাত্রনেতাদের উপদেষ্টা হিসাবে এসেছেন। উনি বললেন, 'কিন্তু স্যার, এইটো তো বর রিস্‌কি। বাংলাদেশি ইয়াতে আহি রাতি শেল্টা লক, পিচদিনা গেট খুলি দিবার পিচত ইণ্ডিয়াত হোমাব—'। আরেকজন অফিসার বললেন, 'ইমান ইজি নহয়। বি.এস.এফ ইণ্ডিয়ান ভিলেজার বিলাকর রেকর্ড রাখে নহয়।'

কানাঘুষায় সামসুল বুঝতে পেরেছে দিল্লী থেকে হোম ডিপার্টমেন্টের যে অফিসার এসেছেন তিনিই হচ্ছেন এই দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় অফিসার। এই সাহেবকে দেখলেই বোঝা যায় উনি একটা বড় চাকরি করেন। লম্বা. ফর্সা, কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল, পুরু ফ্রেমের চশমা, ধারালো নাকমুখ। বি.এস.এফ, পুলিশ ও অন্য অফিসার এবং ছাত্রনেতা ও সাংবাদিকদের বেশি ভিড় এঁকে ঘিরেই। কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছে নীচু স্বরে এবং হিন্দী ও ইংরেজিতে। ফলে সামসুলরা কিছুই বুঝতে পারছে না। বেশি কাছ ঘেঁষাও যায়না, পাহারাদার পুলিশরা ছোট ছোট বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে।

পুরো দলটা আস্তে আস্তে খুব সাবধানে কাদামাখা রাস্তা পেরিয়ে গেটের সামনে উঁচু রাস্তায় উঠে এল। সেখানে আরেকদফা জমায়েত। কথাবার্তায় সামসুল বুঝতে পারল এদের সঙ্গে এসেছেন আরো অনেকে। কিন্তু সব গাড়ি এখানে আসতে পারেনি রাস্তা খারাপ থাকায়। শুধু মারুতি জিপসি গাড়িগুলো এসেছে। সব মিলিয়ে গোটা আষ্টেক, অন্য গাড়িগুলো সুতারকান্দি বর্ডারে রয়ে গেছে।

দিল্লীর সাহেব এখানে গ্রামের মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন। কিন্তু ভাষা একটা অন্তরায়। সব কথা বোঝানো যাচ্ছে না। সাহেব সামসুলদের গ্রামের একটা রেশনকার্ড দেখতে চাইলেন। কার্ডে পরিবারের সবার নাম নেই, শুধু পরিবারের

প্রধানের নাম আছে আর পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত সেটা লেখা রয়েছে। দিল্লীর সাহেব বললেন, 'স্টেঞ্জ! ইন্ অল আদার স্টেটস্, নেমস্ অব অল মেম্বারস্ অফ্য দ্য ফ্যামিলি আর রিটেন ইন্ দ্য কার্ড।' স্থানীয় একজন অফিসার বললেন, 'আসামে এই সিস্টেম নেই। আসামে শুধু পরিবারের কর্তার নাম লেখা থাকে।' গৌহাটির বড় অফিসারকে একজন ছাত্রনেতা বললেন, 'এওঁলোকক ফেনসিঙর ইফালে আনিথেলাই সেটল্ করা নে যায় নেকি—আফটার ভেরিফাইয়িং দেয়ার সিটিজেনশিপ?' একজন অফিসার বললেন, 'ইমান মাটি নাই নহয় ইফালে। আরু অল ভিলেজারস্ মে নট বি উইলিং টু অ্যাবনজন্ দেয়ার অ্যাসেসট্র্যাল হাউসেস্।' এই অঞ্চলের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন গৌহাটির বড় অফিসার একজন সম্পন্ন গ্রামবাসীকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি করেন?'

—আমি একজন টিচার স্যার।

—টিচার? ভেরি গুড। তা আজ কি আপনি স্কুলে যান নি? এখন তো মোটে সাড়ে তিনটে বাজে।

—না. গেছি স্যার। ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

—কেন?

—পুজোর জন্য।

—কি পুজো?

ধুতি আর আলখাল্লা পরা মাস্টারমশাই বিব্রত বোধ কবলেন। আসলে কাল ছিল মনসা পুজো। আজ ছুটি দেবার কোনো যুক্তি ছিল না। গৌহাটির বড় অফিসার দিল্লীর বড় অফিসারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'হি হ্যাজ টেকেন্ লিভ বাই ডিক্লেয়ারিং হাফ-হলিডে—'

সামসুলরা এবার একটু এগিয়ে এসেছে। অফিসাররা তাদেরও নানা প্রশ্ন করছেন। দিল্লীর বড় সাহেব এবার স্কুলের বই দেখতে চাইলেন। বই নিয়ে এল যে সাত-আট বছরের ছেলেটি এবার তার সাক্ষাৎকারের পালা।

— নাম কি তোমার?

—আব্দুল করিম।

— কোন্ ক্লাসে পড়?

—ক্লাস টু'তে।

—নাম লিখতে জানো?

করিম নিরুত্তর। নিজের নাম সে লিখতে পারে। কিন্তু এত লোকের সামনে নাম লিখতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায়? সত্যি বলতে কি. এত ভাল ভাল পোশাক পরা লোক আর একসঙ্গে এতগুলো এ ধরণের গাড়ি, বন্দুকধারী—এসব সে কোনোদিন দেখে নি। একজন সাংবাদিক বললেন, 'হি ইজ রিডিং ইন্ ক্লাস টু, বাট কান্ট রাইট হিজ ওন নেম—ভেরি

সারপ্রাইজিং!' দিল্লীর অফিসার বললেন, 'আই হ্যাভ সিন ইট ইন্ বিহার অলসো।'

এবার আরেক প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে হল করিমকে।

—বল তো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?

করিম কোনো উত্তর দেয়না। মিনিট তিনেক বিস্তর বলা-কওয়ার পর সে উত্তর দেয়, 'প্রফুল্ল মোহন্ত'।

হাসির রোল ওঠে। একজন অফিসার শিলচরের এক সাংবাদিককে কানে কানে বললেন, 'তবু ভাল হাসিনার নামটা বলে নি।'

ডি.সি অনেকক্ষণ ধরেই তাগাদা দিচ্ছিলেন। এখনো অনেক জায়গায় যেতে হবে। সুতারকান্দিতে কাস্টমস্ অফিসে টি-পার্টি আছে। তারপর লাতু মহিষাসন এলাকার বর্ডার রোড ও কাঁটাতারের বেড়ার কাজ কিরকম হয়েছে দেখাতে হবে। বি.এস.এফের কয়েকটা আউটপোস্টেও যেতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে মুশকিল। অনেক জায়গায়ই রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। তার ওপর এরিয়াটা যতই পিস্‌ফুল হোক, একটা চিন্তা থেকেই যায়। কাছাড়ও তো পিস্‌ফুল ছিল। এখন সেখানে প্রায় প্রতিদিন কিডন্যাপিং হুণ্ডি লুঠ এসব হচ্ছে।

মিনিট পনেরো বাদে সবগুলো গাড়ি সারিবদ্ধভাবে কাদা ছিটিয়ে চলে গেল। সবচেয়ে শেষে যে সবুজ রঙের জিপসিটা ছিল, সেটার গায়ে সামান্য হাত বোলানোর সুযোগ পেয়েছিল সামসুল। গাড়িটা ছিল বি.এস.এফের। হঠাৎ ভারী গলার আওয়াজ শুনতে পায় সামসুল, 'হঠো।' দৌড়ে পালাতে পথ পায়না সে। পুলিশ বি.এস.এফ মিলিটারীকে বড্ড ভয় হয়। যদি কোনো ছুতোয় ঢুকিয়ে রেখে দেয় তাহলেই হয়েছে। একবার সেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল ওর। টাউনে ডিম বিক্রি করতে গিয়ে ফিরতে দেখি রাত হয়ে গিয়েছিল। তাতেই বিপত্তি। জি.পি প্রেসিডেন্টকে ধরে কোনোক্রমে সে যাত্রা রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল।

সাহেবরা চলে যাবার পর শুরু হল তর্ক বিতর্ক আলোচনা গবেষণা। কেউ বলল সাহেবরা পুলিশ বি.এস.এফ নিয়ে এসেছিলেন সীমান্ত একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য, কেউ বলে শুধু বর্ডার রোডস্ দেখার জন্য, কেউ বলে শুধু কাঁটাতারের বেড়া দেখার জন্য, আবার কারোর মতে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে যেসব ভারতীয় গ্রাম রয়ে গেছে সেগুলোর উন্নতি করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য। সামসুল খুঁজছিল কায়ুমকে। কারণ কায়ুম বলেছিল, এখানে এলে দিল্লীকা লাড্ডু পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কায়ুমকে পাওয়া গেল না। কেউ বলল কায়ুম সাইকেলে করে অনেক আগেই এখান থেকে চলে গেছে, কেউ বলল একটা জিপসির পেছনে উঠে সে সাহেবদের সঙ্গেই সুতারকান্দি চলে গেছে।

অদূরে কুদ্দুস মাস্টারকে দেখা যাচ্ছে। কুদ্দুস সাহেব এখন আর মাস্টারি করেন না। বছর তিনেক হল উনি রিটায়ার করেছেন। পাকাদাড়ি চুলওলা মানুষটা দেখতে যেমন শান্ত-গম্ভীর,

কথাবার্তাও সেরকম। সামসুলরা কুদ্দুস মাস্টারের কথার দাম দেয়। তাঁর কথা শোনেও তারা। ভোট হোক বন্যা হোক বি.এস.এফের সঙ্গে ঝগড়া হোক, কুদ্দুস মাস্টারের পরামর্শ সাধারণ গ্রামবাসীরা নেবেই। সামসুল তাঁকে দেখে এগোয়, 'মাস্টার সাব। একখান কথা জিগার করতাম নি?'

—কর না, কর কর।' কুদ্দুস মাস্টার পাঞ্জাবির কোণা দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন।

— ই বাবুহকল যেন্ দিল্লীত্ তনে গৌহাটির তনে বর্ডার দেখাত আইলা। তে আমরা পাইমুনি কুন্তা? আমরার কুনো সুবিধা সুরাহা অইব নি?

কুদ্দুস মাস্টার একপলক সামসুলকে দেখলেন, তারপর বললেন, ইতা আমিউ কিচ্ছু বুঝিয়ার না রেবা। রেডিও নিউজ হুনি, শিলচর করিমগঞ্জের পত্রিকা দুয়েকখান পড়ি, তেউ বুঝমু বিষয় কিতা। দুই চাইর দিন পরে বাড়িত আইও, কইমু নে। বাড়িত কিছু কামও আছে। তুমারে খুজাইছ্লাম মনে মনে—'

তিন দিন পরে এক সকালে গুটি গুটি কুদ্দুস মাস্টারের বাড়ি হাজির হয় সামসুল। হাতে কাজ ছিল না সেদিন, তাছাড়া মনে সেই বিষয়টা জানাব আগ্রহ। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বাংলাদেশের দিকে পড়ে গেল যেসব ভারতীয় গ্রাম, সেগুলোর জন্য কোনো সুবিধা দিচ্ছে কিনা গরমেন্ট, সেটা জানার জন্য মনটা বড় ছটফট করছে ক'দিন ধরে। দেখা যাক, কুদ্দুস মাস্টার কোনো খবর পেলেন কিনা।

কুদ্দুস মাস্টারের বাড়িটা অর্ধেক মাটির অর্ধেক সিমেন্টের। সামসুল গিয়ে দেখল উঠোনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে কাগজ পড়ছেন মাস্টার সাব। সালাম জানিয়ে একটা মোড়া টেনে বসল সামসুল।

—মাস্টার সাব্।

— কওরেবা।

—কুনো খবর লেখছে নি পত্রিকাত? হদিন যেন্ সাহেবহকল আইলা। আমরার লাগি তাইন্ দিলা নি কিচ্ছু?

—পত্রিকাত লেখছে বউত্তা রেবা।' হাতের কাগজটা দেখিয়ে বললেন কুদ্দুর মাস্টার, 'শিলচরর পত্রিকা ইখান। অসমীয়া ছাত্রনেতা হকল যেইন্ তাইন্ আইছ্লা তাইন্ তাইন্ শিলচরো পত্রিকার মান্সর লগে মিটিং করিয়া কইছইন বর্ডারো কাঁটাতারর বেড়া যেতা আছে অতারে ইলেকট্রিফাইড করা অইত অইব যাতে অনুপ্রবেশকারী ঢুকা চেষ্টা করলেই মরি যায়।'

—কথাটা বুদ্ পাইলাম না।

—হায়রে হায়। অউ কাঁটাতারর বেড়া অতার মাঝে গরমেন্ট কারেন্ট লাগাই দিব, আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীয়ে যেম্নে বেড়াখান ছুইব অমনেউ শক্ খাইয়া মরি যাইব।

—আইচ্ছা, অনুপ্রবেশকারীয়ে বেড় ছইলে মরি যাইব। আর আপনে-আমি যদি বেড়া ছই তে আম্‌রার কিতা অইব?

—তে আমরাও মরি যাইমু।

আঁতকে ওঠে সামসুল, 'হায় আল্লা, ইতা কিতা কইন্? আমরা ভারতীয় নাগরিক অইলেও বেড়ায় আম্‌রারে শক্ মারব নি?'

—অয়, মারব।

—আর আমরার হাঁস মুরগি গরু ছাগল ইতায় যদি কাঁটাতারর বেড়া ছয় তে তারাও মরি যাইব নি?

—অয়, তারাও মরি যাইব।

মুখটা ঝুলে পড়ে সামসুলের। কুদ্দুস মাস্টার খচরমচর শব্দ করে দ্রুত কাগজের পাতা ওল্টান। সামসুল আবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মাস্টরসাব, আর কিতা কইছইন্ ছাত্রনেতা হকলে?'

—আর কইছইন বর্ডারো অনুপ্রবেশকারী দেখলেউ গুল্‌লি করা অইত।

—গুললি? বন্দু দি গুল্‌লি করা অইত নি?

—অয় অয়। সামসুল মিয়া, গুল্‌লি কুনো আর বন্দুক ছাড়া মারা যায় নি?

—তে আমরা তো থাকিউ বর্ডারো। আমরারে যদি অনুপ্রবেশকারী ভাবিয়া গুল্‌লি করে তে কিতা অইব?

—তে কিতা আর অইব? মরি যাইমু। তুমার আমার গাত কুনো আর ইণ্ডিয়ান ছাপ মারা আছে নি?

সামসুল নিশ্চুপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। সুসংবাদের পরিবর্তে এতসব দুঃসংবাদ দেবেন কুদ্দুস মাস্টার, এটা সে ভাবতে পারে নি। তবে একটা প্রশ্ন তার মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। শেষ পর্যন্ত সাহস করে কুদ্দুস মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'মাস্টার সাব একখান্ কথা কই। ছাত্রনেতা অকলে দাবি করলেউ কিতা গরমেন্ট ইখান মানি লাইব নি?'

—হুনো রেবা, এইন্ তাইন্ অইলা আসুর ছাত্রনেতা। গরমেন্ট এন্‌তান্‌রে জবর খাতির করে। দেখিত্‌রায় নানি গরমেন্টে এন্‌তান্‌রে গাড়ি পেট্রল খানিদানি সব দিয়া হউ গৌহাটিত্ তনে বরাক উপত্যকাত্ লইয়া আইছে। রাখছে সার্কিট হাউসো, দিল্লী দিশপুরর বড় বড় অফিসারর লগে পাঠাইছে। গতিকে ই ছাত্রনেতা অকলে যেতা কইবা, গরমেন্টর হিখান অন্তত বিবেচনা করা লাগব।

কড়া রোদ উঠেছে ততক্ষণে। সামসুলের সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে। সারা শরীর গরম, মাথাটা যেন আরো বেশি গরম হয়ে উঠেছে। গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সে উঠে দাঁড়ায়, 'মাস্টর সাব।'

—কও রেবা।

—কায়ুম খবিজে হদিন কইল আমরা দিল্লীকা লাড্ডু পাইমু আর অখন দেখা যার আমরা পাইমু কারেন্টর শক্ আর গুল্‌লি। তে আইজ কায়ুমরে জিগাই লাইতাম হে হদিন মিছা মাত্ মাত্‌ল কেনে। আইজ হিকাই লাইতাম তারে—' বলেই সামসুল তীরের বেগে ছুটল কায়ুমের বাড়ির দিকে। কুদ্দুস মাস্টারও ছোটেন পেছন পেছন, 'আরে আরে করো কিতা সামসুল মিয়া। আমার কথা হুনো। কায়ুমর লগে কাজিয়া করিয়া কিতা করতায়। যদি হাচার হাচাউ গরমেন্ট বেড়াত কারেন্ট লাগায় আর দেখামাত্র গুল্‌লির নির্দেশ দেয় তে গাউয়ালা হক্‌লে মিল্‌যা ইখানর মুকাবিলা করা লাগব। হুনো, যাইও না।'

কে কার কথা শোনে? সামসুল এমনিতে ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ এবং সে কখনো কুদ্দুস মাস্টারের কথার অবাধ্য হয় নি। কিন্তু আজ এক নতুন সামসুলকে দেখতে পেলেন মাস্টার। খুব বেশি ছুটতে পারেন না কুদ্দুস, হার্টের অসুখ আছে। এক সময় লতিফ মিঞার বাঁশঝাড়ের নীচে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন কুদ্দুস, সামসুল দৌড়তে দৌড়তে কায়ুমের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। কায়ুমকে শত্রু ঠাউরেছে সে। বোকা মানুষ, সামসুল জানে না কায়ুম তার শত্রু নয়! আসল শত্রুদের সামসুলরা কোনোদিন চিনতে পারবে না। ধরতেও পারবে না।

কুদ্দুস সামসুলকে জোরগলায় ডাকেন, 'সামসুল মিয়া-আ-অ, আমার কথাখান্ হুনি যাও—'। কুদ্দুস মাস্টারের ভাঙাগলার নিষ্ফল ডাক মিলিয়ে যায় ভারত ও বাংলাদেশের নিস্তব্ধ ছায়াঘেরা গাছগাছালি ভরা সীমানার দু'ধারে।

অরিজিৎ চৌধুরী

নিরালম্ব

নৌকোটা যখন কুশিয়ারা নদী পার হচ্ছিল, তখন সৌম্য নিচু হয়ে হাত দিয়ে নদীর কালো জলটা স্পর্শ করে। চৈত্র মাসের চার তারিখ আজ, রোদ খুব একটা চড়া নয়, তবু বেলা বারোটা বাজতে না বাজতে জল বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের করিমগঞ্জ থেকে কুশিয়ারা পেরিয়ে ভারতের করিমগঞ্জে যাচ্ছে সৌম্য দিন দশেকের জন্য। নৌকোয় সে একা নয়, আরেকজন জোব্বা পরা সাদা চুলদাড়িওলা মুসলিম ভদ্রলোক রয়েছেন, সঙ্গে একজন বোরখা পরা মহিলা। তিনি তাঁর বিবিও হতে পারেন, কন্যাও হতে পারেন বা কোনোকিছু না-ও হতে পারেন। মহিলা দু'একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভদ্রলোক উনি কিছু বলতে গেলেই থামিয়ে দেন। ভদ্রলোক প্রায়ই ইণ্ডিয়াতে আসেন। এটা তাঁর কথাবার্তায় বোঝা যায়। নরেশ নামের যে মাঝি নৌকায় দাঁড় বাইছিল, তার সঙ্গেও ভদ্রলোকের ভালো পরিচয়। উনি বলছিলেন, 'গত ফিরা মনো আছেনি নরেশ, সিলেট ফিরলাম যেদিন, হদিন কিজাত বৃষ্টি আছিল। আর নদীর পানিও আছিল বেতালা।'

নরেশ উদাসীন ভাবে বলে, 'ইতা পরতি বছরউ অয়। মণিপুরো বৃষ্টি থুড়া বেশ দিলেউ বরাক নদী উথলাইয়া উঠে, লগে লগে সুরমা কুশিয়ারাও। জল বাড়ে, ফ্লাড হয়, বান্ধ ভাঙে। আমরার পরিবার পাঠানি লাগে নীলমণি স্কুলে।'

সৌম্য মুসলিম ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনে বোধহয় প্রায়ই আইন্ ইণ্ডিয়ায়।'

উনি দাড়িতে হাত বুলিয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'অয়, বছরো একবার দুইবার আওয়া পরি যায়।'

—কুটুম আছইন মনখয় ইন্ডিয়াত্।

—বেজাল। আমরা চৌদ্দজন ভাইবইন্। এর মাঝে আটজন বাংলাদেশ থাকইন, পাচজন ইন্ডিয়াত্। এক ভাই মারা খাইছইন। হেইন্ও ইন্ডিয়াত্ থাকতা। পুয়াইন লন্ডনো। তানঅউ এক নাতির বিয়াত্ যাইয়ার।

—করিমগঞ্জ টাউনো নি?

—না, গাউও। নিলামবাজারর কান্দাত।

ততক্ষণে নৌকো কালীবাড়িঘাটে লাগিয়েছে নরেশ। ভদ্রলোক ব্যাগ সুটকেস্ হাতে নেন, কাঁধে একটা মস্ত ঝোলা। মহিলাও দুই হাতে দুটো ব্যাগ তুলে নেন। সেই তুলনায় সৌম্যর মালপত্র কম। একটা মাঝারি আকারের সুটকেস আর একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ। সৌম্য মহিলাকে বলল, 'একটা ব্যাগ আমার হাতে দিলাইন্।'

মহিলা মনে হল বোরখার মধ্যে ফিক্ করে হাসলেন। বললেন, 'না-না, লাগতো নায়।'

গলার স্বরটা মিষ্টি। নদীরপাড়ে নেমে ভদ্রলোক বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন, সৌম্য কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পেরে বোরখাধারিণীকে জিজ্ঞেস করে, 'তাইন্ আপনার কে?'

মহিলা আবার ফিক্ করে হাসেন। এবার হাসির শব্দটা স্পষ্টভাবে শোনা যায়। উনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমি তান বিবি। চাইর্ নম্বর।'

ঠিকই আন্দাজ করেছিল সৌম্য। ভদ্রলোক খানিক এগিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন উনি। সৌম্য আর কথা না বাড়িয়ে পা চালায়। কাস্টমস্ অফিস ও পুলিশের পিসিপি-র ঝামেলা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি পিসির বাড়িতে পৌছতে হবে। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কোন্ সকালে পেটে দুমুঠো পড়ে ছিল।

পাসপোর্ট, চেকপোস্ট এবং কাস্টমস্ অফিসের কাজ সেরে কুশিয়ারা নদীর বিসর্জন ঘাটের দিকে রিক্সার খোঁজে এসে সৌম্য লক্ষ্য করে করিমগঞ্জে ডাকবাংলোটার অস্তিত্ব নেই। সামনে একাত্তরের ভারত-পাক যুদ্ধের শহিদ মেজর চমনলাল ও আরও দুই ভারতীয় সৈন্যের স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্মিত শহিদ বেদীটা ঠিকই আছে, তবে ডাকবাংলোর সেই পুরনো ভবনটা ভেঙে ফেলেছে। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে সৌম্য জানতে পারল ওখানে নাকি একটা পর্যটক নিবাস তৈরী করা হবে।

সৌম্যর পিসির বাড়ি লঙ্গাই রোড। আর এই লঙ্গাই রোডের নাম শুনলে, কোনও রিক্সাওয়ালাও যেতে চায় না। সৌম্য বলে, 'আগে শুনছি লঙ্গাইর রাস্তা খারাপ আছিল। অখন তো শুনছি রাস্তা বানানি অইছে—'

'অউ বানাইল রাস্তা আবার ভাঙ্গি যার বাবু। নেইন্ উঠউকা'—পোস্টাপিসের মেইন গেটের সামনে দয়াপরবশ হয়ে একজন যুবক রিক্সাওয়ালা রাজি হয় সৌম্যকে সওয়ারি করতে। 'যাইতা কানো? লঙ্গাইর পুলর অনো না আরো আগে'—প্যাডেলে পা রেখে জিজ্ঞেস করে

রিক্সাওয়ালা। সৌম্য বলে, 'পুল পর্যন্ত যাইতে লাগত নায় রেবা। পুলর বউত্ আগে।'

যেতে যেতে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে গল্প জমায় সৌম্য। ছেলেটির নাম সত্তার, বাড়ি বটরশি। বয়স একুশ-বাইশ, বাবা মারা গেছেন, তাই তাকে রিক্সা চালাতে হচ্ছে। তারা ভাইবোন সাতজন। সে-ই বড়। রাজমিস্ত্রির সহকারীর কাজ করতে সে নাগাল্যাণ্ডে। সেখানে রোজগার তার ভালই ছিল। কিন্তু জন্মের ও নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণপত্র না থাকায় সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছে। তবে কাগজপত্র জোগাড় করার জন্য সে ডি.সি অফিসে দালাল লাগিয়েছে। জোগাড় হলে সত্তার আবার সেখানে যাবে। সম্ভব হলে একটা ভাইকেও নিয়ে যাবে।

সৌম্য লক্ষ্য করল ছেলেটি নির্ভয়ে কোনও কিছু রাখঢাক না করে তার সঙ্গে কথা বলছে। এমনকি কখনও কখনও যে তাকে বেআইনিভাবে বর্ডার পার হয়ে বাংলাদেশে যেতে হয় সে কথাও সত্তার গোপন করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। মাঝেমধ্যেই সে কথার ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'কুন্ হালায় আমার কিতা করত?'

সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও একজন সামান্য রিক্সাচালকের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে লক্ষ্যণীয়, বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে হাজার কোটি অন্তর্ভেদী সার্চ লাইট দিয়ে খুঁজলেও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। হিন্দুরা সেখানে সদা সন্ত্রস্ত, তটস্থ। গতবছর রমজানের সময় পড়েছিল দেওয়ালি। ভুলক্রমে সে সময় সৌম্যর দূরসম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই বাড়ির সামনে বাজি পুড়িয়েছিল, তারপর সে কী অবস্থা। শত শত লোক ছুটে আসে সৌম্যদের পাড়ায়, যেখানে এখনও বেশ কিছু হিন্দু বসবাস করে। রমজান মাসে সশব্দে বাজি পোড়ানোর ঘটনায় উত্তেজিত জনতা। শেষ পর্যন্ত হাতেপায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে আর কোনওদিন এরকম 'বেআদবি' না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এরকম মাঝে মধ্যেই হয় সেখানে। দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা, মন্দির অপবিত্র করা, হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি, হিন্দু মেয়ে অপহরণ এবং তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার—এসব সে দেশের এখানে-সেখানে দু'দিন পর পরই হচ্ছে। ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যরা কেউ এ'সবে তেমন গুরুত্ব দেয় না আজকাল।

পিসির বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমে একটা দশটাকার ইন্ডিয়ান নোট ধরিয়ে দেয় সৌম্য। সত্তার সেটা হাতে নিয়ে বেজার মুখে বলল, 'কম অই যার বাবু। আরো পাচটা টেকা দেইন্।'

সৌম্য অবাক হয়, 'আগে তো দশ টাকাউ দিতাম রে বা।'

রিক্সাওয়ালার চেহারা পাল্টে যায় সঙ্গে সঙ্গে। একটা গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে সে বলে, 'কিতা যে মাতইন। ই দেশো চাউলর কেজি কমসে কম পনরো টেকা। আরো পাচটা টেকা দেইন, নায় আমরা বাচিতাম কিলা?'

দিতে হল আরও পাঁচটাকা। সৌম্যর মনে হল সত্তার অন্যায়ভাবে টাকাটা নিচ্ছে। কিন্তু ঝামেলা এড়ানোর জন্য সে টাকাটা দিয়ে দেয়।

পিসির বাড়িতে সৌম্য এল প্রায় বছর দুয়েক বাদে। পিসির বয়স সত্তরের কাছাকাছি, দৃষ্টিশক্তি ভালো কাজ করে না, তবুও দূর থেকে দেখেই সৌম্যকে চিনতে পারলেন। সৌম্য প্রথমে প্রণাম করে পিসিকে তারপর দুই পিসতুতো দাদা ও বৌদিকে। পিসি খুব খুশি ভাইপোকে দেখে। একগাল হেসে বলেন, 'তুই রোগা অই গেছছ্।'

বড় বউয়ের নাম নন্দা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। দুই বাচ্চার মা, আগে দেখতে খারাপ ছিল না, এখন এত মুটিয়েছে যে চেহারা টেহারা কিছু বোঝা যায় না। সৌম্যর প্রণাম গ্রহণ করে নন্দা বলল, 'বাংলাদেশের মানুষহকল প্রণাম করাত খুব উস্তাদ।'

সৌম্য হালকা চালে বলে, 'বাঙালিরার ভদ্রতা সৌজন্যবোধ শিষ্টাচার বাংলাদেশের মানুষেই বাচাইয়া রাখছে কইন।'

ছোট বউ শিউলি নন্দার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। ওর এক ছেলে। সৌম্যকে প্রণাম করতে দেখে সে সসঙ্কোচে সরে যায়। অত বড়সড় একটা মানুষ প্রণাম করছে ভাবলেই কেমন লাগে। শাশুড়ির মতে অবশ্য তাঁর ভাইপো শিউলির চেয়ে অন্তত পাঁচবছরের ছোট। কে জানে, হতেও পারে। ছেলেটা খারাপ না, তবে বাংলাদেশি স্বভাবগুলো একটু প্রকট। যেমন, ঘুম থেকে সকাল ন'টার আগে উঠবে না, রাত্রে টিভি দেখবে রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত, ভাত খাবে একথালা আর বৌদিদের আপনি বলবে।

নাছোড়বান্দা সৌম্যকে প্রণাম করতে দিয়ে শিউলি বলে, 'জামদানি আনছো নি রে বা? আগের বার নু কইয়া দিলাম।'

সৌম্য জিভ কেটে বলে, 'এঃ হে ছোটবউদি, বড় ভুল অই গেছে। নেক্সট্ টাইম লইয়া আইমু কথা দিলাম।'

ছুটির দিন ছিল, তাই দুই দাদা হেমন্ত ও শ্রীমন্ত বাড়িতেই রয়েছে। দু'জনেই বাংলাদেশের হালফিলের খবর জিজ্ঞেস করল। সৌম্য বলে, 'ওউ এক রকমউ। আমরার লাগি সকলঅউ এক, খালেদা যেতা, রাষ্ট্রপতির শাসনও ওতা। হাসিনার আমলো একটু বেটাব আছিল কওয়া যায়, কিন্তু মুটামুটি কইতে গেলে সবঅউ এক। তুমরার লাগি দুইটা পেপার আনছি—বলে বাংলাদেশের দুটো ভারি ওজনের দৈনিক পত্রিকা শ্রীমন্তর দিকে বাড়িয়ে দেয় সৌম্য। শ্রীমন্ত ছোঁ মেরে নেয়। সব ধরণের পত্রিকার সে একনিষ্ঠ পাঠক। 'দেখি দেখি' বলে হেমন্তও সাগ্রহে এগিয়ে আসে। সে দেশের অবস্থা নিয়ে কথাবার্তা গবেষণা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। সৌম্যই প্রধান বক্তা। নন্দা দুটো মিষ্টি আর চা দিয়েছিল। চা-টা জল হয়ে যায়।

পিসি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'তুমরার গফ্সফ্ পরে অইব। আগে স্নান করো। বেলা দুইটা বাজে। এই সৌম্য, তুই আগে যা। কুন্ সকালে সিলেট তনে বারইছছ্। যা যা, বাথরুম খালি অইছে। না কিতা পুকুরো ছান্ করতে?'

পুকুরের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে যায় সৌম্যর। একসময় টলটলে জল ছিল ছোট্ট

পুকুরটায়। এখন সে জল কালো। ওপরে একটা লালচে আস্তরণ। দেখলে আর ডুব দিতে ইচ্ছে হয় না। জল অনেকখানি শুকিয়ে একটা ডোবার আকার নিয়েছে পুকুরটা। পিসেমশাই থাকতে যত্ন করা হত পুকুরটার। এখন আর সে'সব নেই। কলের জল অঢেল আসে বাড়িতে, পি.এইচ.ই-র ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কাছে বলে। পুকুরটা তাই এখন দাদারা বিক্রি করে দিতে চায়। পিসির আপত্তিতে তা আর হয়ে উঠছে না।

স্নান-খাওয়া সেরে পিসিমার খাটের পাশের বিছানায় টানা দু-ঘন্টা ঘুমোল সৌম্য। চশমা চোখে দিয়ে পিসি সুপুরি কাটছিলেন আর জানতে চাইছিলেন সিলেটের বাড়ির কথা। ঘরগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা, উঠোনের আমগাছ দুটোয় আগের মত আম হয় কিনা, পুকুরে পাকা রুই এখনও আছে কিনা—গ্রামের দিকের জমির পুরোটাই বেদখল হয়ে গেছে কিনা—-এইসব জানতে চাইছিলেন পিসি। সৌম্য প্রথম দিকে দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দিয়ে হুঁ-হাঁ করতে করতে একসময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পিসি সাবিত্রী সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সিলেটের বাড়ি থেকে দেশভাগের পর আস্তে আস্তে তাঁদের পরিবারের সবাই ভারতে চলে এসেছিল, আসেনি শুধু এক দাদা শুভ্রাংশু, অর্থাৎ সৌম্যর বাবা। অদ্ভুত এক জেদ ছিল দাদার মধ্যে, বলত, 'আমি আমার জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতাম কেনে? দেখবায় একদিন অউ রেফারেণ্ডাম, অউ পার্টিশন ইতা কিচ্ছু টিকত নায়। কয় বছরের মধ্যেউ দেশ আবার জুড়া লাগব।'

কিন্তু তা হয়নি। শুভ্রাংশু যখন এসব বলতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বছর তিনি এ'সব বলে এসেছেন এবং যা বলেছেন তা বিশ্বাস করেছেন। চব্বিশ বছর পরে একদিন পরিবর্তন এল, পাকিস্তান ভাগ হল, বাংলাদেশের জন্ম হল। সে সময় পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে এপারে এসেছিলেন শুভ্রাংশু। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর আবার সবাইকে নিয়ে তিনি ফিরে যান সিলেটে। খান সেনা আর রাজাকাররা মিলে তাঁদের বাড়ির সবকিছু লুঠ করে নিয়েছিল এবং ঠাকুরঘর সহ বাড়ির একটা অংশ পুড়িয়ে দিয়েছিল। সে'দেশের সেই বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে নিঃস্ব শিক্ষক শুভ্রাংশুকে ফের নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়েছিল। তারপর একদিন শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন, আওয়ামি লিগ ক্ষমতাচ্যুত হল, ফিরে এল আবার সেই পাকপন্থী সেনা ও মৌলবাদীদের দাপট। সাবিত্রীরা তখনও অনেকবার বলেছেন শুভ্রাংশুকে, সিলেটের বাড়িঘর জমিজমা এক্সচেঞ্জ করে অথবা যা দাম পাওয়া যায় সেই দামে বিক্রি করে গয়নাগাঁটি যা আছে, তা নিয়ে ভারতে চলে আসার জন্য। কিন্তু উনি রাজি হননি। আজীবন এই আশা তিনি বুকের নিভৃতে লালন করেছেন যে ভাঙা বাংলা ভাঙা সিলেট আবার জোড়া লাগবে। শেষদিকে কথাগুলো আর প্রকাশ্যে বলতেন না, কারণ যারা শুনত তারা হাসাহাসি করত। কিন্তু তিনি যে এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, তা তাঁর কথাবার্তা থেকে কখনও কখনও প্রকাশ হয়ে পড়ত। বছর চারেক আগে শুভ্রাংশু মারা যান। হার্টের প্রবলেম ছিল বহু বছর

ধরে। ওযুধপত্র ঠিকমতো খেতেন না। একদিন শেষরাত্রে তিনি অকস্মাৎ চোখ বোজেন। মারা যাওয়ার আগে তাঁর মুখে কয়েকবারই শোনা গেছে জড়ানো স্বরের অস্পষ্ট স্বগতোক্তি, আমি ইণ্ডিয়াত্ যাইতাম নায়। আমি ইণ্ডিয়াত্ গিয়া থাকতাম পারতাম নায় ... ...।'

শুভ্রাংশুর দুই মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাংলাদেশে। সে এখন লণ্ডনে থাকে, তার স্বামীর সেখানে রেস্তোঁরা আছে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে। তারা শুদ্ধ বাংলা জানে না, জানে সিলেটি উপভাষা আর সাহেবি ইংরেজি। তিন চার বছরে একবার তারা বাংলাদেশ ও ইণ্ডিয়া ঘুরে যায়। বড় মেয়ের পরেই সৌম্য। সে সিলেটে একটা ছোটখাটো ব্যবসা করে। শুভ্রাংশু মারা যাওয়ার ক'মাস আগে তার বিয়ে হয়। সৌম্যর এক ছেলে। সৌম্যর পরের বোনের বিয়ে হয়েছে বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলে। সেখানে এখনও যথেষ্ট হিন্দু আছে। যে বাড়িতে বোনের বিয়ে হয়েছে সেই পরিবারের অন্তত তিনজন কানাডা বা আমেরিকায় থাকে। এদের টাকাপয়সার কোনও অভাব নেই। ওরা কোনও দিন ভারতে আসবে না, কিন্তু যে কোনও সময় ওরা সবাই স্থায়ীভাবে কানাডা কিংবা আমেরিকা চলে যেতে পারে। সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ভাই প্রবাল। সে পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল, কিন্তু কোনও মোটা মাইনের চাকরি সে পেল না। শেষ পর্যন্ত তাকে বাবার পেশা অর্থাৎ শিক্ষকতাকেই বেছে নিতে হল, সে অজস্র প্রাইভেট টিউশনি করে, টিউশনির সূত্রেই সে কিছুদিন আগে একটি মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে। সৌম্যরা এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। মেয়েটি যে খুব সুন্দরী তা নয়, কিন্তু তার কথাবার্তা ছিল খুব বুদ্ধিদীপ্ত, আর লোকগীতি গাইত খুব ভালো। সৌম্যর সঙ্গেও একদিন আলাপ হয়েছিল মেয়েটির। গোঁড়া পরিবারের মেয়ে হয়েও সে তসলিমা নাসরিনের বইটই পড়ত। ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ানোর আগেই মেয়েটির বাবা ওকে চুপিসাড়ে ঢাকা নিয়ে গিয়ে হঠাৎ একদিন এক অস্ট্রেলিয়াবাসী বাংলাদেশি মাঝবয়সী ডাক্তারের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পরই সে উড়ে চলে যায় বিদেশ। খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সৌম্যরা। আর স্তব্ধ হয়ে থাকে প্রবাল। তিনদিন তিন রাত সে ঘুমোয়নি। আস্তে আস্তে অবশ্য সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে এখন কেউ যদি প্রবালের বিয়ের কোনও সম্বন্ধ নিয়ে আসে তবে সে ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে সৌম্য। ফুলস্পিডে ফ্যান চলা সত্ত্বেও একটু ঘামছে সে। সাবিত্রী জানালার পর্দা সরিয়ে দেন। মাঝেমধ্যে হাওয়া আসছে। ভাইপোর জন্য এক ধরণের করুণা অনুভব করেন সাবিত্রী। তিনি জানেন কেন সে কয়েক বছর পর পর ভারতে আসে। তার ইচ্ছে সবাইকে নিয়ে ইণ্ডিয়াতে চলে আসে। বাংলাদেশের এই দমবন্ধ পরিবেশে থাকতে তার একটুও ভালো লাগে না। পিসি পিসতুতো দাদা বা অন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে একটু সমর্থন পেলে সৌম্য সবাইকে নিয়ে এদেশে চলে আসবে। কিন্তু জোরগলায় তাদের ভারতে আসতে উৎসাহ দিতে পারেন না সাবিত্রীও। রাজনীতির মারপ্যাঁচ দু'দেশের আইনকানুন এসব তিনি বোঝেন না। কিন্তু এটা বোঝেন যে তাঁদের নিজেদের পক্ষেও এই জায়গাটা খুব বেশিদিন

নিরাপদ থাকবে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর টিভি-তে এ.টি.এন চ্যানেলে বাংলাদেশের খবর দেখতে দেখতে সৌম্য প্রসঙ্গটা তোলে। হেমন্তকে জিজ্ঞেস করে সে, 'হিমুদা, কও চাইন্ ই দেশর কুন জাগাত বাড়ি কিনিয়া শান্তিতে থাকা যাইব?'

হেমন্ত গম্ভীরভাবে বলে, 'কুনো জাগাত্উ নায়। তুই কিতা মনো করছ্ নি আমরা খুব শান্তিতে আছি?'

—না না, হি তো প্রত্যেক জাগাতউ কিছু না কিছু প্রবলেম আছে। হিতা থাকবউ। আমি কইরাম যদি আমরা ই দেশো আই, তাইলে কুন্ এরিয়াত্ আওয়াটা ভালা অইব? বরাকভ্যালি, না ত্রিপুরা না কইল্কাতা?

হেমন্তকে নিরুত্তর দেখে সৌম্য শ্রীমন্তের দিকে মুখ ফেরায়, 'সিমুদা, তোমার কী মত?'

শ্রীমন্ত বলে, 'দ্যাখ সৌম্য, আমরার বাবা-মা ই দেশো অনেক আগে আইছইন্। আমরার জন্মকর্মও ই দেশো। কিন্তু অইলে কিতা অইব। আমরার হাতো নিজেরার নাগরিকত্বর কুনো প্রমাণ নাই। ট্রান্সফার হইয়া কিছুদিন ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিত আছলাম। বানাই দিল ডি. ভোটার। অর্থাৎ ডাউটফুল ভোটার। আমরার ছেলেমেয়েরার ইনো কুনো চাকরি নাই, রুজি-রোজগারর জন্য কুনো ব্যবস্থা নাই। গুণ্ডামি-ছুঁচামি ঠগামি করিয়া যদি তুমি বাচতায় পারো তে বাচো আর নায় মরো।'

—অলা অবস্থা নি ই দেশের?

—অয়। অখন দ্যাখো, আমরার মতো জেনুইন সিটিজেনর-অউ ইনো এই অবস্থা। এর মাজে বাংলাদেশ তাকি যদি তুমরা আও, তাইলে তো বুঝিতরায় অউ কিতা অবস্থা অইব। যদি সামান্যতম ভরসা দেওয়ার মতো পরিবেশ থাকত, তাইলে কইলাম নে, না ঠিক আছে তুমরা আও। কিন্তু বিষয়টা ইলা নায়।'

সৌম্য আর কথা বাড়ায় না। মনেমনে খুবই নিরাশ হয়ে সে শুতে যায়। সে জানে একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের পরে যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসবে, তারা বিদেশী। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের বেলা কেন এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে? তাহলে দেশভাগের সময় রাষ্ট্রনেতারা যে'সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের, সে সবই মিথ্যে?

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরী হয়ে যায় সৌম্যর। কিসের একটা চেঁচামেচিতে তার ঘুম টুটে গেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সৌম্য দেখে প্রায় ন'টা বাজে। চেঁচামেচির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল চেঁচিয়ে কথা বলছে পিসিদের ঠিকে কাজের লোক বাসন্তী। সে আসে শহরের উপকণ্ঠের একটা গ্রাম থেকে। তার কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল অন্যদিন সে ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাতটা নাগাদ পিসিমার বাড়িতে পৌঁছে যায় এবং এ

বাড়ির কাজ শেষ করে আরও তিনটে বাড়িতে কাজ সারে। কিন্তু আজ ভোরবেলা তার কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখে যে রাস্তা দিয়ে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সে যাতায়াত করছে, সেটা বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করেছে পঞ্চায়েতের নব-নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বারের ভাই। বাসন্তী রাস্তার মধ্যে বেড়া দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে এটা তাঁর জায়গা। এতদিন তিনি দয়া করে খোলা রেখেছিলেন বলে বাসন্তীরা এদিক দিয়ে যাতায়াত করেছে। কিন্তু সারাজীবনের জন্য তো এই ব্যবস্থা হতে পারে না, তাই এখন তিনি জায়গাটায় বেড়া দিয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, প্রথম পক্ষের সাতটি সন্তান তো আছেই। এখন তিনি এই জায়গাটায় একটা নতুন ঘর বানাবেন। বাসন্তী তাঁকে বলেছে, 'অতদিন ধরি আমরা জানি ইটা পঞ্চায়েতর রাস্তা, আর আইজ আক্‌থা ই রাস্তাখান আপ্‌নার জেগা অই গেল নি?'

এর উত্তরে তিনি লুঙ্গি তুলে বাসন্তীর দিকে কদর্য ভঙ্গি করে বলেছেন, 'পঞ্চায়েতর রাস্তা? আমার অগুর রাস্তা। বান্দির বাইচ্চি, আর একটা কথা কইলে অনউ তোরে লেংটা করি ছাড়ি দিমু।'

শেষের কথা ক'টি বাসন্তী নিচুস্বরে বললেও বাড়ির সবার কানে যায় মধু বাণীগুলো। বাড়ির বড়রা সবাই এই ঘটনায় বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করলেন, কিন্তু সৌম্য লক্ষ্য করল কেউই জোরগলায় কিছু বলল না।

হেমন্ত বাসন্তীকে পঞ্চায়েত সভাপতি বা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে যেতে বললে বাসন্তী মুখ কালো করে বলে, 'তারা কেউ হাত, কেউ হাতি, কেউ ফুল, কেউ তালাচাবি। কিন্তু আমরার ঠেকার সময় দেখবা তারা হক্কল এক। তারার কাছে গিয়া কুনো লাভ নাই।'

সৌম্য ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁত ব্রাশ করে চায়ের অপেক্ষা করছে। একটু পরে শিউলি দুটো বিস্কুট আর চা নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কিতা বা, ঘুম অইছে নি ঠিকমতো?' সৌম্য হাসে, 'হাচা কথা কইতে কিতা বউদি, সকালে ঘুমটা যখন লাগছিল ভালা করিয়া, তখন তুমরার অউ বাসন্তীর চিল্লাচিল্লিত্ ঘুমটা ভাঙ্গি গেল—'

এই সকালবেলা শিউলির মুখভর্তি পান। উঠোনের ড্রেনে পিক্ ফেলে বলল, 'ইতা আমরার লাগিয়াও আছে।'

চায়ে চুমুক দিয়ে সৌম্য শ্রীমন্তকে বলল, 'সিমুদা, তুমি কিছু একটা কর তাইর্ লাগি।'

—কার লাগি?

—বাসন্তীর লাগি? বেটির আওয়া-যাওয়ার পথ বন্ধ অই গেছে।

—ইতা কিছু করার নাই। মরতায় নি মাতিয়া? মানি পাওয়ার, মাসল্ পাওয়ার, পলিটিক্যাল পাওয়ার—হকলতাউ ই-দেশো অউ ওয়ার্ড মেম্বারর ভাইয়ের মতো মানুষর হাতো, কাজেউ ইতা লইয়া মাথা না ঘামানিউ ভালা।

—ইতা কিতা কও সিমুদা?

—যেখান কইয়ার হাচাউ কইআর। দেখরায় নানি চউখর সামনে।

তিন-চারদিন কেটে যাবার পর সৌম্য এক সকালে শিলচর বেড়াতে গেল। সেখানেও তার কিছু আত্মীয়স্বজন আছেন। প্রায় সবার সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ হল। কিন্তু কাজেব কাজ কিছুই হল না। কেউই অভয় দিয়ে বলে না, 'আইয়া পড়ো ইণ্ডিয়াত্, আমরা তুমরার পিছে থাকমু।' বরং কেউ কেউ স্পষ্টভাবে বলল, 'ই দেশো আইলেউ বিদেশি কইয়া বান্ধি লাইব। আর আইয়া কিতা করতায়—দেখছো নি জিনিসপত্রর দাম আর রাস্তাঘাটর অবস্থা?'

সৌম্য বলেছিল, 'জিনিসপত্রের দাম তো আমরার দেশো আরো বেশি। আর সবচেয়ে বড় কথা কুনো সিকিউরিটি নাই।'

উত্তরে একবাক্যে সবাই জানায়, 'সিকিউরিটি আমরার আছে নি? টাউনো থুড়াথুড়ি অখনো আছে, তবে বেশিদিন থাকতো নায়। আর গাউত তো একেবারেউ নাই। কত রিফিউজি যে বরাক ভ্যালির গাউত তাকিয়া গত বছরে দ্বিতীয়বারের মতো রিফিউজি অইলা, তার কুনো হিসাব কেউ কুনোদিন করছে নি?'

এক রবিবার সকালে সৌম্য তার গোষ্ঠী সম্পর্কের জ্যেঠতুতো দাদা নবারুণের বাড়িতে যায়। নবারুণ তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। সে একজন শিক্ষক, তার স্কুলে সপ্তাহে তিনদিনের বেশি তাকে যেতে দেখা যায় না। স্কুল কর্তৃপক্ষও কিছু বলেন না, কাবণ সে এই অঞ্চলের একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী এবং সে একজন লেখকও বটে। পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রায়ই বের হয়। নবারুণ মনে করে নরেন্দ্র মোদিকে 'নরাধম মোদি' বলাটা অত্যন্ত সঙ্গত, সাচার কমিটির প্রতিবেদনে ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অবহেলিত বঞ্চিত বলে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তাও অত্যন্ত যুক্তিসম্মত। এ সব নিয়ে ইদানিং প্রকাশিত তার দুটো লেখা সৌম্য পড়েছে। পড়ে সে অবাক হয়ে ভেবেছে, বাংলাদেশে তা সৌম্যরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সে দেশে তাদের নিয়ে লেখালেখি করার সাহস দেখাতেন, তাঁদের প্রায় সবাই এখন দেশছাড়া। তসলিমা নাসরিন শুধু দেশছাড়াই নয়, সারা পৃথিবীতে তাঁর জন্য এক টুকরো সুরক্ষিত স্থান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সৌম্যকে দেখে নবারুণ বসতে বলল। সেখানে খর্বকায় ফর্সামতন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে একই সঙ্গে উত্তেজনা ও বেদনার ছাপ। কথাবার্তায় সৌম্য বুঝতে পারল ইনি একজন সাংবাদিক। গতকাল বিকেলে ডি.সি. অফিসের সামনে একজন কনিষ্ঠ মুসলিম সাংবাদিকের কাছে তিনি যারপরনাই অপমানিত হয়েছেন সম্পূর্ণ বিনা কারণে। মুসলিম সাংবাদিকটি সরকারী কর্মচারী। কিন্তু তাতে তার কোনও অসুবিধে হয় না। ক্ষমতার সব অলিন্দে সাংবাদিক হিসেবেই তার অবাধ যাতায়াত। যেখানে তার চাকরি সেখানে তাকে কদাচিৎ যেতে হয়। তার কখনও ইলেকশন ডিউটি বা কোনও সরকারী ডিউটি বা

কোনো সরকারী ডিউটিই পড়ে না।

সাংবাদিক ভদ্রলোক যখন তাঁর অপদস্থ হবার ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল এক অদ্ভুত ভীতি ও অসহায়ত্ব। সিলেটে সৌম্যর বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁর মুখে এই ভয়মিশ্রিত অসহায়ত্বর ভাবটা লক্ষ্য করেছিল সৌম্য! এই দুই অভিব্যক্তির মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পায় সে। অথচ সংশ্লিষ্ট দুটো মানুষ ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন, দেশ ভিন্ন।

নবারুণ একবার সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ইনো তোর বোর লাগব। ভিত্রে গিয়া ব। আমি আইরাম।'

নবারুণের স্ত্রী রুমা একবার এসে ঘুবে গেছে। সেও ডাকে, 'অয় অয়, ভিত্রে আইয়া ভইন্। বাংলাদেশর গফ্সফ্ শুনি।'

সৌম্য হেসে বলে, 'দাড়াইন্! আগে ইণ্ডিয়ার গফ-সফ্ কিছু শুনি। তারপরে বাংলাদেশের গফ্ হুনাইমু নে।'

নবারুণ ওই সাংবাদিক ভদ্রলোককে 'দাদা' বলে সম্বোধন করছিল, সে বলল, 'দাদা, শুনইন, হে আপনারে মাথা গরম করিয়া কিছু কথা কইলাইছে, ইটা লইয়া মন খারাপ করিয়া লাভ নাই। দেখইন্, তারা ইল মাইনরিটি।'

—কিয়র মাইনরিটি? ই ডিস্ট্রিক্টে তো আমরা মাইনরিটি। একানব্বইর সেন্সাসো তারা আছিল ফর্টি নাইন্ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পার্সেন্ট আর দুই হাজার এক সালর সেন্সাসো বাড়িয়া অইছে ফিফটি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্ট। হিন্দু আছিল নাইন্টি ওয়ান সেন্সাসো ফিফটি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার্সেন্ট আর দুই হাজার এক সালর সেন্সাসো কমিয়া হিন্দুর পার্সেন্টেজ অইছে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন জিরো। তে তো ই জিলাত আমরা পরিষ্কার মাইনরিটি।'

নবারুণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বলে, 'ইটা তো করিমগঞ্জ জিলার হিসাব। আস্তা দেশর কথা চিন্তা করইন। আস্তা দেশ মানে ইণ্ডিয়াত্ তো তারা মাইনরিটি।'

—অইত পারে। কিন্তু পাওয়ার তারার বেশি।

—দেখইন, ইতা আর এস এসি মাত্ আমার লগে মাতইন না যে। আই হেট দ্য কমিউন্যাল এলিমেন্টস্।

—ইউ হেট দ্য হিন্দু কমিউন্যালস্ অনলি।

—না। আমার কথাটা বুঝার চেষ্টা করইন্ যে! ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ। ইখান তো আমরা বুক ফুলাইয়া কই, ঠিক নানি? একটা ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রিতে মেজরিটিরে প্রচণ্ড উদার, সহনশীল আর বুঝদার অইত লাগব। মাইনরিটির সেন্টিমেন্ট, মাইনরিটির প্রবলেম, তারার ফিলিংস বুঝতে লাগব।

—হারা জীবন তো অতাউ করলাম রে বা। কিন্তু শেষ বয়সো আইয়া লাভের মধ্যে লাভ অইল জীবনে কুনোদিন ইনসাল্টেড অইছ্‌লাম না অউ—ওটাও অইতে লাগল। তার অডাসিটিটা তুমি একবার চিন্তা কর—'

—ইতা বাদ দেইন। আপনার উচিত তারে ডাকিয়া কওয়া, ভাইরে ভাই, যেতা অওয়ার অই গেছে, তুই আমার ছুটো ভাই, আইজ তাকি আমরার মধ্যে আর কুনো বিবাদ নাই—'

সৌম্য একবার চিন্তা করে বাংলাদেশে এরকম হলে কী হত। এরকম দুঃসাহস দেখালে হয়তো বয়ঃকনিষ্ঠ সাংবাদিকটির কী হত ভেবে সে শিউরে ওঠে।

রুমা কাজের মেয়ে ইলাকে দিয়ে খবর পাঠায় সৌম্যকে। ইলা বলে, 'বৌদিয়ে কইছইন আপনে ভিত্‌রে আইতা।'

সৌম্য ভেতরে এসে দেখে অনেক আয়োজন। সিঙাড়া তিনটে বড় বড় মিষ্টি একটা ডিমের অমলেট এবং একটা প্লেটে কয়েক টুকরো আপেল। গরম চা থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

সৌম্য বলে, 'বৌদি, করছইন কিতা, অতোতা কুনো খাওয়া যায়নি?'

রুমার এক দাদা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে থাকেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে এদের কোনও যোগাযোগ নেই। সৌম্য বলল, 'ঠিকানাটা দেইন। আমি চেষ্টা করমু খোঁজখবর লওয়ার।'

নবারুণ ভেতরে এল খানিক পরে, এসে বলল, 'ইনর বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না। মুখো পচা গন্ধ।'

—মুখো পায়োরিয়া?

রহস্যময় হাসি উঁকি দেয় নবারুণের মুখে, 'সাম্প্রদায়িকতার পায়োরিয়া। তারপরে কও, তুমারতান দেশর কিতা খবর—'

অনেক খবর সংগ্রহ করে নবারুণ। অনেক কথা, অনেক মতবিনিময় হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে। এক ফাঁকে সৌম্য নবারুণকে বলে, 'একখান কথা হুনো চাইন্। আইচ্ছা, আমি যদি সপরিবারে ইণ্ডিয়াতে আই যাই, তে কুন জাগাত আওয়াটা সেফ্ অইব, কও চাইন্।'

নবারুণ চোখ কপালে তোলে। 'ইণ্ডিয়াত আইতায়? কিয়র লাগি বা? ইণ্ডিয়াত আইয়া কিতা করতায়? ইনো তো তুমরা বিদেশি?'

—কেনে? বাংলাদেশর মাইনরিটির প্রতি ইণ্ডিয়ার কুনো দায়িত্ব নাই নি?

—ইণ্ডিয়ার নিজস্ব সমস্যা লইয়াউ হে ব্যতিব্যস্ত। আবার তুমারতান দায়িত্বও লইত নি? হুনো, ভারতবর্ষত আওয়ার চিন্তা বাদ দেও। বাংলাদেশো আছো, হউ দেশউ থাকো, হউ দেশর লগে একাত্ম হও, বাউলি চিন্তা করিয়া লাভ নাই তো—'

তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে নবারুণ, 'বাথরুম খালি আছে নি? না থাকলে খালি করি দেও। আমি স্নান করতাম?'

—বাথরুমো ইলায় কাপড় ধর্।

—না না তাইরে বারইতে কও। কাপড় পরে ধইব। এগারোটার সময় আমার সেমিনার আছে কমিউন্যাল হারমনির উপরে। ই সেমিনারো আমিউ প্রধান বক্তা। দশটা চল্লিশ বাজিয়া হারছে। ইস্, দেরি অই যার তো—'

নবারুণের এই ব্যস্ততার মধ্যেও সৌম্য বলার চেষ্টা করে, 'তুমরা তো জানো না রে বা আমরা কি রকম আছি—'

নবারুণ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'তুমার দেশর খবর আমি তুমার চেয়ে ভালা জানি। হি দেশো আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে। পুজোর পরে আমি যাইমু তো বাংলাদেশো।'

একটু পরে বিদায় নেয় সৌম্য। নবারুণ এবং রুমা দু'জনেই দুপুরে খেয়ে যেতে বারবার বলল। কিন্তু সিঙাড়াটা খাওয়ার পর থেকেই খুব অ্যাসিড হয়েছে সৌম্যর। তাই সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল।

দেখতে দেখতে দশদিন কেটে যায়। এর মধ্যে একদিন সৌম্য হাইলাকান্দি গিয়েছিল। সেখানে তার এক মামা থাকেন। তিনিও তাদের ভারতে আসার চিন্তাভাবনার কথা শুনে জোরগলায় নিষেধ করলেন। বললেন, 'আইয়া দেখবায়, হখানউ ভালা আছলায়। আমরা তো কয়েকমাসের মধ্যেউ ই জাগা ছাড়িয়া কইলকাতা যাইমু গিয়া। ইতাত আর থাকা যাইত নায়। আমার গ্রামের সব জাগাজমি বেদখল অই গেছে। টাউনর বাড়িও কতদিন রাখতাম পারমু বুঝিআর না।'

সৌম্য পরদিন চলে যাবে শুনে সাবিত্রী বললেন, 'আরও দুইটা দিন থাকিয়া যা। তোরে কইছলাম আলুর পিঠা খাওয়াইমু। রবিবারে বানাইমু পিঠা। খাইয়া যা।'

সৌম্য রাজি হয় না। রবিবার হলে তার অনেক দেরি হয়ে যায়, মিছামিছি। সাবিত্রীকে সে বলে, 'পিঠা সামনের বছর আইয়া খাইমু।'

—আর সামনের বছর। সামনের বছর বাঁচিয়া থাকমু কিনা ঠাকুরে জানে।

ফেরার দিন মালপত্র কাস্টমস্ অফিসে রেখে সে একটু বেরিয়েছিল, হঠাৎ দেখে ইণ্ডিয়াতে আসার সময় যে মুসলমানের ভদ্রলোকের সঙ্গে এক নৌকোয় চেপে এসেছিল তিনি বিস্তর মালপত্র নিয়ে কাস্টমস্ অফিসের দিকে যাচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর চার নম্বর বিবি এবং পাশেই দাঁড়িয়ে এক সুদর্শন পুরুষ। দেখে খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এই ছেলেটি কলেজে তাদের সঙ্গে পড়েছে, কিছুদিন দাবা খেলার সূত্রে তারা বেশ ঘনিষ্ঠও হয়েছিল। কিন্তু তার নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

সুদর্শন পুরুষটিই একসময় এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'অখনও চিনলে না? আমি

নজির। নজির আহমেদ।'

নামটা মনে হতেই আরও অনেক স্মৃতি ভেসে এল মনে। নজির! খুব প্রাণবন্ত ছেলে ছিল সে। কিন্তু স্নাতক হবার আগেই সে লণ্ডন যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। ওর বাবা পরে তাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর সে কোথায় ছিল, কী করছিল—এ সব কিছুই জানা নেই সৌম্যর। তবে চেহারা পোশাক আশাক দেখলেই মনে হয় নজির বেশ ভালোই আছে। দেখতে তার বয়স মনে হয় অনেক কম। সৌম্যর সঙ্গে পড়েছে কে বলবে?

বাংলাদেশের জকিগঞ্জের ঠিক উল্টোদিকে কুশিয়ারা নদীর বিসর্জনঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে দু'জনে গল্প করছিল। ওই ভদ্রলোকের চার নম্বর বিবি নজিরের দিদি। সে এখন থাকে দুবাই, ইণ্ডিয়াতে এসেছে বেড়াতে। এখানে এসে সে জানতে পারে তার দিদিও ইণ্ডিয়াতে এসেছে।

সিগারেট শেষ করে তারা দু'জনে ফিরে যায় কাস্টমস্ অফিসে। কাস্টমস্ ও পিসিপি-র কাজকর্ম মিটিয়ে তারা তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চায় বাংলাদেশে। কিন্তু নজিরের দিদি বললেন তার দুলাভাই চলে গেছেন শম্ভুসাগরের উল্টোদিকের মসজিদে। নামাজ করে ফিরবেন। নজির বলল, 'চল, আরেকটা সিগারেট খাইয়া আই।'

সৌম্য আপত্তি জানায়, 'আমি তো সিগারেট খাই না রে ভাই। তোর পাল্লাত পড়িয়া খাইরাম। চল্। কইরে যখন—'

তখন হুটার বাজিয়ে লাল পতাকার নিশান উড়িয়ে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামে বিসর্জনঘাটের সামনে। পেছন পেছন আরও অনেকগুলো গাড়ি। একটা সাদা গাড়ির সামনের দরজা থেকে সিকিউরিটির একজন লোক নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কালো মতো প্রবীণ চশমা পরা ভদ্রলোক নামলেন। পেছনের দুটো গাড়ি থেকে আরও ক'জন মাঝবয়সী সুবেশ পুরুষ নামলেন। পুলিশের লোক প্রচুর এসে জড়ো হল। তারা ওই ধুতি পরা ভদ্রলোকের চারপাশে যাতে ভিড় না জমে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখছিল। কে একজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'মিনিস্টার'।

সৌম্য ও নজির ঠেলাঠেলির চোটে সেখান থেকে নদীর দিকে সরে যায়। কিন্তু এঁরা দেখা যাচ্ছে নদীর দিকেই এগোচ্ছেন। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে তাঁরা সীমান্ত সম্পর্কে নানা কথা আলোচনা করছিলেন।

সৌম্যরা কিছুই বুঝতে পারছিল না। একটি জিনস্ পরা মেয়ে ফর্সা কমবয়সী এক ভিডিওগ্রাফারকে নির্দেশ দিল, 'এই বর্ডারের ছবি তুলবি না। পুলিশ বি.এস.এফ আপত্তি করবে।' এই মেয়েটি বোধহয় টিভি জার্নালিস্ট। সঙ্গে আরও দু'জন সানগ্লাস পরা যুবক। মুখ বাড়িয়ে মন্ত্রী কী বলছেন শোনার চেষ্টা করছে এবং নোটবইতে তা লিখে নিচ্ছে। এরাও বোধহয় সাংবাদিক।

এদের কথাবার্তা শুনে এবং আরও দু'এক জনকে জিজ্ঞেস করে সৌম্যরা জানতে পারল যে আসাম বিধানসভায় আসাম চুক্তি রূপায়ণ বিষয়ক একটি কনসালটেটিভ কমিটি আছে। এই মন্ত্রী হচ্ছেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন চারজন এম.এল.এ। এঁরা এই কমিটির সদস্য। এঁরা গৌহাটি থেকে বর্ডার দেখতে এসেছেন। বর্ডারের সব জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে কিনা এবং বর্ডার রোডগুলো ভালোভাবে বানানো হয়েছে কিনা সেটা দেখতে এঁরা করিমগঞ্জ ভিজিট করছেন। সঙ্গে বড় বড় অফিসাররাও রয়েছেন।

করিমগঞ্জ শহরের সীমান্তে যে কাঁটাতারের বেড়া নেই মিনিস্টার তা জানেন। দু'জন এম.এল.এ বোধহয় তা জানতেন না, তাই তাঁরা বেশ ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছে। তাঁরা অসমিয়া ভাষায় কথা বলছিলেন। একজন বললেন, 'এনেকুয়া উন্মুক্ত সীমান্ত ইণ্ডিয়ার কোনো ঠাইত এনেধরনর ওপেন বর্ডার আছে বুলি মুই না ভাবো।'

আরেকজন বললেন, 'চওঁক, চাওঁক। বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগাই হেই নাওটো ওপেনলি ইণ্ডিয়ার পরা বাংলাদেশর ফালে গই আছে।'

একজন স্থানীয় মানুষ ভাঙা ভাঙা অসমিয়ায় বললেন, 'এই টো সার এক্সপোর্ট হৈ আছে। কাস্টমসের থ্রু দি এইসব বস্তু যাইতেছে।'

—কত্, কাস্টমসর মানু কত? মাতকচোন।

সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমসের এক কর্মচারীকে ডেকে আনা হল।

ছোটখাটো ভদ্রলোক মন্ত্রী ও বিধায়কদের নমস্কার দিয়ে বললেন, 'আমাকে ডেকেছেন স্যার?'

মিনিস্টার একটু হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আচ্ছা, ওই যে নৌকোয় জিনিসগুলো যাচ্ছে ওইগুলো কী জিনিস?'

—ওইগুলো স্যার আদার বস্তা। আদ' এক্সপোর্ট হচ্ছে এখান থেকে।

মোটাসোটা দামী প্যান্টশার্ট পরা একজন বিধায়ক বললেন, 'এই বিলাক লিগ্যালি হৈ আছে নে?'

—হ্যাঁ স্যার। লিগ্যাল কাস্টমস্ ডিউটি দিয়েই যাচ্ছে।

মন্ত্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আর কী কী জিনিস যায় এই বর্ডার দিয়ে?'

—এখন শুধু আদাই যাচ্ছে। আর মাঝেমধ্যে যায় সাতকড়া। মানে লেবুজাতীয় এক ধরণের ফল।

—আচ্ছা বেশ। আর আসে কী?

—মাঝেমধ্যে মশারির নেট আসে বাংলাদেশ থেকে। এ ছাড়া এই বর্ডার দিয়ে কিছু আসে না।

সৌম্য ভিড়ের মধ্যে কৌতূহলবশত সেঁধিয়ে গিয়েছিল। তার সামনে দাঁড়ানো একজন

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইলিশ মাছ?'

কাস্টমস্-এর অফিসার উত্তর দেবার আগে সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন বললেন, 'ইলিশ মাছ এই বর্ডার দিয়ে আসে না স্যার। সূতারকান্দির ল্যাণ্ড বর্ডার দিয়ে আসে।'

মন্ত্রী জানতে চান, 'আর কী আসে সূতারকান্দি দিয়ে?'

—সিমেন্টও আসে কখনও কখনও। তা ছাড়া আসে ফ্রুট জুস, সিনথেটিক জুস। আর ইণ্ডিয়া থেকে যায় কমলা। এখন অবশ্য কমলা কম যাচ্ছে।'

সীমান্তের এই অংশে কাঁটাতারের বেড়া না থাকাটা এই দলের সদস্যদের খুব উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। একজন বিধায়ক জিজ্ঞেস করতে একজন অফিসার বললেন, 'অ্যাকচুয়ালি করিমগঞ্জের মিউনিসপাল এরিয়াটোত বার্বেড ওয়্যার ফেন্সিং দিবলৈ গলে রেসিডেন্সিয়ার এরিয়া, বজার, সরকারি অফিস, এই বিলাক কাঁইটিয়া তারর ভিতরত পরি যাব।'

—এই বিলাক এরিয়া বাদ দি নৈর পারে পারে ফেন্সিং দিয়া না যায় নে কি?

—সেইটো স্যার বাংলাদেশে আপত্তি করে।

—আরে, বাংলাদেশি যাতে নো সোমায় তার বাবে আমার দেশর মাটিত আমি ফেন্সিং দিম, তাক বাংলাদেশে কিয় আপত্তি করিব?

—নহয় স্যার। এই টোত ইন্টারন্যাশনাল ল-র কথা আছে। ইন্টারন্যাশনাল নর্মস মতে কোনও দেশে তার বর্ডারের জিরো পয়েন্টের পরা ওয়ান হান্ড্রেজ অ্যাণ্ড ফিফটি ইয়ার্ডস এরিয়ার ভিতরত কুনো ধরনের কনস্ট্রাকশন করিব নোয়ারে।

নজিরের পকেটে মোবাইল বেজে উঠল। ওর পকেটে দুটো মোবাইল। এই মোবাইলে বাংলাদেশের সিম। তাই বর্ডারেও চট করে লাইন পাওয়া যায়। নজির একটু সরে গিয়ে দু-তিন কথা বলার পর সৌম্যকে ইশারা দিয়ে বলল, 'চল, হিদিকে দেরি অই যার। তারা আমরার অপেক্ষা কররা।'

সৌম্যর সম্বিত ফিরল। সে আসলে এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল আকাশের কয়েকটা কাকের দিকে। কাকগুলো উড়ে উড়ে একবার নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছিল। আবার কুশিয়ারা পেরিয়ে তারা ভারতে ফিরে আসছিল। কোনও বি.এস.এফ বি.ডি.আর কাঁটাতারের বেড়া তাদের আটকাতে পারছিল না। আহা যদি সৌম্য ওই কাকদের মতো হতে পারত।

এবারও নৌকোর মাঝি নরেশ। জকিগঞ্জের ঘাটে নৌকো লাগানোর পর চারজনের মধ্যে সবচেয়ে শেষে নামছিল সৌম্য। বাংলাদেশের কাদামাখা জমিতে তার পা ছোঁয়াতে ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল এই ক'দিন বেশ তুলনামূলকভাবে মুক্ত ও ভীতিশূন্য পরিবেশে ছিলাম, আবার যেন এক বৃহৎ কারাগারে প্রবিষ্ট হতে হচ্ছে।

নজির তার আপা ও ভাইসাবকে নিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ খেয়াল হল

সৌম্য তাদের সঙ্গে নেই। পেছন ফিরে দেখে সৌম্য খুব বিমর্ষ মুখ করে স্যুটকেস ও ব্যাগ হাতে নৌকো থেকে নামছে। নজির নদীর পার দিয়ে একটু নেমে জিজ্ঞেস করে, 'সৌম্য, তোর কিতা অইল রে?'

সৌম্য নিচুস্বরে জবাব দেয়, 'কিচ্ছু নায়। তোরা গিয়া গাড়ি-উরি পাছ্ নি দ্যাখ। আমি আইয়ার।'

নজির নড়ে না। সৌম্যর জন্য অপেক্ষা করে। সৌম্য কাছে আসাতে নজির ওকে আস্তে আস্তে বলে, 'তুই কেনে ইণ্ডিয়াত গেছ্লে আমি জানি। হপারো পার্মানেন্টলি থাকার ব্যবস্থা করার লাগি। নানি?'

সৌম্য গলায় জোর এনে বলে, 'ধুর ব্যাটা। তোর যত আজগুবি মাত্। আর ইণ্ডিয়াত থাকার সুবিধা করা অত সহজ নি। আজকে তো নিজের চউখে দেখ্লে কিজাত কড়াকড়ি আর নজরদারি চলের।'

নজির এবার সৌম্যর হাত ধরে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'তুমরা বেটাইন দৌড়িয়া ইণ্ডিয়াত যাও কিতার লাগি? একসময় তো ইণ্ডিয়াত আমরারউ রাজত্ব আছিল। আরো পন্‌রো বছর অপেক্ষা কর্, দেখবে ভাঙা ইণ্ডিয়া জোড়া লাগছে, আর রুল কররাম আমরাউ। তখন তুমরার কাছে বাংলাদেশো থাকা যেকথা, ইণ্ডিয়াত থাকাও একউ কথা অইব।—কিতা, কথাখান্ পছন্দ্ অইল না?'

সৌম্য নজিরের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল কথাগুলো সে সিরিয়াসলি বলছে না ইয়ার্কি মারছে। কিন্তু নজির তখন প্রবল হাওয়ার মধ্যে সুদৃশ্য লাইটার জ্বালিয়ে চোখমুখ কুঁচকে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত, বোঝে কার সাধ্য!

রণবীর পুরকায়স্থ

আসমান জমিন কথা

'তোমার জন্য সবুজ মতো একটা সকাল রাখতে চাই'

মনের তারে বাজে এক মোহময়ী সুরের জাদু। আকাশে কে যেন উল্টো করে উঠিয়ে দিয়েছে গানের রং।

সপ্তাশ্বর হাতে গতিব হাতল, কখনও বাড়ায় কখনও কমায়। চাতলার বুকে ছুটতে ছুটতে চোখ বন্ধ করে, চোখ খোলে। খোলা চোখে অবাক হয়ে তাকায় হাওর ও আকাশের পানে। শ্রাবণ তার ভরাগাগরি উপুড় করে দিয়েছে চরাচরে, জলরঙের এক অপার্থিব জ্যোৎস্নার ওমে স্নিগ্ধ থেকে স্নিগ্ধতর হচ্ছে সকাল। মাটি আর আকাশ যেন তাদের প্রাচীন সখ্যে মিলিত হচ্ছে। একজন নামছে, একজন উঠছে রামধনুর সিঁড়ি বেয়ে, সিঁড়ি নেমে। রং মিলান্তির এই অপরূপ খেলা, মন মিলান্তির এই প্রভাতী খেলায় মাতে সপ্তাশ্ব। সপ্তাশ্ব তখন মিঠাপানির অবাক জলের কাছে তৃষ্ণার্ত। কিন্তু এই সময়ে, এই প্রভাতে জল ভরার মা-বোন-বউ-বিটিরা কেউ নেই। এত ভোরে গ্রামের সকালও শুরু হয় না।

তবে সপ্তাশ্বর এখন তৃষ্ণা অন্য বারিধারায়। পুরনো সময়কে ফিরিয়ে আনার ঝমঝমাঝম। আয়, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে। লুপ্ত সময়ে ফিরে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। সময়হারা বৃষ্টিধারাকে স্বাগত জানাতে আকাশপানে তাকায়। পলক খোলে, পলক পড়ে। এই পলক ফেলার সময়টা যে সৃষ্টির কত বড় অপচয় ভাবতে ভাবতে চক্ষু মুদে সপ্তাশ্ব। একঘেয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখার সুন্দরের রহস্য বিবর্ণ না হওয়ার জন্যই পলক ফেলার আয়োজন। তা বলে চোখ বন্ধ সময়ের দামও তো কম নয় মানুষ জীবনে। সৃষ্টিওয়ালার এই খেয়ালি খেলার মাশুল তো ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে অতিরিক্ত সময় হিসেবে। নষ্ট সময়ের সাময়িক ভর্তুকি।

সোনারোদের ফিরিওয়ালার আহ্নিক শুরু হবে এবার। চোখ খুলে তাকায় আবার সপ্তাশ্ব। এত সুন্দর তার নিজস্ব বিশ্ব। দরগাকোণার টিলায় উঠতে গিয়ে ভুলে যায় গতি বাড়িয়ে দিতে। মাটি আর আকাশের মিল দেখে ভাবে কী হবে এই দুরন্তপনায়। সুন্দরকে ধরতে হলে গতির এই কৃত্রিমতায় লাগাম দিতে হয়। দৃশ্যমান সুন্দরকে কুর্নিশ জানিয়ে সপ্তাশ্ব তার মন একতারায় সুর তোলে।

'মন আঁখি হতে পয়দা আসমান জমিন'

কতদিন পর ভোর হয় আবার। সপ্তাশ্ব জানে শাখীর ভোর প্রতিদিন হয় না। সপ্তাশ্ব শাখীর সকাল। শাখী বলে তাদের বাহান্ন দিনে বছর। সপ্তাশ্বও বলে তারা বর্ণমালায় নাম লিখে রাখবে। বলে, অয়ে অন্তহীন, আ-এ আবার এসো। হ্রস্ব-ই-তে ইতি টেনে স্বরবর্ণের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল নামাবলি। দরগাকোণার বাঁক ঘুরতেই ওরা জেনে যায় সপ্তাশ্ব যানের আগমনবার্তা। সপ্তাশ্ব বাইক থেকে নামার আগেই দুখু বাঁধিয়ে দেয় হুল্লোড়. শৈশবগন্ধে মাতোয়ারা হয় প্রভাত।

ওরা মানে, দরগাকোণার টিলাপাহাড়ের দুই বসতকার। দুখু আর সুখ ডাক নামের দুই ভাইবোন। উচ্চতায় ওরা একটু ব্যতিক্রমী বটে। চা-শ্রমিক পরিবারের গড় উচ্চতা থেকে একটু দীর্ঘ। কালোরঙের দীর্ঘকায় মানুষটিকে সপ্তাশ্বর সুপুরুষ লাগে ভোরবেলা। লাল হলুদের কোঠা কোঠা গামছায় নগ্নগাত্র দুখুকে জড়িয়ে ধরতে সপ্তাশ্বরও সুখ। বন্ধুর গায়ের ঘামের গন্ধেও ছেলেবেলা হুটোপুটি করে। শৈশবের বন্ধু অবিকল থাকলে সকাল খুব সুন্দর হয়। শহর থেকে ফেরা বন্ধু গ্রামের সহচরকে জড়িয়ে মুখ তোলে উপরে। আকাশের বিশালকে ধন্যবাদ জানায়।

দুখুর ভাল নাম দক্ষিণা। দক্ষিণারঞ্জন কুর্মি। নামকরণ করেছেন অশ্বিনী কবিরাজ। সপ্তাশ্বর ঠাকুর্দা। এদিকে ধোয়ারবন্দ, ওদিকে শিলকুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কবিরাজের রোগী আর শিষ্য পরিবার। চা-শ্রমিক আর গ্রামের গরিব মানুষের চিকিৎসায় দাতব্যই হয় বেশি। তাই গ্রাসাচ্ছাদনের বিকল্প ব্যবস্থায় ছিল পুরোহিতগিরি। পুজো হ'লেই পুরোহিতের দক্ষিণা নিশ্চিত। প্রতিবেশী বাড়ির সন্তান জন্মের পর আশীর্বাদ করতে গেছেন কবিরাজ খালি হাতে। পুত্রলাভে আনন্দিত লখিন্দর কুর্মি কিন্তু ভোলেনি ব্রাহ্মণের আশিস খালি হাতে নিতে নেই। দুখুর বাবা লখাইদাদা তার সামর্থ্য অনুসারে একটাকা চার আনা ব্রাহ্মণের পায়ে রেখে প্রণাম করে। অপ্রস্তুত কবিরাজ বলেন—

—কিতা বে, দক্ষিণা নি?

—অয় জেঠামাশয়।

—তর পুয়ার নাম কিতা রাখছছ্‌তে?

—অখনও রাখছি না আইজ্ঞা, আপনে দিলাইন নাম। আমি ত ভাবছিলাম দুখু, তার মারে বহুত দুখ দিছে আইজ্ঞা।

—বালা অউও। দুখু রাখি দে ডাক নাম। ইস্কুলো উস্কুলো পড়াইবে নানি। বালা নাম রাখি দে একটা।

—আপনে দিলাইন। তলব দিনে দিয়া আইমুনে আবার পাঁচসিকা।

—দুর বে, তর লগে কি দক্ষিণার সম্পর্ক। তর পুয়া অইছে, অউ আমার আনন্দ। তর জেঠিমায় দেখিছ কততা লইয়া আইবা। নতুন কাথা জামাজুমা বউত্তা, আর আমি এক বুকা বাবন দেখ খালি হাতো আইছি। নে একটা নামঅউ দিয়া যাই। তর পুয়ার নাম রাখিছ দক্ষিণা। দক্ষিণারঞ্জন কুর্মি।

সপ্তাশ্বর লখাই দাদা, দুখুর বাবা লখিন্দর কুর্মি, ছেলের নাম পেয়ে কী খুশি। দাদুকে বলে,

—অত সুন্দর নাম দিলায় জেঠা। অখন পুড়ি হইলে কিতা নাম দিবায়?

—দুখুর বইন সুখু রাখমু।

—ইতা ডাক নাম, বালা নাম? ইস্কুলর নাম?

—তর বাড়িত্ অত গাছগাছালি। পুড়ির নাম রাখিছ শাখী।

লখিন্দর কুর্মির অনুরোধে অশ্বিনী কবিরাজ দুটো নামই কাগজে লিখে দিয়েছিলেন।

কবিরাজের নাতি সপ্তাশ্ব আর লখিন্দরের ছেলে দুখু একই স্কুলে পড়ে। বড়জালেঙ্গা হাইস্কুল। কয়েক বছর পর শাখী কুর্মিও ভর্তি হয়। দুখু ফেল করে সুখুর সঙ্গে এক শ্রেণীতে নেমে আসায় লখাই পড়াশোনা ছাড়িয়ে দেয় ছেলের। সপ্তাশ্ব দেখেছে লখাইদাদার কষ্টের সংসার। চা-বাগান উঠে যাবে তাই লখাই দাদাকেও ছাড়িয়ে দেয় বাগান। রাস্তার পাশে চা-বিস্কুট আর বিড়ি সিগারেটের দোকান করে পিতাপুত্র। তা-ও সুখুব স্কুল ছাড়ায়নি, সপ্তাশ্ব কলেজে পড়তে শিলচর যাওয়ার পর একাই যাওয়া-আসা করেছে অরণ্যকন্যা শাখী কুর্মি। লখাইদা আর দুখুসুখুর মা-ও বেশিদিন বাঁচেনি। বাপ মরে যাওয়ার পর দুখু যোগ করে ঘুগনি রুটি সকালবেলা। রবিবার সকালে দুখুর ঘুগনির লোভও সপ্তাশ্বকে অরণ্যমুখী করে।

শ্রীমতী শাখী কুর্মি কিন্তু তরতরিয়ে জিসি কলেজ পর্যন্ত চলে যায়। শাখীকে কলেজে এক বছর পায় সপ্তাশ্ব। সে বছরই কিছু একটা হয়, সব গোলমাল। শ্রমিক কন্যার বিদ্যার্জন প্রয়াস অথবা বাল্যসখীর অভিভাবকত্বলাভে অভিভূত হয় অশ্বিনী কবিরাজের নাতি। দাদু নেই তাই বাগানের পাট উঠিয়ে শিলচর শহরের উপান্তে টিকরবস্তির বাসিন্দা হয়েছে সপ্তাশ্বর পরিবার। সপ্তাশ্ব বলে, পড়িয়ে দেবে সব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর অর্থনীতি পড়ানো যেমন তেমন ভাষা সাহিত্য পড়াতে গিয়েই ভাষাতীতের খোঁজ পায় সপ্তাশ্ব। পল্লীর বাসিন্দা সুখুকে শাখী নামে ডাকতে শুরু করে। গ্রামের পড়শি বাড়িতে গিয়ে দেখে আরও সুন্দর সেজেছে ফুলের গাছে, লতাপুষ্পে বাড়ির বাগান। বাঁশের বেড়ার গায়ে শরতের অতসী দেখে শাখীকে ডাকে নীলমণি।

রবীন্দ্রনাথে বিভোর সপ্তাশ্ব দরগাকোণার বাড়িতে এলেই কবিতায় সাজায় তার কৃষ্ণাসখীকে। ডাকে কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা। বর্ষাদিনে মনে মনে গুনগুন করে, কালো মেয়ের কালো হরিণীচোখ। এমন কবিতা শোনানোর সাহস করেনি, কিন্তু রহস্যে ঢেকে বলেছে, মৃগনয়না।

কালো সখা দুখুরও বিয়ে হয়ে যায় একদিন। দুখু ভালোবেসে বিয়ে করে অন্যলোকের বউ মঙ্গলাকে। হাতিছড়া চা-বাগান থেকে সোজা টিঁকরবস্তি সপ্তাশ্বর কাছে। দরগাকোণায় ওদের পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে চায় নতুন বউকে, দুখুর ভয় ওর বউ-এর পূর্বতন স্বামীকে। সপ্তাশ্বর কোনো আপত্তি নেই, সরকারী খাস জমি দখলের বাড়িতে তো কোনোদিন ফিরবে না আর তবে শুনেছে, দখল বহাল থাকলে একটা আর্থিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা আছে। দুখুসুখুই দেখভাল করে। সপ্তাশ্ব সানন্দ সম্মতি দেয়। ভাগিয়ে বিয়ে করা দুখুর বউকে পছন্দ হয় না সপ্তাশ্বর, সুখুর পছন্দ না হলেও বলে, ওদের সমাজে এমন চলে।

দুখুর আশঙ্কা অমূলক করে তার বউ-এর পূর্বতন শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনও আঘাতই আসে না। দুখুর সাহস বাড়ে বউকে বেনের পুটুলি সাজিয়ে দোকানে বসায়। ঘুগনি বিড়ির বিক্রি বাড়ে। যুবা শ্রমিক খদ্দেরও বাড়ে। একদিন বউ মঙ্গলা দুখুকেও ছেড়ে যায়।

বোকাসোকা সহপাঠীর বিবাহবিভ্রাটের সমাচারে মন খারাপ হয় সপ্তাশ্বর। এ ছাড়া তো তার করারও কিছু নেই। কিন্তু শাখী এসে রাগারাগি করায় মধ্যবিত্তের সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়। শাখী ভাইয়ের জন্য কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—তুমি কী রকম বন্ধু গো লালাজি, দেখবায় নে কুন্দিন বাদশাবাবার গাছো ঝুলি যাইবো তুমার বন্ধু। তুমি বুঝাইলে বুঝব, যাও না কেনে?

দরগাকোণায় দুর্গাকে কোনও দিন কাঁদতে দেখেনি সপ্তাশ্ব। তিন বছরের ছোট বাল্যসখীর চোখের জল দেখে আর কোনও অজুহাত দেয়নি। মমতার রুদ্ধদ্বারে অভিমান কড়া নাড়লে মানুষ সুন্দর হয়। অনেকদিনের চাপা পড়া এক রহস্যের অর্গল খুলে যায়। ছেলেবেলা থেকেই শাখীর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সপ্তাশ্ব আলাদা করে কিছু ভাবেনি তখন, দুখু আর তার দু'জনেরই প্রাণের পুত্তলি ছিল সুখু নামের সুখপাখি। বুঝেও বোঝেনি সপ্তাশ্ব। সবার জন্য একরকম কিন্তু সপ্তাশ্বর জন্য সবকিছু আলাদা রেখেছে শাখী। আলাদা গুরুত্ব। ব্রাহ্মণ বাড়িতে মাংস রান্না হয় না। সপ্তাশ্বকে লুকিয়ে খাওয়ায় শাখী। মুরগির মাংস কৌটোয় পুরে তাকে ইশারায় ডাকে। ডিহবাবার থানের বীচে, ওই বীচে নেমে যায়, যেখানে বয়ে যায় ছোট ঝরণা। ঝরণার নির্জন থেকে ওদের কেউ খুঁজে পায় না। সপ্তাশ্ব জানে, ওই ঝরণার নাম লালাজি। লালাজি কখনও কোনো নদী-ঝরণার নাম হতে পারে? কেন ডিহবাবার নামেরই বা কী অর্থ? পাতাশাহর মোকাম, কী তার অর্থ? হবে হয়তো কিছু একটা। ছোট্ট শাখীর একা হওয়ার দরকার হলে ওকে ডাকে, যাবে লালাজি? আনন্দ আর উত্তেজনায় শাখী শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে। শাখীর ডাক শুনে সপ্তাশ্ব উঠে যেত পাহাড়ে, নেমে যেত ঝরণায়। পরে তো জেনেছে শাখী সপ্তাশ্বকেই লালাজি ডাকে। লখাইদা, সুখ-দুখুর বাবা ওকে আদর করে ডাকত লালা, ডাকত নন্দলাল।

ছোটবেলায় দু'অক্ষরী এক নামকে কেমন আত্মস্থ করে নেয় শাখী এক মিঠে অক্ষর জুড়ে।

শাখী যেদিন কেঁদেছিল, সেদিন সপ্তাশ্বর এক অনির্বচনীয় আনন্দের দিন। সেদিন প্রথম কেউ অভিমানের প্রতিদান চেয়ে কাঁদল তার কাছে। অধিকারের স্বীকৃতি চাইল। সপ্তাশ্বর মনে হয়েছিল কি যেন এক পাওয়া জিনিস হারিয়ে ফেলেছে। ঝরণাতলার নির্জনতা কি এখনও আছে অবিকল? তিনজনের এক শৈশববাহিনীর সেনাপতির পদ যেন ফিরে পায় আবার। লুপ্ত সময়ের হাসিটা ফিরিয়ে এনে সপ্তাশ্ব প্রমাণ করে বাহিনীপ্রধানের পদটা তার নিতান্তই আলঙ্কারিক। তিন বছরের কনিষ্ঠা শাখীই নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের আনন্দময় ছেলেবেলা। সপ্তাশ্বের প্রতি শাখীর পক্ষপাতও ছিল বিদিত। ওরা তিনজনেই খেলার সাথী ছিল, বন্ধু ছিল। কিন্তু শাখী কোনওদিন নির্জনের লালাজিতে নিয়ে যায়নি তার দাদা দক্ষিণাকে। বলে, দাদাটা একটা রাক্ষস, সব খেয়ে নেবে। দুখুর জন্য দুঃখ হয় সপ্তাশ্বর। একটু পেটুকও বটে, কিন্তু বোনকে, সপ্তাশ্বকে তার সব প্রিয় জিনিসের ভাগ দেয়। সপ্তাশ্ব প্রতিবাদের ফুরসত পায় না, ঝরণাতলায় নিয়ে গিয়ে তার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

ভাইয়ের দুঃখে কাতর হয়ে কাঁদতে আসাও ছুটির দিন রবিবারে। অপ্রস্তুত সপ্তাশ্ব সব শুনে রমাকে বলে,

—জান নি, দুখুর বউ ভাগি গেছে আবার।

পূর্বাপর না জেনে আবার বলায় অবাক হয় রমা। বলে.

—আবার মানে কিতা?

—ও, তুমারে কওয়া অইছে না ...'

সপ্তাশ্ব-রমার বিয়ে নিয়েও দু'রকম মতবাদ প্রচলিত বান্ধবসমাজে, এমনকি আত্মীয়স্বজনও ভাবে ভিন্ন। কেউ জানে সম্বন্ধ করে বিয়ে, কেউ বলে প্রেম। সপ্তাশ্ব দু'টোই মানে। ছোটমামা কালিকা প্রসাদ যখন হাইলাকান্দি লক্ষ্মীরবাজারের মেয়ে রমা মিশ্রর পোস্টকার্ড সাইজের ছবি সপ্তাশ্বর কাছে পৌঁছে দেন উৎসাহভরে, সপ্তাশ্বর বাবাকেও বলেন এমন সর্বগুণসম্পন্না পাত্রী পাওয়া যাবে না। তাহলে আর দেরি কেন? শুভস্য শীঘ্রম্। লেগে যাক বিয়ে। ছোটমামা বললেন, তবে। তবে কী? পাত্রীর গাত্রবর্ণ ফর্সা নয়, শ্যামও নয়, একটু কৃষ্ণবর্ণই বলা যায়। তাহলে কি বাতিল? গৌরবর্ণীয় কুলনী ব্রাহ্মণ পরিবারে কালো বউ? নৈব নৈব চ। আলাপ বাতিল ঘোষিত হয়। ওদিকে, চোরাপথে পয়লাপুল কলেজের শিক্ষক সপ্তাশ্ব সিকিদারের হাতে এসে পৌঁছয় এক হাতচিঠি। আতোভা, মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি বলার মতো দুরন্ত না হলেও একটা রোমান্টিক শুভারম্ভ হয়। সপ্তাশ্বর ছোটমামীও একটা হাতেগরম উত্তর নিয়ে ফেরেন হাইলাকান্দি। তারপর দৈনিক প্রেমপত্র সিরিজ চলতেই থাকে যতদিন বর্ণ নিয়ে দুই পরিবারের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত না হয়। বলা হয়, পাত্রী কৃষ্ণ নয় মোটেই, শ্যামবর্ণ। বল ভাল, উজ্জ্বল শ্যাম। এরই মধ্যে রং মিলান্তির বিপত্তির বিষয়ে কিছু না জেনে সপ্তাশ্ব ও রমার

মিশ্র দর্শনও হয়ে যায় দু'বার। একবার চিবিটাবিচিয়ায়, এবারও ছোটমামীর সৌজন্যে। পি এন বি-র শাখা ম্যানেজার ছোটমামার শ্যালিকা কন্যা বলে কথা। এরপর এক মাসের মধ্যে হাইলাকান্দির টাউনহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবি সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে শোনায় রমা মিশ্র আর চিটাবিচিয়া সিরিজ নামের পাঁচটি প্রেমের কবিতা পাঠ করে সপ্তাশ্ব সিকিদার।

এত করেও তীরে এসে তরী টালমাটাল হয়। কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম হলেও পাত্রীপক্ষ এবার অমত করে। ধারণার অমিল হয়। ওরা ভেবেছিলেন পাত্র হাইলাকান্দি নিবাসী, এক মেয়েকে ওরা বাড়ির বাইরে বিয়ে দেবেন না। আসলে লক্ষ্মীরবাজার মিশ্রবাড়ির গানেরই স্কুল খুব বিখ্যাত, আর সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী প্রধান যে শ্রীমতী রমা মিশ্র। এত ছাত্রছাত্রী ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। রবিবারের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই পঞ্চাশের বেশি।

হতাশ পাত্রপক্ষ বলে—বরগাইট।

পাত্রের ছোটমামা ছোটমামীকে বলে— ইতা অজুহাত, বলাইর কলেজ পযলাপুলো গিয়া দেখিয়া আইছইন তোমার জামাইবাবুয়ে।

সপ্তাশ্বর ডাকনাম বলাই। সপ্তাশ্বর অনিচ্ছায় অপ্রচলিত।

ছোটমামী বলে—কিচ্ছু মাতিও না অখন। দেখ না কিতা অয়। ধান খাইছ মুরগি যাইবায় কই?

ছোটমামীর কথাই ঠিক হয়। সুমো শর্তে বিয়ের দিন ধার্য হয়। শনিবার সুমো চেপে ধলেশ্বর হয়ে চলে যাবে একা রমা, রবিবার সারা সকাল গাইবে গান, বিকেলে বাইকে চেপে ফিরবে দোকা সপ্তাশ্বর রমা। টিকরবস্তি লক্ষ্মীরবাজারের ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় পাটিপত্রে।

সপ্তাশ্বর ভাল বউ রমা। হাইলাকান্দির মত ছোট শহরের বাসিন্দা হয়েও বেশ কেতাদুরস্ত, সুন্দরীও বটে। সপ্তাশ্ব কিছু মামুলি ভুল করে শুরুতে। বউয়ের কাছে কিছু লুকোয়নি, গড়গড় বলে গেছে। কাটছাঁট না করে জীবনেতিহাস বর্ণনা করেছে গড়গড়িয়ে। রমাও সব লিখে রেখেছে মর্মাক্ষরে। মায়ের কথা না শুনলে যা হয়। মা বলেছিল, কইছ না হক্কল কথা। সততার পরাকাষ্ঠা যে! ছোটকাকু ইটানগরে চাকরি করে বললেই হত, কী চাকরি, কেমন চাকরি, কত বেতন—সব বলতেই ধরে ফেলে। মাকে বলে সপ্তাশ্ব, চাকরি যেতাউ করউক ছোটকাকু, মানুষ ত বালা। সপ্তাশ্ব ঠাকুমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থেলো হুঁকো টানতে দেখেছে, তা-ও বলে দেয়। বলে দেয় দাদুর দুই বিয়ের কথা, বড় ঠাকুমার দিকেও কেউ নেই, বললে কী হয় কে জানে! আসলে কিছু হয়নি, রমা খুব ভালবেসেছে সপ্তাশ্বকে। দাদুর সুনাম শুনে গর্বিত হয়েছে, অশ্বিনী কবিরাজের নাতবউয়ের যে আলাদা সম্মান। মায়ের সঙ্গে সামান্য খটাখটি বাদ দিলে রমা বউ হিসেবে অনবদ্য।

রমা একটু বেশি শ্রেণীসচেতন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা মানে রমার রঙের ওপর কটাক্ষ করা। রমার বর্ণ গৌর, অতি গৌর, টুনকি দিলে রক্ত বেরোয়, এমন। রমার মোলায়েম ত্বক।

পরিবারে স্নেহপ্রবণ এবং কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে সুনাম আছে। কিন্তু সপ্তাশ্বর বন্ধুমহল নিয়ে সে একটু উন্নাসিক, কবি-লেখক-সহচরেরা সবাই ফড়িংয়ের মত, আরশোলার মত, ক্ষেত্রবিশেষে চামচিকের মতো। দুখুকে ওর মোষের মত লাগে। এবং অবাক কাণ্ড, সুখু মানে শাখীকে রমার খুব পছন্দ। বলে,

—কুলিবাড়িত অত সুন্দর স্বভাবর পুড়ি দেখছিনা।

হলি চাইল্ডের মতো নামকরা স্কুলের শিক্ষিকা বলে, শাখীর সঙ্গে ইংরেজিতেও কথা বলে। শাখী বলে,

—না গ বউদি, আমি ইংরাজি ভালা পারি না। মাতৃভাষা হিন্দি অইলেও পড়াই বাংলা। সপ্তাশ্ব বলে,

—শাখীয়ে গানও গায় বালা। রবীন্দ্রজয়ন্তীত প্রাইজ পাইত পরতিবার।

তাই দেখা হলেই গানের মাস্টারনি রমা শাখীকে গাইতে বলে। শাখীরও জ্ঞানের নাড়ি টনটনে, গায় না। বলে,

—না গো। হিন্দি গান গাই, সব সিনেমার গান। মেরা তন ডোলে, মন ডোলে অতা। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছি না।

সুনাইমুনে তুমারে, আইও দরগাকোণাত, আমার গাউত আমিঅউ লতা মঙ্গেশকর। তুমি শুনিয়া হাসবায় খালি।

শাখীরও আছে অভিমান। শাখী জানে, শহুরে পরিবেশে রমা সিকিদারের কাছে সে কিছু না, কিন্তু তার গ্রামে সুখু কুর্মির মতো সুন্দরী হতে পারবে না তার লালাজির বউ। পড়াশোনা জানা বউ রমা জানে বাংলা সাহিত্যের অমূল রতন কথা, বন্যেরা বনে সুন্দর ...। তাই রমা কোনওদিন ধোয়ারবন্দ দিয়ে যায় না হাইলাকান্দি। বলে রাস্তা খারাপ। ধলেশ্বরে কোন ভালা রাস্তা? দাঁতে দাঁত চেপে তাই শাখী অহঙ্কারী বন্ধুপত্নীকে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বার্তা পাঠায় এরকম—'একবার আয় না বে বউ শ্বশুরবাড়ি দরগাকোণাত, আদরযত্ন কারে কয় দেখাই দিবনে শাখী কুর্মিয়ে। জানি বেটি তুমি আইতায় নায়, আমারে তুমি ডরাও।'

রমার সঙ্গে শাখীর বা বলা ভাল, শাখীর সঙ্গেও রমার একটা অপ্রকাশ্য লড়াই আছে। আবার প্রকাশ্যে দু'জনেরই কেউই কারও অপছন্দের নয়। তাই দুখুর বউ পালানোর গল্প, যা সপ্তাশ্ব তার বউকে জানায়নি, শাখী জানিয়ে দেয় সংক্ষেপে। বন্ধুর সঙ্কটকালে পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ করে সপ্তাশ্ব। বলে,

—তুমি যাইবায় নি?

—আমি গিয়া কিতা করতাম, তুমি অউ যাও।

কোনও ফল হবে না জানে সপ্তাশ্ব। আসলে সে-ও চায়নি রমা যাক সঙ্গে। শুধু শাখীর সঙ্গে যাওয়া নিয়ে সম্ভাব্য অশান্তির হাত থেকে বাঁচতে আড়াইজোড়া সংলাপের নাট্যাংশ।

চা-ঘুগনির দোকানদার দক্ষিণাকে দেখতে গিয়ে সপ্তাশ্ব তার পরিত্যক্ত ভিটের ঘ্রাণ নেয় প্রাণভরে। মা-বাবা-দাদুর গায়ের ঘ্রাণ অনুভব করে প্রাণে। তার লুকিয়ে থাকা শৈশব উঁকি দেয় এখানে সেখানে। সবখানেই সে রাজার রাজা। কোলাহলেও সে রাজা, নির্জনেও রাজা। আর শহরে, টিকরবস্তির পাকা বাড়িতে কোথাও নেই নির্জন! বাজার, চাকরি আর দায়দায়িত্বের ঘেরাটোপে সে এক মুক্তবন্দি। গৌরবে বন্দিত্ব ঘুচিয়ে বলা যায়, এক ফাইলঘেরা আমলা। সই করা কাজ নিয়ম মেনে। চলো নিয়ম মতে, নিয়ম মেনে চলাই কাজ। ছেলেবেলার যেমন ইচ্ছে জীবনটা ওকে ইশারায় ডাকে 'আইওও'। নির্জনের ঝরণাতলা, বিশাল আকাশ আর তার ছানাপোনা গাছগাছালি ডাকে 'আও'। চেনা মানুষের হাসিমুখ, যারা শতচ্ছিন্ন দুঃখ-যাতনার মধ্যে হাসি ভোলে না, আত্মীয়-আপ্যায়ন ভোলে না। সবাই বলে, 'আও না কেনে কতদিন পরে আইলায়।' পুরোহিত ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচয় রমার পছন্দ না হলেও দরগাকোণার মানুষের ছোট কবিরাজ। ডাকটা মন্দ লাগে না। মন্দ লাগে না নতুন করে দেখা শৈশব সঙ্গিনীকে। দুখুর মনোব্যথায় কাতর হয়ে ওর জন্য কিছু একটা করতে কাতর হয় সপ্তাশ্ব। তাদের এই অরণ্য মুলুকের তিন অধীশ্বর ডিহবাবা, বাদশাবাবা আর পাতাশাকে সাক্ষী রেখে সপ্তাশ্ব ঘোরায় তার জাদুছড়ি। বন্ধু দক্ষিণার সব কষ্ট, সব ব্যথা সে কথা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে। কথার জাদু দিয়ে ভোলাবে দুখুর দুঃখ। শহরে গিয়ে সপ্তাশ্ব শিখেছে কথার চাতুরালি। কথার আছে শতেক বাণী, যদি কথা কইতে জানি। এ বাণী শহরে যেমন সত্য গ্রামেও তেমন। শহরে প্রয়োগে হয়ত নাগরালি 'আমি' বাঁচাও প্রকল্প প্রকট হয় আর গ্রামের 'আমি'তে থাকে বহুত্বের প্রতিনিধিত্ব। সপ্তাশ্বর ভয় তার পরিচিতি নিয়ে, সে যে এক মানুষ, দুই কুশীলব। তাই সে ভয়ে ভয়ে দুখুর গায়ে হাত দেয়, ঘামের আঠায় জড়িয়ে ফিরে যায় প্রাক্তন সময়ে। দু'এক ফোঁটা চোখের জলও ঝরে, মোছে না, নোনতা জলের ধারায় কণ্ঠস্বর ভিজে। সপ্তাশ্ব ভেবে পায় না মনে মনে হেসে উঠবে, না হাউ হাউ করে কাঁদবে। তার সামনে মনভারি, মুখভারি দুখু আর দুখুর দুঃখে কাতর তার বোন বসে আছে সপ্তাশ্ব ছোট কবিরাজের বাণীর আশায়। কথা সাজানোর বৃথা চেষ্টায় না গিয়ে মুখে যা আসে তাই বলে বন্ধু দুখুকে। বলে, সহজ সান্ত্বনার কথা। বলে, ভুলে যাওয়ার কথা। বলে, তাদের পুরনো দিন ফিরিয়ে আনার কথা। বলে,

—যা, কথা দিলাম, আইমু রবিবারে রবিবারে। সকালে তোর দুকানর বনি করমু বিনা পয়সাত। ঘুগনি বানাইবে মন দিয়া।

ব্যস, জাদুকাঠির সোনাঝুরি ঝরে ঝরঝরিয়ে। দুখু ভুলে যায় নিজের দুঃখ। ছোটবোনের সঙ্গে নিয়মহীন খুনসুটিতে মাতে। বলে,

—ইগুরে কছ না, তাই ত সকালে উঠিআগে পিছরাত লামি যায়। কামর কাম কিছু নায়, খালি ফুলগাছ আনে আর লাগায়। ইগু পাগল উগল অই গেছে বে, ফুল ফুটলে গাছর লগে কথা কয়, গান গায়।

—কী গান? রবীন্দ্রসঙ্গীত নি, পুষ্পবনে পুষ্প নাহি ...

—না না। হিন্দি গান। তিতলি উড়ি ... আর নাচে। তারপরে গেল গি ইস্কুলো। একটু আমারে রেডি করি দিয়া যাইত পারে না নি, সারাদিন বেচলাম নে।

সুখু হাসে, মেঘ কেটে যাওয়ার আনন্দে রাজি হয়ে যায় শর্তে, বলে,

—ঠিক আছে, আমি বানাই দিমুনে ঘুগনি, ভুলি যা অখন তর মঙ্গলা না ছঙ্গলারে। তাই একবেটার ঘর ভাঙ্গি আইছে, তর ভাঙল, আবার ভাঙব। তাই কুনুদিন কেউর অইত পারত নায়। ভুল যা ভাইয়া। তহার খাতিন বহুত সুন্দর, বহুত আচ্ছা ভাবী আনব হাম।

দুখু আর দু'বার বেলতলায় যাবে না। সপ্তাশ্ব চেনে তার বন্ধুকে, খুব ভীতু, একবার দাগা খেয়েছে আর যাবে না ও-পথে। তাই সে সপ্তাশ্বর কথা, তার সহোদরার কথাও বুঝতে পারেনি কিছু। সুখু যে তার কথা রাখবে বলেছে এতেই খুশি সে। শৈশবের বন্ধুও যে কথা দিয়েছে আসবে, এতেই সে ভুলে যাবে সব দুঃখ। ভুলে যাবে মঙ্গলাকে, নারীর প্রেম অধরাই থাকবে তার জীবনে। চা-বিস্কুট-ঘুগনি বেচে, ছোটবোনের সাহায্যের কিংবা বিবাগী হয়ে সে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন।

শাখীর মুখে তাই শুনে ত সপ্তাশ্ব অবাক। বড়ভাইকে দুখু, এই দুখুয়া ছাড়া ডাকেনি। সে তো দুখুয়া থেকেও বড় এক বছরের, তাকেও ইশারা ছাড়া ডাকেনি, নিতান্তই ডাকতে হলে তার বাবার দেওয়া নামটাকে গড়েপিটে ডাকে লালাজি। তাই দুঃখ, অভিমান ও সমাধানের পর পরিবেশ হাল্কা করতে সপ্তাশ্ব শাখীর ওপর চড়াও হয় সরাসরি। বলে,

—আইজ কিতা অইল দরগাকোণার দুর্গামাতার, বড় ভাইরে দেখি ভাইয়া ডাকলে?

অপ্রস্তুত শাখী পিঠ থেকে আঁচল টেনে অকারণ আঙুলে জড়ায়। বলে,

—ডাকতাম না কেনে, ডাকি ত, আমরা কুনু অখন ছুটনি? তেও তোমারে ডাকতাম নায়।

—কেনে? আমি ছুট নি?

—না, তুমি অইলায় লালাজি।

—আইচ্ছা তে শুন, তর ত বিটি পাশ করাও আছে। ইতা রুজ রুজ শিলচর যাওয়া আওয়া, পারবে নি?

—পারতাম না কেনে, আমরার কিছু অয় না, ঠাকুরদায় আমারে কইতা 'অরণ্যপুষ্প' মনো নাইনি?

—আছে আছে, সব আছে। বড়জালেঙ্গা ইস্কুলর লাগি তুই চেষ্টা করলেউ পাইলাইবে।

—পাইমু ঠিক অউ, চেষ্টাও করছি। দুই লাখ টেকা দেওন লাগব ঘুষ। কে দিব অত টেকা?

সপ্তাশ্বর দু'লাখ টাকা নেই, তা নয়। শূন্য থেকে শুরু করেছে বলে জমিয়েছে টাকা। কলেজশিক্ষকের মাইনেও আজকাল কম নয়। দু'লাখ দেওয়াই যায় বাল্যসখীকে ধার। তবু

সপ্তাশ্ব চমকায়, বলে,

—দু-উ-ই-লা-আ-খ!

শাখী আর কথা বাড়ায়নি। শহরের হিসেবি মানুষ সপ্তাশ্ব মনস্থির করতে পারে না। শাখীকে দু'লাখ টাকা দিলে সে ফিরিয়ে দেবে নিশ্চিত। সপ্তাশ্ব ভাবে একবার রমার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এখন তো তাদের উত্তরপুরুষও এসে গেছে। টাকার মালিক এখন আর সে একা নয়। একটা পরিবারের কর্তা এখন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে। উচ্চশিক্ষায় এখন অনেক খরচা। রমার অনেক উচ্চাশা ছেলেকে নিয়ে। পঞ্চম তাদের সন্তান। রমার অনেক ভালোর মধ্যে গোঁজ দেওয়া থাকে কিছু কিছু অদ্ভুত জেদ। সপ্তাশ্ব ছেলের নাম অন্যরকম রাখতে চেয়েছে। রমা চায়নি। বলেছে,

—না, আর অশ্বডিম্ব নয়। ইবার সরগম'র পঞ্চম অইব। পঞ্চম সিকিদার।' হলোও তাই। সপ্তাশ্ব তবু মৃদু আপত্তি করে। বলে,

—সূর্যর ঘুড়ার তুমার আপত্তি থাকলে বাদ দেও। কিন্তু পঞ্চম বাঙালীর একজনঅউ অয়। বিকল্প নাম ভাতায় পার না নি?

রমা হেসে বলে,

—বুধবারে জন্ম যখন বুধেশ্বর রাখি দেও। অশ্বও হইল ঈশ্বরও অইল, আর তুমার চা-বাগানর মাপর বুধুয়াও অইল।

সপ্তাশ্ব রমার রাগ কেয়ার করেনি, আদরের ছেলেকে বুধুয়া বলেই ডাকে। তাই সপ্তাশ্বর বাপের মনটা উদার হতে পারে না। ভাবে টাকা ত তার নয়, বুধুয়ার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। এ দিকে শাখীর জন্যও মন পোড়ায়। সারা হপ্তার টানাপোড়েন শেযে সিদ্ধান্ত নেয়, দিয়েই দেবে টাকা।

রবিবারে যায়। চা-ঘুগনি খায়। তবু বলে না।

পরের রবিবারেও পারে না।

এর পরের রবিবারে আর শাখীর ঘরে ঠাঁই হয় না সপ্তাশ্বর।

শাখী পয়সা খরচ করে একটা কোঠাঘর বানিয়েছে তার জন্য, আলাদা। দোকানঘরে থাকে দুখু, দোকানের লাগোয়া মাটির ঘরে শন-বাঁশের ছাউনি। ঘর ছোট হোক, তবু কী সুন্দর সাজিয়েছে, একদিকে দেওয়ালের বদলে শুধু জানালা। খোলা জানালায় অকৃপণ প্রকৃতি। একটু নদী, একটু পাহাড়, একটু গাছগাছালি আর একটু শাখী মিলিয়ে এক অপার্থিব সুখাসুখের আবহ। সপ্তাশ্বর রবিবারের আনন্দ।

শাখী তার আনন্দ কেড়েও নেয়। দুখুর দোকানে বেঞ্চে বসে সপ্তাশ্ব নিজেকে অবহেলিত ভাবে। নিজের ঘরে এখন তার অতিথির সম্মানও নেই। বাড়িতে স্কুল খুলেছে শাখী, এত

ভোরেই খুলে যায় স্কুল? আর ছাত্রছাত্রী তো মাত্র দুটো।

পরের রবিবারেও ছাত্রছাত্রী দু'জন। দু'জনের গুরুগৃহ। দুখু বলে, ওরা ভাগ্নে-ভাগ্নী। নাম শোনেনি লখাইদাদার তৃতীয় সন্তানের? তবে? দুখু বলে, লেদু নামে ওদের এক বোনের কথা। মামার লেড়কি। দুই বাচ্চা রেখে মরে গেল। ওই দূরের দুর্গাটিলায় বাড়ি। বাচ্চা দু'টোর পড়ায় মন। সুখু বলে পড়াবে। বলে, পাগলের কাণ্ডকারখানা আর কী!

পরের রবিবার দুখু সপ্তাশ্বর কাছে বিচার দেয় বোনের বিরুদ্ধে। বলে,

—বউনায় দুই লাখ টেকা দিব কইল, তাই কয় নিত নায়। কইলাম তর কাছ থাকি নিত, কয় নিত নায়।

—কিতা কয়?

—কিতা আর কইত, কয় ঘুষ দিত নায়।

—ইগু কে বে বউনাই? অমরজিৎ নুনিয়া নানি? বাইচ্চা দুইটা তার অউ?

—অয়।

পরের রবিবারও সপ্তাশ্ব দুখুয়ার দোকানে বসে। চা-ঘুগনি খায়। একটা বিড়ি উল্টো করে মুখে নেয়, ফুঁ দেয় ফুঁকফুঁক, সোজা করে উনুনের লাকড়ি দিয়ে ধরায়। দুখুর কাঁধে হাত রাখে। বলে,

— অমরজিৎ ইগু ত বালা বে। চাকরিও বালা করে, পাব্লিক হেলথও। বেতন আর ঘুষর পয়সা দিয়া মস্তো বাড়িউড়ি বানাই লইছে। সুখুর লগে দিলাছ না বিয়া?

—সুখুয়ে কইছে নি তরে?

—না, কইছে না, কিন্তু বইনর বিয়া ত দিতে।

—অয় দিতাম। ইগুর নু বে দুই বাইচ্চা। তুই কছ্ না, তর কথা মানে।

পরের রবিবার সপ্তাশ্ব প্রস্তুত হয়ে যায়। সুখুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যায়। দুখুর সঙ্গে কথামত আজ পাঠশালা বন্ধ।

শাখীর ঘর। শাখী আজ সব ক'টা জানালা খুলে দিয়েছে। আঃ প্রকৃতি যে এত সুন্দর হতে পারে, চোখ মেলে দেখেনি সপ্তাশ্ব। দূরে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, তার কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পারে কানের কাছে। একটা রঙ্গন গাছে ঝুমে ধরেছে লাল ফুল। বাঁদিকের শনথলায় পাকা পাতার আন্দোলনে ঢেউ উঠছে নামছে। সপ্তাশ্বর মন হু-হু করে ওঠে, এ সব তো তার একান্ত, একান্ত তারই। শাখী তো তার জন্যই সাজিয়ে রেখেছে এই ঝরণা, ঐ দূরে ডিহবাবার থান, আরও দূরে সব পাইয়ে দেবার বাদশাবাবা। সব-সব-সব তার। শাখীর বিয়ে হয়ে গেলে তার শৈশবের শেষ অভিজ্ঞানও যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শাখী আছে বলে দরগাকোণা এতদিন দুর্গাকোণা হয়ে আছে তার কাছে। দরগাকোণা না দুর্গাকোণা? নাম নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মালিকানার মাঝখানে সপ্তাশ্ব শাখীকে ডাকে দরগাকোণার দুর্গা। কালো রঙের শ্রমিক কন্যার চোখে কী

এমন খুঁজে পায় সপ্তাশ্ব যে সব ছেড়েছুঁড়ে চলে আসে? আসলে গ্রামের মেয়ে গ্রামের ভেতর থাকলেই দশপ্রহরণধারিণী। তখন সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উঠে আসে অপরূপা—

'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী' তখন শাখী 'নন্দনবাসিনী উর্বশী'।

সেই শাখী যখন স্থানান্তরে যায়। যায় শিলচর কিংবা রমার পাশাপাশি, সপ্তাশ্বর শাখী নিস্প্রভ হয়ে যায়। তাই হয়তো বনের সুন্দরকে বনে দেখার জন্য বারবার ফিরে আসা। শেকড় উপড়ে ফেলা সপ্তাশ্ব কি পারবে আবার দরগাকোণার বনে বসত করতে? দূর থেকে তার বুধুয়াকে দেখিয়ে বলতে পারবে, 'অউ দেখ, দেখা যায় আমরার পাকঘরর টুল্লি'? রমাকে নিয়ে এসে থাকতে পারবে ধুলো-কাদায়, সাপখোপের বাদাড়ে? তখন রমাকেই বেমানান লাগবে বনতোষিণী শাখীর পাশে। গ্রাম নগরের এই দুই নারী যে বড় প্রিয় সপ্তাশ্বর।

তবু সে বিবেকবান পুরুষের মতো ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। চোখ বন্ধ করে প্রিয়কে ত্যাগ করে। জানায় তার সিদ্ধান্ত, সপ্তাশ্ব ও দুখুর মন্ত্রণা কথা। দুই সন্তানের জনক অমরজিৎ নুনিয়ার সঙ্গে শাখী কুর্মির বিবাহ-প্রস্তাব।

প্রস্তাব শুনে শাখী কাঁদে, যেমন কাঁদত ছেলেবেলায় সপ্তাশ্ব বকলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দূর শনখলায় হারিয়ে যাওয়া শাখীর কান্নামুখ মনে করে বড় কষ্ট হয় তার। ভাবে, ভুল হল। তাই এগিয়ে গিয়ে শাখীর মাথায় হাত রাখে। শাখী উঠে জানালার কাছে যায়। সপ্তাশ্ব ওর হাতে হাত রাখে। শাখী ওকে প্রাণপণ জোরে জড়িয়ে ধরে। বিহ্বল সপ্তাশ্ব ছাড়িয়ে নেয় বাঁধন। বলে,

—ব, আমরা কুনু তোর শত্রু নি? দুখুয়ে ত কইল তুই অমরজিৎরে পছন্দ করছ।

—কে কইছে, হে নি? হে ইতা বুঝলে নি তার বউ ভাগে?

—বাইচ্চা দুইটাও তর জানর টুকরা। তরে কে দেখব ক চাইন? অউগু তোর গার্জিয়ান দুখু, তারঅউ লেংটির ঠিক নাই। তুই তর চাকরি করবে, খাইবে, বাইচ্চা মানুস করবে। তর একটা সামাজিক পরিচয় অইব। সামাজিক পরিচয় দরকার।

শাখী কাঁদে। কান্না থামে না কিছুতেই। সে দিন দুপুর গড়িয়ে যায়। এ এক নতুন শাখী। অরণ্যকন্যার এমন রূপ কখনও দেখেনি সপ্তাশ্ব। থামে না কান্না, শাখী শুধু বলে দু'কথা,

—আমার লাগি কেউর ভাবন লাগত নায়।

—আমি তুমরার বুঝা অইগেছি. নানি?

সপ্তাশ্বর কর্তব্যবোধে অবহেলা হয়। হাইলাকান্দির রমাবাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়। রমাও অপেক্ষা না করে দিব্যেন্দুর সঙ্গে চলে যায় চারটের সময়। রমার দাদার বন্ধু বিজ্ঞান-শিক্ষক দিব্যেন্দু পড়ায় সপ্তাশ্বর কলেজে। নিজের গাড়ি নিয়ে যখন-তখন চলে আসে হাইলাকান্দি। আর সপ্তাশ্বর রবিবার ভুলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এ নিয়ে রমাকেও কিছু বলা যাবে না। ছেলের অজুহাত যে মোক্ষম, ফিরতেই হবে। বুধুয়া তো শনিবার সপ্তাশ্বর মা'র কাছেই থাকে,

সপ্তাশ্ব সময়ে না পৌঁছলে বা না গেলেই বা কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! আরও একদিন নয় লক্ষ্মীরবাজার থাকা হত পিত্রালয়ে। না, দিব্যেন্দুর সঙ্গে যাওয়া চাই। দিব্যেন্দুকে তো চেনে, কমনরুমেও বকো হাসি ছাড়া সম্পর্ক নেই। এ দিকে পাশের বাড়ির প্রাক্তন প্রেমিকা যে অন্যের বউ, সে খেয়াল নেই। তবে প্রেমিকা কথাটা একটু বাড়াবাড়ি। কারণ, কুমারীকালে রমা কারও সঙ্গে প্রেম করতে পেরেছে বলে ঘোর সন্দেহ সপ্তাশ্বর। হেভি ঘ্যামা রাশভারী মেয়ে ছিল শুনেছে।

সপ্তাশ্ব আবার ও পথেই ফেরে। আবার সন্ধের পর বাদশাবাবা। লণ্ঠনের আলোয় যে এক ভিন্ন পরিবেশ, ঝিঁঝির ডাকে মুখর ছেলেবেলার রাত। অচেনা এক স্কুটারের পাশে সপ্তাশ্ব দাঁড় করায় তার বাইক। অমরজিৎ বেরিয়ে আসে। বলে,

—এ ছোট কবিরাজ নি, আইজ যে রাইত করিয়া আইলা?

—অ অমরবাবু নি বা, বালা নি? আমার বাড়ির এইন দেরি দেখিয়া গেছইন গি।

—তেউ?

—তেউ আর কিতা, আমি বেক করি গেলাম। যাইরায় গি নি?

—অয় আইজ্ঞা, আপনে বইন।

অমরজিতের স্কুটার চলে যেতে সপ্তাশ্ব দুখুকে ইশারায় প্রশ্ন করে, কান্নাকাটি বন্ধ হয়েছে কি না। দুখু বলে,

—তুইও বেটা ছোটবেলা থাকি দেখরে নানি ই নৌটঙ্কিরে, তরে দেখলেউ আল্লাদি বাড়ি যায়। তুই স্টার্ট দেওয়ার লগে লগে শেস।

—তে, বিয়া করব নি?

—করত না কেনে? হিগুও নু বিকাল থাকি আইয়া বই রইছে। তরে, আর তর বাইকর আওয়াজ পাইয়া ভাগল।

সত্যিই কি তবে নারীচরিত্র বড়ই জটিল?

সপ্তাশ্ব কিন্তু শাখীর ঘরে গিয়ে দুখুর কথার কোনও মিল খুঁজে পায় না। শাখীর চোখে জল তখনও টলটল করছে। যেহেতু দুখু বলেছে ওসব নাটক তাই সরাসরি নাটকেই প্রবেশ করে সপ্তাশ্ব বলে,

—তেউ ক, বিয়ার দিন ঠিক অইল নি?

—না, আমি বিয়া করতাম নায়।

—কেনে বিয়া করতে নায়?

তৃতীয় সংলাপ সপ্তাশ্বর নয়, দুখুর। ভাইবোনের সম্ভাব্য ঝগড়ার আভাস পেয়ে 'আমি যাই' বলে সন্ধ্যার আঁধারে পালিয়ে যায় সপ্তাশ্ব।

পালিয়ে বাঁচেনি সপ্তাশ্ব সিকিদার। বাড়ি ফিরে রমার সঙ্গে রাগারাগি করতেও ভুলে যায়। বার বার রবীন্দ্রনাথের এক ছোটগল্পের কথা মনে পড়ে বাংলার অধ্যাপকের—'উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতর কেবল জল ছল্ ছল্ করিতেছে—এখনও শাঁসের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না—উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিও না, ও বনের হরিণী।' কেন যে শাখীকে 'কুড়ানি'র মতো মনে হল সপ্তাশ্বর, সে জানে না। হয়তো বনের হরিণীটাই সত্য একমাত্র। নিজের ভাগ্য নিজে গড়েছে যে নারী, যে দৃঢ়চেতা, যে একা সমাজের সঙ্গে লড়াই করে টিঁকে আছে, তারে যাই ভাবা যাক, কচিডাবের মত নয় সে কখনও। তবু সপ্তাশ্ব ভাবে, আজ সে তার বাল্যসখীর কোমল স্পর্শ পেয়েছে, কোমল মনের পরিচয় পেয়েছে আবার, শৈশব পেরনোর অনেক বছর পর। এখন এই প্রাণীটিকে নিয়ে কী করবে সপ্তাশ্ব? কেন বলল শাখী বিয়ে করবে না। ঠিকই তো, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সটা কম নয় নারীজীবনে। এত বয়সে বিয়ে করে কী করবে? তাই যদি হয় তবে অমরজিতের সঙ্গে কেন এত কথা? ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বিদ্যাশিক্ষার ধুম? শনিবার পর্যন্ত সপ্তাশ্ব নিজের সঙ্গে লড়াই করে সিদ্ধান্ত নেয়, থাকুক শাখী একা যেমন আছে। সপ্তাশ্বর ব্যক্তিগত নির্জনতা হয়েই থাকুক। শহরের এলোমেলো গুমোট থেকে রক্ষা করার অম্লজান হয়েই থাকুক তার হরিণা। সাতদিনে সাতদিনে নবীন হয়ে উঠুক তার শাখী।

পরের রবিবারেও যথারীতি বাইকের আওয়াজ শুনে দুখু এসে জড়িয়ে ধরে ভোরের বন্ধুকে। দুখুর শরীরে কিন্তু সে চাঞ্চল্য খুঁজে পায় না সপ্তাশ্ব, যেমন পেয়েছে প্রতি রবিবার সকালে। আলিঙ্গন ছেড়ে অবাক শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় সপ্তাশ্বর চোখে। ছত্রিশ বছরের যুবক হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে,

—আমার কিতা অইব বে? আমারে কে দেখব?

—কেনে কিতা অইছে?

—বিয়ার ত সব ঠিক। সামনর রবিবারে রেজিস্টারি অইত। তুই থাকবে সারাদিন—'

—না।

কেন 'না' বলেছিল জানে না সপ্তাশ্ব। সাত ঘোড়ার বল দিয়ে সরিয়ে দেয় দুখুকে। তার স্বপ্ন দিয়ে সাজানো ঘরে ঢোকে। এর আগের রবিবারে শাখী জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। সে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। আর এই রবিবারের সকালে সপ্তাশ্ব শাখীকে জড়িয়ে ধরে, বলে,

—ই বিয়া অইত নায় সুখু।

—কেনে অইত নায়।

—আমি মানি না। ইতা দোজবরে বিয়া অইত নায়। তুই কুনু আয়া নি, বাইচ্চা রাখতে নি? ইতা অইত নায়। তুই আমার, আমার কথা শুনবে।

—ই বিয়া অইব লালাজি।

—অইব কইলেউ অইব নি। তর অত সাহস আছে নি, আমি না করলে তুই পারবে?

পারতে নায়।

—পারমু।

—না।

সপ্তাশ্বর ঘোড়া বাঁধ মানে নি। চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে শাখীকে। কালো মেয়ের রূপের কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষে চেয়েছে চলে না যাওয়ার।

আগের রবিবার যা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিল সপ্তাশ্ব, সে সবই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে শাখী। বলেছে, সংসারে সে একা, দেখার কেউ নেই, কোন সঞ্চয়ও নেই, পাগল এক দাদা কখন বিবাগী হয়ে চলে যায় ঠিক নেই। অবলা এক নারীকে দেখার কেউ নেই দুনিয়ায়। এখন এই বয়সে ওকে কেউ সন্তানও দিতে পারবে না। তার চেয়ে এই ভাল, অমরজিতের বাচ্চা দুটোকে মানুষ করবে মন দিয়ে। সপ্তাশ্ব ওকে বারবার বিঁধছে সৎমার কথা বলে, সৎমা সৎমাই হয়, মা হয় না। সপ্তাশ্ব শাখীকে বলেছে, সে তাকে সন্তান দেবে। ওকে অর্থের জন্য ভাবতে হবে না, ওর সব সঞ্চয়ের অর্ধেক লিখে দেবে। বলেছে, রমাকে ছেড়ে দেবে, ওর সঙ্গেই থাকবে। শাখী বলেছে,

—ই ক্ষমতা তোমার নাই লালাজি। কুলিবাড়ির কালা পুড়িরে বিয়ার করার অইলে বউত আগেউ করতায়!

সপ্তাশ্ব তার সব পুরনো ভুল মেনে নিয়েছে। বলেছে, সব শুধরে নেবে। অনড় শাখী কুর্মির দৃঢ়তায় ভয় পেয়ে গেছে সপ্তাশ্ব। কী করে হয়? যে ছিল তার হাতের পুতুল, যে ছিল তার কাদার তাল, যাকে শৈশব থেকে নিজের মতো চালনা করে এসেছে, সে হঠাৎ করে এত বল কোথায় পায়! সপ্তাশ্বর হাইলাকান্দির লক্ষ্মীরবাজার যাওয়া হয় না। কর্তব্য বিচ্যুত হয়, রাত করে দরগাকোণা ছাড়ে বিষণ্ণ পুরুষ।

পরের রবিবার সপ্তাশ্ব না গেলেও বিয়ে হয়। রেজিস্ট্রি হয়। নাগরিক মধ্যবিত্ত সপ্তাশ্ব সিকিদার অবাক হয় এক চা-শ্রমিক দুহিতার জীবন সাজানোর দৃঢ় সিদ্ধান্তে। এক জীবনদেবতা সেজে যে সপ্তাশ্ব অর্ঘ্য দিয়েছে, সে কি তবে ভুল? শাখী কি তবে নারীর চতুরালিতে তাকে বিভ্রান্ত করেছে? চরিত্র থেকে বিচ্যুত করেছে? কী করে সে বলতে পারল আত্মরক্ষার মিথ্যে, ভুল, বোকামিভরা প্রতিশ্রুতি? বলে গেল অর্থদানের অঙ্গীকার, স্ত্রী পরিত্যাগের অসত্য, এতবড় লম্পটকেও হার মানিয়ে বলে দিল সন্তান উৎপাদনের কথা? সপ্তাশ্বর এককালের সঙ্গিনী কী একবারও ভেবে দেখবে তার প্রলোভনের মায়াজাল কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল মধ্যবিত্তকে? নাগরিক পুত্র, নাগরিক স্বামী, নাগরিক পিতা, সর্বোপরি এক মতিচ্ছন্ন নাগরিক যখন ধনতান্ত্রিকতার পরিকল্পিত শোষণের শিকার হয়েছে, তখনই মিনি মাগনার, যেমন ইচ্ছে সাজার মজায় সে মজে গেছে বিকল্প জীবনে। শুদ্ধতার, খোলা হাওয়ার, প্রকৃত জীবনের দূরন্ত অতীতের সঙ্গী সুপ্ত যৌনতা যখন নির্জনের ডাক পাঠায় তখনই চড়ায় ঠেকে

নৈতকতা। নিয়মের শাসনে জর্জরিত হতে হতে নিজের মতো বাঁচার আশায় আর এক শোষণের যন্ত্র হয়ে যায় দুখু-সুখু নামের দুই অরণ্যমানব। ছন্দ ভাঙার আগে ছন্দ শেখা হয়নি বলে কবিতার যেমন জন্ম হয় না। নিয়ম নেই বলে নিয়মের রহস্য না জানলে অরণ্য কখনও তপোবন হয় না, ঝরণাতলাও নির্জন হয় না, নীলমণি চোখ মেলে না, পুষ্পবনে পুষ্প থাকে না। প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিয়ে চলে যায়। চা-ঘুগনি আর বিড়ি-সিগারেটের ব্যবসায়ী দুখুয়ার দোকান ভেঙে যায়। দক্ষিণমুখী জানালার সুখুয়া ঘরও ভেঙে দেয় প্রশাসন। খাস জমির উপর বসতকারের অধিকার প্রমাণিত হয় না বলে একদার বৈদ্য অশ্বিনী কবিরাজের ভিটে সহ অনেক বন কাটা বসতের 'টুল্লি' আর দৃশ্যমান হয়না ডিহবাবার থান থেকে। বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হবে বলে অরণ্যের অধিকার সরকারে সোপর্দ হয়।

রমা-সপ্তাশ্বর বিয়ের শর্তও কবেই খারিজ হয়ে গেছে। রমা আর গান শেখায় না, হাইলাকান্দি যায় না। রমার ছেলে পঞ্চম, সপ্তাশ্বর বুধুয়াও গান শেখেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে হারিয়ে যাওয়ার মুখে যত ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্য আছে, তাদের টিঁকিয়ে রাখার জন্য গবেষণা করছে। রবিবারের ভোরে বাবার সঙ্গে চাতলার বুকে ঘুরতে ঘুরতে এক পাথরের টিলায় উপর বসে পিতাপুত্র। অনেক দূরে ডানদিকে ভাসমান টিলার চারটে থামের দিকে আঙুল তুলে সপ্তাশ্ব ছেলেকে বলে,

—গেছিস ওখানে? আসমান টিলায়?

—যাইনি। ওটার নাম আসমান টিলা জানি না। এক সময় মহাকাশ গবেষণার মানমন্দির হওয়ার কথা ছিল। এখন পরিত্যক্ত।

—আমরা গেছি। আমার ঠাকুর্দার সঙ্গে গেছি রাতের বেলা। তারা দেখতে শিখিয়েছে দাদু, সপ্তর্ষি দেখতে হত প্রতিদিন, কালপুরুষের কোমরবন্ধে নাকি আয়ুর ভাণ্ডার। একবার দেখলে ছ'মাস বয়স বেড়ে যায়!

—তাহলে তো তোমার দাদুর অমর হওয়ার কথা।

—আমার দাদু ত অমর। অশ্বিনী কবিরাজের নামে এখনও রোগ সারে গরীব মানুষের।

—কোথায় ছিল বাবা তোমার দাদুর বাড়ি?

—কেন, তোর গবেষণার কাজে লাগবে?

—লাগলে লাগতেও পারে। বলো না কোথায় তোমার লালাজি ঝরণা? দুখু-সুখু তোমার দুই বন্ধু এখন কোথায়?

—এদের নিয়ে গবেষণা হয় না। এরা তো কেউ কখনও ছিল না। এদের দেখা মেলে স্বপ্নে, মায়ায়, কিংবা বলা যায় এরা আমাদের মতিভ্রম। এরা সব মিছিমিছিই মানুষ। এদের নিয়ে কিছু একটা করব ভাবছি।

—তুমিও তো মিছিমিছি।

—না, মিথ্যে কেন হব। মূল্যহীন বলতে পারিস। সিলেটিতে একটি প্রবাদ আছে। 'মূলেদি

ঘর নাই, পুবে দি দুয়ার'। একটা চায়ের দোকান করব ভাবছি তোদের ক্যাম্পাসে। এয়ার কণ্ডিশনড্ কুঁড়েঘরের আদলে হবে আড্ডাস্থল। নাম দেব 'অমূলক'। চা হবে, ঘুগনি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি না থাকলে নাসিরউদ্দিন বিড়িও রাখব। বিড়ি খেয়েছিস কখনও?

—না, বড় বদ্‌গন্ধ।

—সিগারেটে গন্ধ নেই?

—না, আমি খাই না। আচ্ছা বাবা, তোমার এত উচাটন কেন?

—না।

—নাগরিক সুরক্ষাও চাই, বেখেয়ালি প্রকৃতির টাইমপাসও চাই। এতসব হয় না।

—হয়।

—একটা পাখির ওড়ার জন্য কী চাই বলো তো বাবা?

—মুক্ত আকাশ।

—সবাই জানে, আর বাতাস?

—চাই। গাছের ছায়া, ঝরণার জল চাই না?

—বাতাসে সব আছে। তাহলে কেন এত বাহুল্য, ইট-কাঠ-সিমেন্ট, এয়ার কণ্ডিশনড্ কুঁড়েঘর, নগরসভ্যতা? দরগাকোণা গাছবাড়ির বুধুয়া হয়ে থাকতে পারতাম না?

—না, তুমি এখন ভার্চুয়াল বুধুয়া। শিলচর শহরের নাগরিক মা-বাবার সন্তান।

—নাগরিক যৌনতা?

—শুধু যৌনতা কেন, নাগরিক সমাজটাই অলীক রে বেটা, অমূলক।

—এর জন্য তুমি ছেলে নিতে আস ভোরের বেলা? মূলের খোঁজে?

—আনন্দের জন্য আসি।

—তুমি খুঁজতে আস।

—খোঁজার আনন্দে ধনার্জনের দৌড় তো নেই।

—কেউ একজন লিখেছিলেন, সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে না কেন? তোমার জন্য যাচ্ছে না বাবা।

—এই কথা বলিয়ে বর পাড্ডী। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে কিছু হয় না, রক্ষাকবচ। যে আছে নিজেরই মধ্যে, সে খবর কেউ দেয় না। খুঁজলেই পাওয়া যায় অমূল্যরতন। তাই তো খুঁজি।

সপ্তাশ্ব আকাশ দেখে, দেখে আকাশের ভোজবাজি, সোনার থালা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। স্থির হওয়ার সময়টুকুও যা অবকাশ। ছেলেকে কাছে ডাকে। বলে,

—মহিমা অবসান এবার। হেমলেটের ছায়া-পিতাকে মনে পড়ে? ওই সোনার গোলকের সঙ্গে আমারও অমিল তাই। এবার ফিরতে হবে। তোদেব ক্যাম্পাসে অনেক কলাগাছ, পারবি দু-তিনটে নিখুঁত পাতা কেটে আনতে? তোর মা'কে বলেছি, আজ কলাপাতায় ভাত খাব আমরা।

বুধুয়া পিতৃআজ্ঞা পালন করতে যায় আর সপ্তাশ্ব বাদশাবাবার থানের সামনে দাঁড়িয়ে গানের চিঠি পাঠায় আকাশে। সপ্তাশ্ব গায়,

'ভাল আছি, ভাল থেকো
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।'

বুধুয়া বলে,

—কাকে চিঠি?

—বাপ বলে,

—কস্মৈ একজন বা অনেককে। চল।

মিঠাপানির কুণ্ডে এসে তেষ্টা পায়। ভটভটি থামায়। গাঁয়ের বধূর মমতাময়ী হাত থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করে। গ্রাম-নগরের বিভাজনরেখায় দাঁড়িয়ে সপ্তাশ্ব বুধুয়াকে বলে,

—গোরা পড়েছিস?

—হ্যাঁ, গোরার বয়স এখন একশো।

—না, গোরার বয়স দেড়শো বছরের বেশি, রবীন্দ্রনাথেরও বড়।

—হঠাৎ গোরা?

—আকাশ দেখছিস? সুবর্ণ গোলক হারিয়ে গেছে। মেঘের বেলা কিন্তু আসল বেলা নয়। এই ছিল, এই নেই। কে বলবে এখন সকাল, সেদিনও ছিল শ্রাবণ মাস। সেদিনও, এমন দিনে বিনা কাজের অবকাশ ছিল সকালবেলা। আরেক আলখাল্লা পরা বাউল, বাউল দেখেছিস?

—টিভি, সিনেমায় দেখেছি। শত তালির রঙিন জোব্বা।

—সে-ও তো ভার্চুয়াল। তবে সে দিনের বাউল ছিল আসল। বাউল গেয়েছিল গান,

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পেলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায় .. ...'

—লালন সাঁই?

—ওই অচেনা পাখির সুরটা মনে মনে গুনগুন করছে কিনা বল?

ভোর সকালে গড়ায়। মেঘের কোলে চেনা পৃথিবীটা হারিয়ে যাওয়ার আগে সপ্তাশ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার গায় গানটা।

রণবীর পুরকায়স্থ

ওদের কথা

বৌঠান ডাকটার ওপর আমার একটা অধিকারবোধ কাজ করে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ওপর।

ভাবি, আহারে। আমিও যদি জন্ম নিতাম রবিবাবুর কালে?

কী রোমান্টিক জমিদার!

কোপাই খোয়াই ভুবনডাঙা একদিকে, শিলাইদহর পদ্মা অন্যদিকে। সাজগোজের বোটবজরা।

বৈভবের ব্যবহারে সমকক্ষ না হতে পারার দুঃখ আছে। থাক।

কিন্তু ডাক খোঁজের উত্তরাধিকার তো আমারই।

তিনি তার প্রিয় মানুষীকে ডাকতেন বৌঠান।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বলেই সুহাসের বৌ মিত্রার জন্য বেছে রাখি বৌঠান ডাকটাই।

এখন তো দুঃখ হয়ই, বন্ধুপাড়ায় মেয়েকে কেন আলাদা করে দেখিনি?

কেন নজর দিইনি ঢাকাইপট্টির গানবাড়ির মেয়েকে?

ওদের বাড়ির সবাই গান করত। প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে আর ডি.আই হলে। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে গান মানে তো উদ্বোধনী আর সমাপ্তি সঙ্গীত। এর মধ্যে জলসা। মানে হরেকরকম।

সুহাসের সঙ্গেও গান করেছে।

এখন করে না।

ঘরে গুনগুন করতে শুনিনি বৌঠানকে।

বৌঠানকে বলেছি—

গল্প সিনেমার অভিমান নাকি?

বৌঠান হেসেছে রহস্যের।

শহর শিলচরে, গানের জগতে সুহাস নিজেকে ছাড়া কিছু জানত না।

সুহাস একজনই শিলচরে।

সুহাস আমার বন্ধু।

বন্ধু বলেই হয়তো ওকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছি সবসময়।

শিলচরে গানের কদর ছিল খুব।

মানে, জলসার গান।

আর, সুহাস ছাড়া, আর একটা আর একটা, বলে অ্যাংকর তোলার গান তো কেউ গাইত না।

তখন যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসতেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী আসতেন, সনৎ সিংহ, সুধীর সেন আসতেন গোলদিঘিতে।

শাস্ত্রীয় সংগীতের শীতও আসত জাঁকিয়ে মধ্যশহরে।

শহরে নাচ ছিল, নাটক ছিল।

মুকুন্দ ভট্টাচার্য তার রাণার নাচে বিখ্যাত শম্ভু ভট্টাচার্যের সমকক্ষ। ভরদ্বাজ ভগিনীর নাচ গানও শহর জলসার প্রধান আকর্ষণ।

নাটকের কথায় কাকে ছেড়ে কাকে রাখি?

আর্যপট্টিতে পান্না নাগ, নীলু সেন ফেরারী ফৌজ দাপাচ্ছেন, তো ওদিকে অম্বিকাপট্টির পলু বিশ্বা। মন্টু শেখর বাচ্চুরা তো নাটকে আমার সহাধ্যায়ী। সুমেধা মধুরা আর কাঞ্চনদিও সুন্দরী অভিনেত্রী তখন।

দেখতে সুন্দর মানুষরা একটু স্বার্থপর হয়।

তার উপর মানুষ পছন্দ কোনও গুণের অধিকারী হলে তো কথাই নেই। আমিও তো কিছুটা সুহাসের দলে।

আমার অহঙ্কার ছিল মঞ্চের উপর। কবিতার খাতায়।

সুহাস গানের আসর এবং তার বাইরেও দাপিয়ে বেড়াত।

কলকাতা গিয়ে রণো গুহঠাকুরতার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছে যে। রবীন্দ্র নজরুল ছাড়াও, তালাত মামুদের গান গাইত। 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস' গাইত 'আজি দুজনার দুটি পথ' গাইত। লোকগান গাইত 'সুহাগ চান্দ বদনী', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান গাইত শেকল ভাঙার। হারমোনিয়ামের উপর গানের সুর নাচত তাতা থৈ থৈ। সুহাসের গান মানেই উন্মাদনা।

২.

গানের রাজা শহর ছেড়ে গেল আমার আগে।

একই সঙ্গে ইন্টারভিউ দিলাম। সুহাস পেয়ে গেল চাকরি।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হাতিছড়া শাখার থার্ড অফিসার।

ধুমধামের মটুক মাথায় দিয়ে বৌঠানকেও নিয়ে গেল একদিন। এক সাক্ষাৎকারে পৃথক ফল হল না। আমিও তৃতীয় অফিসার হয়ে চলে এলাম হাতিছড়া।

রিণা তখনও মনস্থির করতে পারেনি বলে বৌঠানের পাশেই পেলাম বাসস্থান। বিয়ে না করার যৌতুক পেলাম বছর কুড়ির কালো কুচকুচে যুবক মঙ্গালাল। ব্যাঙ্কের ঝাড়পোঁছের জমাদার। সকাল রাতে আমার গেরস্থালির অভিভাবক। কাব্যপ্রকরণ ছেড়ে পাকপ্রকরণে মনোযোগী হয়েছি মঙ্গালাল গৃহশিক্ষকের নববিধানে। মঙ্গা যা রাঁধে তাতে গ্রাসের আগ্রহ হয় ক্ষুধার তাড়নায়। আর বৌঠান বাড়ির মাছের ঝোলবাটি চালান এর লোভে।

পোড়খাওয়া মেনুর প্রকোপে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় কখনও সখনও। নিরাময়ের নিদানও থাকে মঙ্গালালের কাছে। পুকুর ছেঁচে নিয়ে আসে মাগুর মাছ, সঙ্গে কাঁচাকলার কাঁদি। পেটখারাপের মোক্ষম পথ্য, শুশ্রূষার বহর দেখে আমার আতঙ্কিত প্রশ্নে সহাস্য জবাব দেয় নিকষকালো ভৃত্য। বলে,

—হামি পাকামে কিন্তুক বাবু।

—আবার কিন্তু কিরে? লেগে পড় লড়াইএ।

'কিন্তু'র বহর দেখে আমার আতঙ্ক তখন ছুটির আনন্দে হাত্-পা ছুঁড়ছে। পথ্য হলেও তো কিছু মশলাপাতির দরকার। বাটতে হবে শিলনোড়ায়। মঙ্গাল হলুদ বাটার ভার সইতে না পেরে পাটার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে খান খান। এবার কী হবে তবে? সানন্দ উৎসাহে আমি তখন মঙ্গাকে উজ্জীবিত করি। বলি,

—ডোন্ট ওয়্যারি মঙ্গাবাবু, আজ সব ছিড়িয়া হোই।

—মতলব?

—সব মশলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিবি।

সংক্রামিত খুশিতে মঙ্কা শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতার পরই থমকে যায়। বিষাদে মাথা নুয়ে যায়। বলে,

—মরিচ অউবা ছিড়িয়া উবা দিলাম অউবা তেজপাতা উবা ছিড়িয়া উবা দিলাম অউবা। হলদিউবা ছিড়িয়াউবা কেমনউবা দিমুউবা? ভাগ্যিস লবন ছেঁড়ার কথা বলেনি আমার বুদ্ধিমান পাচক।

হলুদহীন পথ্য কী আর মুখে দেওয়া যায়?

হরিমটর থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে বৌঠান তার মিঠে হাতের মহাভোজে।

কৃতজ্ঞতায় বৌঠানকে বলি,

—মঙ্গাকে নিয়ে কী করি বলো তো?

বৌঠান বলে,

—পুজোর আগেই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেব।

—সে তো অনেক দূর। আর বর্তমান?

—যেমন চলছে চলুক। কাটাখাল, লালবাজার রেলপথ। এ বাড়িতে কাঁচাপোড়া দু'বেলা, ওবাড়ির দুবেলা। বন্ধুর বাড়িতে পাকাপাকি থাকলে তো আর মান বাঁচে না।

—তা কেন? ব্যাঙ্কের কোয়ার্টারটা হাতছাড়া হলে কোথায় থাকব? বিকল্প ব্যবস্থার পর?

—সে অনেক দূর।

—আসলে আলাদা একটা ঠেক থাকলে দু-বন্ধুতে মাঝে মাঝে ... ... তুমি তো আবাব ওসব পছন্দ করো না?

—কী সব?

—খাবে নাকি একদিন?

—খেতে পারি। তবে শুধু তোমার সঙ্গে।

—কেন? সুহাস কী অপরাধ করল?

—ও মাতাল হয়ে যায়।

—আমি যে হই না তোমাকে কে বলল?

—মনে আছে কলেজে সরস্বতী পুজোর পরদিন খেয়েছিলে আর শুধু মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিলে?

—তখন থেকে টার্গেট করছ?

—সুহাস খুব মাতলামি করছিল, আর তুমি ঢুলু ঢুলু চোখে হাসছিলে। সত্যি করে বলো আমায় দেখোনি সেদিন?

—দেখো, কবি আর নাটুকেরা বরাবরই একটু ভীতু প্রকৃতির, আর গায়করা হয় ডাকাবুকো, তাই তাকাই নি, কবিতা লিখে থাকতে পারি অবাক চোখের।

৩.

তখনকার দিনে ছাপমারা হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই। কলেজ থেকে পাড়ায়, পাড়া থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়ে জুটির নাম। রামনগর, মেহেরপুরে রিক্সায় দেখার সত্য অসত্য গল্পও জুড়ে যায়। আমার কপালে জোটে রিণা। বিয়ে অব্দি জড়াতে আরো বছর খানেক, অসবর্ণ বিয়ের অনেক কাঠখড়। ধ্বক করে জ্বলে উঠবে যখন যজ্ঞাগ্নি, তখনই বিয়ে। তাই সময় কাটানোর মাঝামাঝিতে বৌঠান মাঝারি আঁচে হৃদয় পোড়ায়। নরম ব্যথায় কাতর হই। বলি,

—সবচে’ ভালো হয় বৌঠান, তুমি ক’দিন মঙ্গাকে ট্রেনিং দাও। শিক্ষান্তে একদিন তোমাদের দিয়ে হোক না মঙ্গালালের নবহস্তগ্রহণ?

—শেখাতে হলে মঙ্গা কেন? একটা ঢাকঢোল সানাই-এর নেমন্তন্নই হোক না?

—হবে হবে। সব হবে। সমাজ একটু নড়েচড়ে বসুক। কায়স্থ বাড়িতে ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ের স্বীকৃতি আসুক।

—ও, রিণারা তো আবার ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ। তাতে কী? আজকাল ওসব নিয়ে কেউ ভাবে না।

—রিণার বাবা ভাবেন না, মা বেঁকে আছেন। না করছেন না সরাসরি, রিণাকে মানসিক নির্যাতন করছেন, আচ্ছা খেলোয়াড় এই বাবনি, উনি খেললে তুমিও খেলো। কালো ঘুঁটির চাল দাও মোক্ষম। এ খেলায় জেতা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।

—জিততেই হবে কেন? রিণাকে আমি একবছর সময় দিয়েছি শূদ্রাণী হওয়ার।

—বোকা প্লেয়ার। সময়মতো ঘুঁটি বদলে ফেলতে পারলে না? সাদা ঘুঁটিতে খেললে কোনও প্রবলেম ছিল না। সুহাসকে ছেড়ে চলে আসতাম। বামুন কায়েতের ঝামেলা ছিল না।

—আসবে? এখনও উপায় আছে। একটা মামলা ঠুকে দাও।

—ঠুকব তো ঠিকই। তখন পিছিয়ে এলে চলবে না। আপাতত রিণা বেচারির ওয়েট লিস্টটা কনফার্ম করি। পুজোর মধ্যেই সব ঠিক করে দেব। বলো রাজি তো?

বৌঠানকে বলি,

—রাজি না হয়ে পারি? ‘তুমি আছো বলে মেঘে জল, তোমারি ইচ্ছায় সমস্ত নাস্তিক শক্তি ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়।’

৪.

বৌঠানের কেরামতি আছে বটে।

শুধুমাত্র কথার টানেই থেকে গেলাম হাতিছড়া গ্রামে। পুজোর ক’দিন সবাই মিলে শিলচর বাতিল করলাম।

মূল প্রস্তাব ছিল সুহাসের। সুহাস বলল,

—এবার একটু অন্যরকম হোক। গ্রামেই কাটিয়ে দিই ছুটির ক’দিন, কী বলিস?

আমার একটা প্রাথমিক প্রতিরোধ ছিল। বলেছিলাম,

—মাথা খারাপ। আর্যপট্টি, প্রেমতলা, অম্বিকাপট্টি ছেড়ে পুজোয় থাকব এই ধেধ্‌ধেড়ে হাতির দেশে? শনিবার রিহার্সাল দেব বলেছি আর্যপট্টিতে। অঙ্গার নামাবে পরেশদা। আর তো তো কথাই নেই। গায়ক সুহাস চৌধুরী থাকবে না হয় নাকি? তার ওপর বৌঠানের বাপের বাড়ি? নতুন জামাই তুই। বিরাট ব্যাপার!

—আমার কোনও অসুবিধা হবে না। বাড়িতে জানে কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছি। একবার যখন স্থির করেই ফেলেছে, তখন যাবে না, দেখে নিও। তুমিও থেকে যাও না, প্লীজ।

বৌঠানের দীর্ঘায়িত 'প্লীজ' এবং অন্যান্য কার্যকারণ মিলিয়ে, সুহাসের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাই। প্রিয়বন্ধু সুহাস একদিকে, আর বৌঠান তো এখন আমার নেশা। ছেড়ে থাকতে মন চায় না। মা-বাবাকে দাদার বাড়ি দিল্লিতে পাঠানো গেল। রিণাকে অপেক্ষায় রেখে আমি থাকলাম হাতিছড়া। গোল্লায় গেল নাটক। কবিতা লেখার নিরিবিলিও কেড়ে নিল বৌঠান।

বিবিধপদের রান্নায় জমে গেল সপ্তমীর সকাল দুপুর। বেশ কিছু হাতখরচ দিয়ে মঙ্গালালকে ছুটি দিয়ে দিলাম বৌঠানের পরামর্শে।

৫.

শরতের পূর্ণিমাপথে অনেকটাই এগিয়েছে হাতিছড়ার সন্ধ্যা।

দু-দুটো লাল বাইক বেয়ে আমরা বেরোলাম পুজো দেখতে।

সুহাস আর বৌঠান একটায়।

আমি আমার লালপরিতে একা।

একা আমার জন্য আফশোষ হল বৌঠানের, সুহাসকে বলল,
—চলো যাই দু'জনে, শিলচর থেকে উঠিয়ে আনি রিণাকে।

সুহাসও বলল,
—তাই চলো। তুই থাকবি, না যাবি? বরাক ব্রিজের এপারে থাকবি। সংযুক্তাকে এনে উঠিয়ে দেব তোর সওয়ার।

মনটা একটু সংরাগে সুখী হলেই ভাঙা শামুকে হোঁচট খায়।

মনোদুঃখে বলি,
—পারবি না দোস্ত। আমার শাশুড়িকে দেখলে, তোদেরই শ্বাস উড়িয়া যাইবে। দাঙ্গা বাঁধিয়ে ফেলবেন মহিলা।

মামাবাড়ির আবদার? ছ'মাস হয় শিলচর ছেড়েছি। সুহাস চৌধুরীকে চেনে না তোর শ্বশুরবাড়ি। এমন টিট করব না!

ক্ষ্যাপা স্বামীকে সামাল দেয় বৌঠান। বলে,
—তুমি মহাবীরকে শিলচরে সবাই চেনে। বীরত্ব দেখিয়ে লাভ নেই। এরচে' চলো কোথায় বসে একটা সমাধান-সূত্র বের করা যাক। তাই পুজোর প্যাণ্ডেলে না গিয়ে আমরা যাই দিঘিরপার। পুজোর ছুটি না পড়লে, আর বৌঠানের প্রস্তাব না থাকলে দেখা হত না এমন সুন্দর জলাধার। গোলাকার জলরাশিকে ঘিরে রেখেছে চা-বাগান।

সাহেব আমলে বাগান বাবুদের উদাসী মনের ঠিকানা ছিল দিঘিরপার। অনেকগুলো পাথর সাজানো পুকুর ঘিরে, ভটভটির আওয়াজ থামিয়ে সুহাস বলে,

—নে, এবার একটা কবিতা লিখে ফেল জমজমাট। শতক্রতুতে ছাপিয়ে দেব।

—শতক্রতু আবার কবিতা ছাপায় নাকি?

—কবি হয়ে খবর রাখিস না। দুই সম্পাদকের একজন তপনদা কবি; মন্টুদা গল্পকার। ফেরারী লিখল না?

—ধুস্, সে তো শেখর দাশ।

—ও, মন্টুদা লিখেছে 'ছারপোকা'।

—ঠিক আছে এখন আর ছারপোকার কামড় খেয়ে লাভ নেই। ওদের আমি চিনি। আমার কবিতাও ছাপিয়েছে। এবার একটা গান গা দেখি জমিয়ে। ডুয়েট।

—ডুয়েট? তুই গাইবি নাকি?

—কেন? বৌঠান গাইবে। তোরা একসঙ্গে স্টেজে উঠলে কী দারুণ ব্যাপার হত বল্‌তো শিলচরে?

—মিতু এখন গায় না।

—কেন গাওনা বৌঠান? স্যাক্রিফাইস? বৌঠানের গলায় একটা অন্য মাধুর্য আছে, যাই বলিস। কতদিন শুনি না, গাও না বৌঠান। তোমায় একটা ধলা ফকফকা চাঁদ কিনে দেব আটদিন পর কোজাগরিতে গিফট্।

—প্লিজ, আজ জ্যোৎস্নারাতে গাইতে বলিস না। ওকে গাইতে বল। বৌঠান এতক্ষণ সুহাসের স্ত্রী, আমার বৌঠান ছিল, যেমন থাকতে হয়। গানের কথায় হঠাৎ আলাদা হয়ে যায়। ছিটকে আসে ওর প্রত্যাখ্যান, বলে,

—আমি গাইব না।

সুহাসও তেজিঘোড়ার চাবুক ছুঁড়ে বলে,

—ঠিক আছে, আমি একাই গাইব। সুহাস চৌধুরী গানের জন্য দাম বাড়ায় না। চলো ওয়ান টু এই দিনে মেঘলা ... ...

সুহাস 'মাতাল সমীরণে'ও গায়। গান শেষ করে বলে—চল উধারবন্দ যেতে হবে। গোষ্ঠবিহারী সার্বজনীন-এ গান আছে আমার সাড়ে আটটা থেকে ন'টা। আধঘন্টা গাইব, চলে আসব। সুহাস বাইকে স্টার্ট দিতেই বৌঠান আবার ভাবের ঘোরে বলে ওঠে,

—আমি যাব না।

বৌঠানের এক নতুন রূপ দেখি সপ্তমী পুজোর রাতে। নিজের সিদ্ধান্ত যে কেউ এমন অমোঘ নির্ণয়ে জানাতে পারে দেখলাম। অবাক হয়ে শুনলাম। রাগ, দুঃখ, অভিমান কিছুই বেরোল না কথায়। মনে হল যেন অনুনয় করছে সুহাসকে।

তিনশব্দের পাঁচিল ভাঙা সুহাসের কর্ম নয়। বলে,

—ঠিক আছে। তোমরা পুজোটুজো দেখে বাড়ি ফিরে যেও। আমি চলে আসব ন'টা সাড়ে ন'টায়।

৬.

ভটভটিয়ে সুহাস চলে যেতেই আমরা দু'জন অবাক বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। যদিও সুহাসের এমন আচরণ আমার অজানা নয়। হুটহাট রাগ করা হল সুহাসের অভিমান আভরণ। কোনও কারণে বৌঠানের ওপর ক্ষেপেছে। সে তো গেল সখা সমাচার। এখন এই বনপথে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে কী করি?

আমাকে কিছু করতে হয় না। বৌঠানই বলে,

—বন্ধুকে এখনও চেনো নি। আমাকে নিয়ে যেতে চায় নি। গানের কথা হলেও ওর সব অভিমান। কোনও ফাংশানটাংশান নয়। একা একা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফিরবে ঠিক সময়ে। তারপর ভুলে যাবে সব, এমনি ভোলানাথ তোমার বন্ধু।

হাজার হোক সুহাস তো আমার বন্ধু। বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বললাম,

—সুহাস বলল তখনই গাইলে না কেন?

—ওকে তাতিয়ে দিলাম। তাইতো গাইল ওমন দরদভরে। বন্ধুকে যেমন চিনি, ছ'মাসের বন্ধুপত্নীকেও কম চিনি না। জানি, তাতিয়ে দেওয়া নয়। গভীর কোনও অসুখ আছে দু'জনের গান নিয়ে। গান গেয়েই প্রেম গানেই পরিণয়। তা হলে কেন গান নিয়ে বিরোধ? বৌঠানকে বলি,

—গান-পাগলা মানুষটাকে কেন তাতিয়ে দাও। সুহাসের গান শুনে আমিও যুদ্ধ জয় করতে পারি জানো? আমাদের কলেজের বন্ধু মধুকর পালকে তো চেনো। মহা কিপটে, বাজি ধরে ওর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল সুহাস। এখনও ফেরত দেয়নি। টাকা চাইলেই এক কলি গান শুনিয়ে দেয়। বলে, কিস্তি দিলাম।

—এত লোকঠকানো বুদ্ধি তোমার বন্ধুর?

—এবার আমার কিস্তি দাও।

—আমার নাম করেও টাকা নিয়েছে নাকি?

—মনে করো তাই। এবার একটা গান গাও আমার জন্য।

ভুলব না।

সে রাতের কথা ভুলব না।

গোলাকার জলকে প্রদক্ষিণ করে বৌঠান গাইল গান।

যেন এক জলদেবী।

গান শেষ করে দু'জনে উঠে এলাম পাশাপাশি পুজামণ্ডপে।

বৌঠান বলেছিল,

—চলো বাড়ি যাই।

আমি বলেছিলাম,

—না পুজো দেখব, যার জন্য থেকে গেলাম।

৭.

চা-বাগানের কেউ না হলেও, চাকরিসূত্রে জেনে গেছি অনেক। চা-বাগানের বাবু আর কুলির মধ্যে বিভাজন বিস্তর।

কিন্তু দুর্গাপূজায় সব একাকার।

দিনের বেলা পূজা-অর্চনা আর রঙ-বেরঙের পোশাকে থাকে জমজমাট। রাতেও হ্যাজাকবাতির আলোয় যাত্রাপালার ঝলমলানো পোশাক। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরির অন্তহীন অসিযুদ্ধ। যাত্রা চলছে বনবনিয়ে তরোয়াল ঝনঝনিয়ে।

গ্রামে না গেলে দেখা হয় না মানুষের নিঃস্ব হওয়ার আনন্দ।

যাত্রা শেষ হলেই জুয়ার আসরও শেষ। তাই ঝাণ্ডিমুণ্ডার দানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রার আর দৃশ্যান্তর হয় না।

গরীব জীবনের মহার্ঘতম অধিকারও শেষ করে দেয় মানুষ জুয়ার আসরে। মহাভারতের কালে তো বৌ বাজিরও রেওয়াজ ছিল।

সে-রাতে বৌঠানকে নিয়ে দেখেছিলাম যাত্রার প্রথমাংশ। সংযুক্তা বেশী পুরুষ অভিনেতাকে দেখে তো বৌঠান অবাক। ন'টা, সাড়ে ন'টা কোথায়? সুহাস ফিরেছিল রাত বারোটায়।

একা একা যাত্রা দেখার কোনও উৎসাহ ছিল না। বৌঠানের জন্য মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

সুহাসটা কেন এমন পাগলামি করে?

একা ছেড়ে চলে যায়?

উৎসবের রাতে কার হাতে দিয়ে যায় নবপরিণীতাকে? বৌঠান কেন বলে আর গান গাইবে না?

জুয়ার আসরে অসহায় মানুষের হেরে যাওয়া দেখতে দেখতে ইচ্ছে হল, আমি কেন কিছু হারি না?

বৌঠানের দুঃখ কি বাজি ধরবে জুয়াওয়ালা?

আমার ইস্কাপনের রাণির জন্য বাজি ধরতে পকেটে হাত দিই। কোথায় ধরব বাজি? আমার কালোপানের ঘরে বাজি ধরে বসে আছে মঙ্গালাল। আমি হাত গুটিয়ে নিই।

সবাই হারে, একা মঙ্গা জেতে।

নেশায় টইটম্বুর মঙ্গালাল আবার খেলতে চায়।

আর খেলা হবে না।

ভোর হয়ে গেছে। যাত্রা শেষ। সবাই বাড়ি ফিরছে।

৮.

আমাকে ফিরতে হয় দিঘিরপার।

যেখানে শুরু হয়েছিল গতকাল সন্ধ্যা উৎসব।

যেখানে ফেলে চলে গিয়েছিলাম আমার প্রিয়তমাকে।

আমার বুলেট।

ভটভটির গায়ে হাত দিয়ে শিশির মুছিয়ে বলি,

—স্যরি বন্ধু। বৌঠানের জন্য তোমাকেও হারিয়ে ফেলেছিলাম নির্দ্বিধায়।

আমি আর ফিরিনি কোয়ার্টারে।

বন্ধুর পিঠে চেপে বলি,

—চলো রিণাবাড়ি।

এবার রিণার জন্য পুজোর বাকি দু'দিন।

মাছিমপুর কালীবাড়িতে দু'জনে বসেছিলাম অষ্টমী পুজোর দিন। কেউ জানল না কিছু। শুধু দু'জনে। রিণা বলল, মানবে না কোনও বাধা। নবমীর দিন বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিল। সেদিনও দু'জনে চলে গেলাম লাবক চা-বাগান, রিণার জন্মস্থান। পাহাড়ের উপর হাসপাতালে কেটে গেল দিন। রিণা বলল,

—বিয়ে কবে করবে, ঠিক করেছ?

আমি বললাম,

—চল না আজই কালীবাড়িতে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দি?

—না, ওরকম হবে না। বাড়ি থেকেই দেবে। যা আগুন লাগিয়ে এসেছি। এখন তোমাকে বরাক নদী থেকে জল নিয়ে যেতে হবে শুধু। সত্যি তাই হল। নবমীর রাতেই ও-বাড়িতে প্রণাম সেরে দশমীর প্রস্তুতি সেরে এলাম। ওদের এখন মেয়ে বিদায়ের প্রতীক্ষা। হৃষ্টমনে দশমীর দিন ফিরে এলাম হাতিছড়া।

৯.

বৌঠানের উদ্বেগ দেখে মনে হল না জানিয়ে চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। বিদ্রোহী মন বলল, কেন বলব? আমি আমার মর্জির মালিক। তোমাকে বলতে হবে কেন বৌঠান? তুমি আমার কে?

তোমার ভয়েই তো পালিয়েছি।

বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে এলাম।

বৌঠান বলেছিল পুজোর মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

কথা রেখেছে বৌঠান।

দশমীর দিন সন্ধ্যারাতে সবৌঠান এক বেনের পুঁটুলি এসে উঠল আমার ঘরে। সঙ্গে প্রভূত মদ্যপান রত, মানে হাঁড়িয়া খাওয়া মঙ্গালাল। বৌঠান বলল,

—এর নাম জংলী। মঙ্গার বৌ।

—জংলী আবার কী নাম?

মঙ্গার নেশা ভঙ্গ হয়। বলে,

—কেন হবে না? হামরা জঙ্গলে থাকি। মঙ্গলবারে জনম হলো হামার, ওর ভি জন্ম মঙ্গলবারে। মঙ্গা মঙ্গলী হবেক নাই। মরদের নামে নাম হলে পাপ লাগবেক। মেমসাহেব বহুত সুন্দর নাম দিয়েছে, জংলী। তুই না করিস না বাবু?

না আর করি কী করে? পূজার আগে দিয়েছিলাম দশটাকা। বিজয়ার দিন দিলাম আরো দশ, টাকা পেয়ে নেশার ঘোরে মঙ্গা আবার বায়না ধরল নতুন। বলল,

—তুই ভি একটা নাম দে না বাবু। তোর গোড় ধরি।

মাতালের হাত থেকে বাঁচতে, বৌঠানের জংলীকে দিলাম নতুন নাম। জয়া। বিজয়া দশমীর সঙ্গে মিলিয়ে।

নাম তো দিয়ে দিলাম খেলাচ্ছলে।

থাকতেও দিলাম কোয়ার্টারের একটা ঘরে। থাক না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই চমক।

কালো সবুজ আর লালের ছোপ ছোপ শাড়ির হাতে চায়ের কাপ। মানে সারা শরীর ঢাকা। শুধু লালরঙের পেটিকোটটা পায়ের পাতার উপর থেকে উঁকি মারছে। মাথায় থ্যাবড়ানো সিঁদুরের ছোপ। কালোবরণ মুখখানায় বড় মায়াবী সৌন্দর্য। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিমার মুখ যেন অবিকল।

অযাচিত প্রভাতী চা দিয়ে যা শুরু হল, তা তো থামতেই চায় না। জলখাবার, দিনের খাবার, রাতের খাবার থেকে মশারি টাঙানোয় এক অদৃশ্য নৈপুণ্য কাজ করে। লক্ষ্মীপুজোর

আগেই আমার কোয়ার্টারে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এল।

বৌঠানকে জানালাম সমাচার। সরেজমিন দেখে বৌঠান জংলী জয়াকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করল।

আমিও কৈফিয়ৎ দিলাম। বললাম,

—না বৌঠান, মেয়েটি অন্যরকম, বড় মায়াধারী, খুব ভাল। জংলী প্রশংসার এক একটি শব্দ তুলে বৌঠানের রসিকতায় মজা ছিল। এক যুবকের দুঃখী সময়কে রঙেরসে ভরে দিতে জংলীর যোগদানও কম নয়। এও এক নতুন পাওয়া। শহুরে চালাক মেয়ে তো নয়। যা করে তা প্রাণ ঢেলে করে।

কালোর রঙের ঐ যৌবনবতী বধূর কথা রিণাকেও বলেছি। রিণা বৌঠানের মত রসিকতায় তরল হয় নি। রিণা রেগেছে। বলেছে,

—জয়া আর বৌঠান, তোমার ঐ আদরের নাম দু'টোকে খুন করে তবে ঘর শুরু করব। আমাকে কিন্তু প্লীজ, ন্যাকামির কোনও নাম দেবে না বলে রাখছি। আমি রিণা, রিণাই—'

১১.

রিণা একটু অসহিষ্ণু।

আমার কথা মানতে চায় না। আমি বলেছি—সময়কে তো মানতে হবে। তখন ছিল একরকম। তখন তুমি ছিলে না। রিণা বলে,

—সময় কিছু নয়। মনটাই রাজা। মন দিলেই সময়, নইলে কিছুই নয়।

আমি বলি,

—সময়ই সব। সময়ের উপর গাজোয়ারি করা যায় না।

হাতিছড়ায় সময়ের মাপ একটা তো ছিল। সেই মাপের সময় শহরে থাকলে, শিলচরে থাকলে কি তার অভিঘাত এক হত? হাতিছড়ায় সময় ছিল নিরবচ্ছিন্ন। ছিল একান্ত। ভিড়ভাট্টার সময় ছিল না বলে, বৌঠানকে নিয়ে একটা সুখের সময়, গুণান্বিত সময় কাটিয়েছি। খণ্ডে খণ্ডে সময় নিয়ে সাজিয়েছি বৌঠানকে। সাজিয়েছে এসে জয়া। মনের মাধুরী দিয়ে সাজানো আর শরীর অধিকারের মাত্রা যে ভিন্ন হয়, সে কী করে বোঝাই রিণাকে?

আবার রিণার কথাকেও ভুল বলি কী করে? মন লাগলেই না, সময়ের গায়ে ইট কাঠ পলেস্তারা।

তাই বলি,

—বাদ দাও সময়। সময়ের বদলে বলো বিশ্বাস। এবার ঠিক হল তো?

—না।

১১.

আমার বিশ্বাস আর রিণার বিশ্বাস মেলে না।

প্রেম ও নারীপুরুষ সম্পর্ক নিয়ে রিণা যথেষ্ট বিশুদ্ধবাদী।

আমি যেমন ঘন ঘন প্রেমে পড়তে ভালবাসি, রিণা ঠিক তার উল্টো। ভক্তিমতী মহিলার মত সে শুদ্ধতার আধার।

আমাকে অন্য রমণীতে আগ্রহী দেখলেই রাগে।

আমি লুকিয়ে রাখতে পারি না, স্ত্রীর কাছে মনের জানালা খুলে দিই যখন তখন। আর সত্য কথার বিভ্রাট হয়।

টানাপোড়েনে আমাদের দাম্পত্য এক সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলে থাকে। মধ্যবিত্তের সম্পর্ক তো? ছেঁড়ে না।

রোজগারের ধারা একমুখী বলে কি? হয়তো।

সন্তান এলে একটা নৈতিক বাধা থাকে।

আর ছাড়াছাড়ির পুরুষ-মহিলাকে এখন দুধে-ভাতে সমাজ ততটা সুনজরে দেখে না।

তাই, খোলামেলা কথা বলার ভুল শোধরাতে সচেষ্ট হই। কম কথা বলি।

মনের কথা তো নয়ই।

জানি, বৌঠানের কথা বললে এখনও রিণা রেগে যায়।

এমনকি জয়া নাম্নী আমার পরিচারক-পত্নীর কথাতেও। কেন রেগে যায়?

এ প্রশ্নের জবাবে রিণার চোখের কোণ চিকচিক করে। বলে,

—আমার বুঝি দুঃখ হয় না?

—কিসের দুঃখ তোমার?

—কী জানি!

সময় হারানোর কষ্টে রিণা কাতর হয়।

সেই সময়, আমার সঙ্গে না থাকার দুঃখ। অসহায় অতীতকে উপভোগ করতে না পারার দুঃখ।

আমি বলি, মাঝে মাঝে এরকম কষ্ট পাওয়া ভাল। অজানা কষ্ট না থাকলে পানসে হয়ে যায় জীবন। রিণার চোখে চোখ রেখে একটা অনুনয় জানাই। বলি,

—যাবে নাকি একবার? চলো যাই। ঘুরে আসি হাতিছড়া। তোমার সন্দেহ নিরসন হয়ে

যাবে।

—ডেকেছে কখনও যে যাব?

—ডেকেছে। বারবার ডেকেছে।

—তে তোমাকে, ওর প্রিয়জনকে ডেকেছে।

—তোমার এই এক গোঁ। ঠিক আছে চলো, না ডাকতেই যাই। তোমার সেই হিংসার জংলীকেও দেখে আসবে। একটা মজার কথা বলব, রাগ করবে না, বলো?

—বলো।

—ওদের না কোনও ছেলেপুলে হচ্ছে না।

—তো?

—না। ঐ হারামজাদা মঙ্গালালটা এমন ইডিয়েট। আমাকে অনেক ঠকিয়েছে। পূজা বোনাস থেকে একশ টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল শিলচর থেকে টেপ রেকর্ডার কিনে আনতে। একশ টাকায় হয় বলো? আমারই গচ্চা গেল। কিনে দিলাম। সঙ্গে একটা ক্যাসেটও দিলাম। যেটায় আছে 'হামকালে হ্যায় তো ক্যায়া হুয়া দিলওয়ালে হ্যায়'। ওকে শুনিয়ে গাইত সুহাস। ওর বৌ গান জানে। গুনগুন করে গায়। অংশুমান রায়ের ক্যাসেট কিনে দিয়েছি জয়াকে। ঐ গানটা খুব শুনত আর গাইত 'হামার পুলার বিয়া হবে'। ওদের এই একটাই দুঃখ।

—তুমি কী করে বুঝলে? এক বছর তো ছিল ওদের বিয়ের পর? ওরা হয়তো তখন চায়নি। এখন দেখবে ভরাগাগরি।

—আরে না না, কুলি-কামিনদের কী ওসব ভাবার সময় আছে? একটা মনের কথা বলব? রাগ করবে না?

—তখন থেকে একটা একটা করে হাজারটা বলে ফেলেছ?

—আমার না খুব ইচ্ছে হত জয়ার কোলে একটা ফুটফুটে বাচ্চা তুলে দেওয়ার।

—ছিঃ!

আবার ভুল করে ফেললাম।

মনের ভেতর তো অনেক কথাই আসে যায়। সব কথা কেন বলতে হবে? সেদিন ভুল করেছিলাম। রিণার সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়েছিল। কুরুচিকর মানসিকতার জন্য আমাকে ঘৃণা করেছিল।

১২.

ঘৃণা করলেও, রিণা সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হাতিছড়া যাবে। তার আগেই এল বৃষ্টি। বৃষ্টি এলেই আমার আর সুহাসের কোয়ার্টার দুটো বিভাজিত হয়ে যায়। দুটো টিলার

মাঝখানের ছড়ায় ভরে জল। মুখোমুখি দুটো বারান্দা তবু দূর হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝমঝমিয়ে পড়ছে বারিধারা। নিরালোক বারান্দায় বসে ভুলে গেছি চরাচর। ওপারেও বারান্দায় এক অপার্থিব দৃশ্য। মেঘরঙা শাড়িতে এক উদাসিনীর চুল উড়ে যাচ্ছে মেঘের শূন্যে। আর ভিতর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে গান 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা ...'।

গান কে গাইছিল ভিতর ঘরে?

সুহাস? নাকি আমার মন গাইছিল আবহগান?

তেমন দিন আবার ফিরে পাওয়ার লোভেই কি রিণাকে বললাম,

—চলো এমন দিনেই।' গেছিলাম হাতিছড়া। এপ্রিলের চার। দু'বছর হয়ে গেল। সুহাস থেকে গেল গ্রামীণ ব্যাঙ্কে, আমি বাংলার অধ্যাপক হয়ে কাছাড় কলেজে। নতুন চাকরি আর বিয়েরও ছ'মাস হয়ে গেল। রিণার গায়ে বৃষ্টির ছাট ঘুরিয়ে দিয়ে বলি,

—চলো, একটা হাফ ইয়ার সেলিব্রেট করি হাতিছড়ায়।

—হাতিছড়ায়? কোন দুঃখে? জোড়া পেত্নির পাল্লায় পড়ি আর কী?

রিণার গায়ে প্রেমতলা বাড়ির বৃষ্টির ছাঁট, আর আমি সিক্ত হই হাতিছড়ার ঝমঝম ধারায়। স্মৃতিরা সব থৈ থৈ নেচে বেড়াচ্ছে ছড়ার জলে। রিণার তির্যক কথাকে মান্য করেই বলি,

—এপ্রিলের চার থেকে মে মাসের চার পর্যন্ত বৃষ্টি ছিল ছিয়াত্তর ইংরেজিতে। ব্যাঙ্কের সামনে পিচরাস্তার উপর দিয়ে মস্ত মস্ত কৈ মাছের মিছিল। মঙ্গার তৎপরতায় টুকরি ফেলে ধরা হল গোটা কুড়ি মাছ। প্রথম দিনেই বৌঠানের হাতের কৈ ভোজে মাত হয়ে গেলাম।

—জানতাম কৈ মাছের গল্প বৌঠান দিয়েই শেষ হবে।

—তুমি আর সুহাস দু'জনেই এমন কেন বলো তো? এমন সোজাসাপটা মানুষটাকে সন্দেহ?

—সোজাসাপটা নয়, আমার সন্দেহ চালাক মানুষটাকে নিয়ে। তা সুহাস চৌধুরির স্টোরিটা তো নতুন?

—না, আমি নই গল্পের কেন্দ্রে। সুহাসও একটা অপদার্থ। বৌ ভাল গায়, তাই বৌয়ের গান বন্ধ। বৌঠানের মনে অনেক কষ্ট।

১৩.

সব কথা বলিনি রিণাকে। সুহাসের গল্পে আমি আছি। আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল। মহাসপ্তমীর রাতে মাতাল হয়ে ফিরেছিল। বৌঠানের গায়ে হাত তুলেছিল। গানটান কিছু না। সুহাস ইচ্ছে করে আমাদের একা রেখে গিয়েছিল।

সব কথা রিণাকে বলা যায় না। সমঝোতায় চলতে হয়।

দাম্পত্যের সমঝোতা।

সমাজে থাকতে হলে প্রতি পদে মানিয়ে নিতে হয়।

ভাল লাগে আমার বৌঠানকে, ভাল লাগে জয়াকে। কিন্তু ওদের নিয়ে আমাকে থাকতে দেবে না সমাজ। কারণ আমি রিণার স্বামী।

এক ঘণ্টার দূরত্বে রয়েছে আমার মনের মানুষ; কিন্তু দেখা হবে না জীবনে। দেখা না হয় না-ই হল, রিণার সঙ্গে কেন শেয়ার করা যাবে না সম্পর্ক-কথা?

মনে এক, সম্পর্কে অন্য।

আমি দু'রকম থাকতে চাই না।

মাঝরাতে তাই ঘুমন্ত রিণাকে জড়িয়ে ধরি সজোরে।

রিণা জেগে ওঠে। গভীর আদরে বলি,

—তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না সোনা।

রিণা বুঝেছিল। আক্রমণে যায় নি।

বৌঠানের কথা বলেনি সে-রাতে।

১৪.

মেঘ বৃষ্টির পর আবার শরৎ আসে।

বৌঠান আসে আমার বাড়িতে।

বৌঠানকে দেখে ভাল লাগে।

কমলা রঙের বোঁটায় অজস্র শিউলি ছড়িয়ে পড়ে প্রেমতলা বাড়িতে। প্রাক্তন মনো-ব্যথা ভুলে সুহাসের সঙ্গে আবার নিঃশর্ত বন্ধুত্বে মুখর হই দু'জনে।

বৌঠানের হাসি থেকে সেই দুঃখের পর্দাটা কিছুতেই সরে না।

চুপচাপ বেড়াতে আসার শাস্তি কাটিয়ে চলেও যায়।

সুহাস অনেক কথা বলে, যেমন বলত। বলে,

—তোর জংলীর কাণ্ড জানিস?

—কী করে জানব? গেছি নাকি হাতিছড়ায়?

—না নেই, আর হাতিছড়ায় নেই।

—তবে কোথায়? মঙ্গা বদলি হয়ে গেছে? পার্টটাইমদের তো বদলি হয় না?

—মঙ্গা আছে নতুন ডেপুটির বাহন হয়ে। 'ছিড়িয়া' রাঁধছে।

—বৌঠানের একই ট্র্যাডিশন চলছে? শাক সব্জি তেল কই-এর বাটি? কিছুক্ষণ নিরুত্তর সবাই। আমার পক্ষে দু'জন, ওদের দু'জন। অনেক কথার সমাধান হয় নীরবে। আমিই বলি

আবার,

—বল না রে বাবা। এত হেঁয়ালি করছিস কেন? মেয়েটা তো ভালই ছিল।

—ভাল? ভাল হলে সাদাসিধে ছেলেটাকে ছেড়ে যায়? ওর খুব রূপের দেমাক ছিল। বুধিয়ার সঙ্গে ভেগেছে।

—কে বুধিয়া?

—তুই চিনবি না। বুধবারে জন্ম। পাতিছড়ায় থাকে জংলীর হিরো।

—কিন্তু কেন গেল?

—ওরকম যায় ওদের সমাজে।

অসহায় আমি হঠাৎ করে আমার উৎপাতের পরিচারক মঙ্গালালের সহমর্মী হয়ে যাই। আহা রে! বেচারির নিশ্চয় মনটা ভেঙে গেছে?

বৌঠানের দিকে তাকাই। সুহাসের সব কথা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বৌঠান বলে দিক না, সব মিথ্যে।

বৌঠানও বলে,

—সত্যি। ওদের সমাজে হয়।

—আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে হয় না?

আমার স্বগত কথা বৌঠান শুনেও শুনল না।

শেখর দাস

লস্ট হরাইজন

'চারিখন চহরর আজি দিনটোর তাপমাত্রা আছিল এনে ধরনর—

১) গুয়াহাটি, সর্বোচ্চ ৩৮.৮° সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৯.৩° সেলসিয়াস।

২) ডিব্রুগড়, সর্বোচ্চ ৩৫.৮° সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.১° সেলসিয়াস।

৩) তেজপুর, সর্বোচ্চ ৩৬.০° সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৬° সেলসিয়াস।

৪) শিলচর, সর্বোচ্চ ৪০.১° সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ৩২.৫° সেলসিয়াস।

আবহাওয়াবালা ফিচেল হাসছে, তবে, সোফিস্টিকেটেড।

প্লাজমা টিভি সামনে. পপকর্ন চিবোচ্ছে রিপন চলিহা এমন, বিড়াল পায়রার হাড় চিবোয় যেমন। একটু দূরে, সেন্টার-টেবিলে, একটা স্টিল-গ্রে কাঁচের বোতলে সাতশো পঞ্চাশ মিলি। বোতলে নেশাড়ুদের দাম্ভিক লোভ—নর্থইস্টের মেঘালয়। শিলং থেকে বেশী দূর না—এমন এক হ্যামলেটের, ভীষণ লাভজনক ব্রুয়ারিজের মফ্‌লঙ রাম। মেঘালয়ী আদুরে, শীতার্ত কমলালেবুর রস চোঁয়ানো, বছরে গড়ে সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের প্রায় পাহাড়ী, অথচ ফাইভস্টার লেবেলড্ পানীয়। কড়া, তবু মজাদার ভীষণ। এর সমীপে ভদকা, শ্যাম্পেন, ক্যালিপ্সো—যেন বিশীর্ণ বিধবা।

রিপন চলিহার পাশের ডিভানে তখনও ঘুমন্ত, বা হ্যাঙ-ওভারে লিপ্ত প্রতাপ বরদলৈ। সে চা-কর। ছ'টা টি এস্টেটের অ্যারেঞ্জার নামে-বেনামে। ভীষণ চিন্তিত ছিল দু-চারদিন থেকে। ওর একটা বাগানের সিনিয়র ম্যানেজার ঋষভ কাপুরকে তুলে নিয়ে গেছে আলফা, আজ এগারো দিন। ওরা 'ডিমাণ্ড' ঝেড়েছে পঁয়ত্রিশ লাখ।

২.

—এ ফালে না যাঁও ময়।

—কেন?

—তয় শোনা নাই? না জানে নিকি?

—কী জানবো?

—রাতিপুয়া-এ কে ফোর্টিসেভেনর গার্গল হইছে তাত।

—জানি তো।

—আরু কেইটামান ঘটনা ঘটিছে।

—কী?

—রিমোট কন্ট্রোল-ডিভাইছত্ এক্সপ্লোশন করিলে।

আই ই ডি মানেটো হল,

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলল,

—ইম্প্রোভাইসড্ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। চারিখন এলপিজি সিলিণ্ডার ফটালে ধলাগড়, আমবাড়ি, ফটাসিল, ফাঁসিরবাজার। এগারটার পরা। বুঝিছ নে?

—মরেছে কেউ?

—হয় জানু। লিটল ফ্লাওয়ার কনভেন্টর তিনিটা ছোয়ালি, আরু লরা চারিজন, টমাটোর নিচিনা ফাটি গল। ফোর-ফাইব ক্লাসর হব আরু।

—তুমি দেখেছো।

—কেনেকৈ দেখিম? বডি আইডেন্টিফায়েড হোয়া নাই।

—কেনেকৈ হবৎ মুর-ধড় একো নাই।

—মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেছে?

—তোমার মুরটো গল আরু। বডি টো থাকিলে হে লই যাবো।

আসলে, ফুটপাত ও কালো পিচের সড়ক থেকে পুলিশ যতটা পারে, চেঁচে পুঁছে তুলেছে অবশিষ্ট।

আবার বলল,

—ছাব্বিশে জানুয়ারি, আরু পোন্দরহ আগস্ট, দুটা দিন আতঙ্কর পরিবেশ হই আছে নর্থ ইস্টত।

পিনাক বলল,

—আর কী বলছিলে?

—হুনা।

—কী?

এবার দম নেয় রবিন চেতিয়া। তাকায় এদিক ওদিক, পূর্বদিকে তাকালো এবার—ওখানে কামাখ্যা পাহাড় প্রায় নিঃশেষ। যেন হেলে পড়েছে, ডানদিকে কাত। লোহিতের জলছোঁয়া দিনান্ত সূর্যের শেষতম হিমোগ্লোবিন। আরও দূরে, অনেক দূরে, ভুটানি পাহাড়ে রমনস্ অ্যাফেক্ট।

কোথাও বড় অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা শব্দে, একমুঠো জিলেটিন স্টিকের যথারীতি নির্ঘোষ। কেউ নির্ঘাৎ খাল্লাস হয়েছে।

সুতরাং, আরও কয়েকটা লাশ নিশ্চিতই। নাবার্ডের সঞ্জয় ঘোষকে প্রথমত এ-অঞ্চল থেকেই তুলে নিয়েছিল। একজনকে তুলতে আরেকজন। নাবার্ড বা সঞ্জয় তেমন টার্গেট ছিল না। বিটুইন-দ্য-লাইনস্, কেবল বিটুইন-দ্য-লাইনস্। বোঝা দায়।

দক্ষিণ-পশ্চিমে খাসি-হিলস্‌কে খুবলে, খামচে ছারখার করছে জুমচাষের ধিকি ধিকি আগুন—অতএব, বিতর্কিত নীল নীল ফ্যাকাশে ধোঁয়া। পরশু আবার ডাক ঝেড়েছে অল-খাসি-স্টুডেন্টস ইউনিয়ন—মেঘালয় বন্ধ—আটচল্লিশ ঘন্টা। 'দখার—গেট লস্ট'।

দখার মানেই অ-খাসি। নেপালি, বিহারী, বাঙালী, কেরলি, সবাই।

মেঘালয়ে হরতাল মানে—বরাকভ্যালি, ত্রিপুরা, মিজোরামে মজুতদারের জোর করতাল। ভান দেখাবে এমন—ইস্, কী যে করা? জিনিসের দাম আগুন হবে। কত জনদরদী বৈশ্যকূল নেতা-প্রশাসন সহযোগে। নিবিড় কনফেডারেসি। আমজনতা ইক্ষুর ছিবড়ে। রস নেই। তবু চোষো।

আর, বরাক-বন্ধ মানেই পাহাড়ী প্রদেশ মিজোল্যাণ্ড খট্‌খটে শুঁটকি।

ফুড হ্যাবিট গিরি-অভ্যস্ত বলে সারভাইভ করে অনেকদিন। বাঙালী মিজোরামবাসী হলে পাহাড়-কন্দরে বাঙালীর বিদীর্ণ ভূত ঘুরে বেড়াতো এধার-ওধার। ল্যাদ্-ল্যাদে খাদ্যাভ্যাসে একটা ব্যাপার আছে, যা পাহাড়, মরু ও বরফে অচল।

'বন্ধ' হলেই মিজোরামে জল মানেই 'জম-এ-আব'। মহামূল্যবান। ছোট এক বালতি জল পঁচিশ টাকা। এসিলকের একটা ফয়েলের বিনিময় চল্লিশ টাকায়। আলু প্রতি কেজি পঞ্চাশ টাকা।

বরাক-সুরমাভ্যালির প্রায় একই হাল। বৃষ্টিঝড়ে তো কথাই নেই। ন্যাশনাল হাইওয়ে নম্বর চুয়াল্লিশ পুরোপুরি প্রাগৈতিহাসিক। ধ্বস, অ্যাভালেঞ্চ, সুযোগে বাংলাদেশী পাইরেটদের লুঠমারের তেজি বাজার, আর জি টি মানে—গুণ্ডা ট্যাক্স। সবখানেই নেক্সাস।

সুতরাং, দ্রব্যাদির ফেস ভ্যালু বাতিল। নিজের ঘোষিত দাম। কিনলে কেনো, নইলে কাটো।

আর, এরি মধ্যে, আধা-নগর, আধা-গ্রাম শিলচর বড় বেশি স্বপ্ন দেখে—এই তো, ব্রডগেজ হয়ে যাবে দু-চার বছরে। সমোসার আলু (বিহারে খুব চলে) লালু যাদব টাকা দেবেন

দেদার।

বস্তুত, হাল হকিকৎ এমন—হারেঙ্গাজাও থেকে লামডিং—দীর্ঘ পাহাড়ী পথে এখনই ভিন্টেজ মিটারগেজ। ট্রেন হাঁটে না। দৌড়য় কেঁচো। পথে আরও ভয়—কালাজ্বর (স্বাস্থ্য বিভাগের দাবী—ওটা আর নেই), ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া, আমাশা, পাহাড়ী চর্মরোগ, আর জগৎ-জোড়া যাদের আহ্লাদি নাম সকল সরকারের দেওয়া—ইনসারজেন্ট অ্যাণ্ড মিলিট্যান্ট। দু'টোর মধ্যে আবার শ্রেণী-তারতম্য আছে।

—হোয়াট দ্য হেল। ড্যাম্ ইট।

ইরফানের গলায় বাতাবি লেবুর নির্যাস নয়, বদলে থ্রি-নট-থ্রি ইণ্ডিয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল, আর.ডি.এক্স। রুখাসুখা।

আবার বলল,

—অ্যাট র‍্যাণ্ডম দে ওপেনস্ ফায়ার।

চেতিয়া বলল,

—কুনে?

—ডোন্ট ইউ নো দ্যাট?

—ন হয়। গুলাগুলি আজি-কালি নিউজ আইটেম ন হয়। কুনে গুলিয়াই দিছে?

ইরফান একই রকম গব-গর,

—রাজস্থান কন্‌স্টাবুলারি।

বজ্রনির্ঘোষ ইরফানের গলায়,

—হুনা-হুনা।

—হুম্?

—উই লস্ট দ্য রাইটস্ অব সিডিউলড্ ডিমাইস। যে কেউ, যে কোনও সময় টপকে যাবে। আমরা কোথায় বেঁচে আছি? কীভাবে বেঁচে আছি? ক-দিন বাঁচবো, কেউ জানিনা।

তুষার বলল,

—বাট নর্থ ইস্ট আওয়ার নর্থ ইস্ট। প্রতিমা পাণ্ডে যেন পরাভূত হরাইজানে এখনও গাইছেন—'মরিছে মরিছে শ্যাম/শয়নে স্বপনে তোমার নাম।'

—দ্যাটস্ ইট।

ইরফানের গলায় এবার শুষ্ক মরুর দম্ভ। বলল, আজও অতিথি বাড়িতে গেলে বিদায় বেলায় গৃহস্থ মাখা-মাখা আবেগে বলে দেয়, 'আকৌ আহিবা দে। জোহা চাউলর মিষ্টান্ন খাবলৈ হলে আকৌ বনাই দিম। আহিবা।'

গুয়াহাটি তপ্ত হচ্ছে আবার। যদিও সূর্য নেই। ডাওরিয়া আকাশ, সমাচারের ভাষায়।

মিউজিক হিট। তবু ভালো, ওখানে আইজং চালের পিঠে-পুলি আছে আজও।

তারপর একদিন, একজন অখ্যাত লেখককে কনকমাসি বলেই দিলেন অকপট কোনও দাবিদাওয়াহীন, অথচ মানবিক প্রত্যাশায়,

—তুমি আমার নিচিনা দুখিয়া মানুহর কথা লিখিবা দে।

সময় পুড়ে খাক। দিনযাপনের ভস্ম নিয়ে দিন যায়। আবেগের চির-ভঙ্গুর জীবাশ্ম তুলে আনে কেউ কেউ। দিন গড়ায় দিনের মতো। যেমন গড়ায় ইস্পাতের ওপর ইস্পাতের চাকা। আজব রেলগাড়ি চলে বিরামহীন।

জীবনটা যেন ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়েজ, পুরাতন, অচল। তবু, সচল। এমনি এখানে-ও।

কী দরকার ছিল ভুটানে ক্র্যাক্‌ডাউন করানোর?

কামটো বেয়া হল। ভিমরুলের মতো ছিতরে গেছে গোটা আসামে। চরকারর মুরটো গুলাই গইছে নিকি? আরে এটা হল বাংলাদেশ। ঘরজামাই বানিয়ে রেখেছে পরেশকে। দিল্লি-চরকারর ব্রেনটু বেলেগ। নহয় জাঁনো।

পিনাক স্বল্প হাসে। বলল,

—বিটুইন-দ্য-লাইনস্ পড়ে ফেলা কি এতোই সোজা?

ইরফান নমনীয় ইউক্যালিপটাস নয়। রীতিমত টান টান সাফারি। বলল,

—বিটুইন-দ্য-লাইনস্, মাই ফুট। অল নেক্সাস।

নদীর বিস্তার জুড়ে ধবল চিলনী। পাশের কোঠালিতে মূর্ত সি.ডি—'দিল দে দিয়া হ্যায়/জান তুঝে দেঙ্গে/দাগা নেহী করেঙ্গে সনম/রব্ দী কসম ইয়ারা. রব্ দী কসম ...'

ব্রহ্মপুত্রের জলে বিতর্কিত ঢেউ, তির তির। সমস্ত বিস্তার জুড়ে স্বল্পায়ু ভুটানি হাওয়া। পুবে, ইলিশ-রঙা শরাইঘাট সেতু। নদীর বুক-জোড়া উমানন্দ-হিলক্।

প্রাগজ্যোতিষপুর স্টেশন এই মাত্র পেরিয়ে গেল আবাদ আসাম।

খানাপাড়া, হেঙ্গরাবাড়ি, কলোনিবাজার, লখড়ামোড়, কলোনিবাজারের আকাশে অকর্মণ্য শৌখিন মেঘ।

কামাখ্যায় নিত্যনৈমিত্তিক ভক্ত-স্রোত। কয়েকবছর আগে, ওখানে পুজো-ফুজো দিয়ে গেছেন গ্ল্যামার সি.এম বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। কপালজুড়ে রক্তচন্দন।

প্রচলন আছে, পাহাড়ের মাথায় পশুবলি, আর, সমতলের নরবলির শ্রেণীচরিত্র ভিন্নতর। ছাগ-ভেড়া-মোষ—মেন্ট টু-বি স্লটারড।

কিন্তু, সাতবছরের পারিজাত বরুয়া, এগারো বছরের আবদুর রহমান, সাড়ে চার বছরের ঝিনি চাওলা, চোদ্দ বছরের অনিকেত সেন, আটাত্তর বছরের নলিন ডেকা, ছেষট্টি বছরের গোবিন পিল্লাই, বত্রিশ-তেত্রিশের রিক্সাওয়ালা সুখনলাল—এদের বিড়ম্বিত শবদেহ?

একেকটি মৃত্যুর হিন্টারল্যাণ্ড জুড়ে কতোই না তুচ্ছ উপাখ্যান। কে এতো খবর নেয়।

যে কোনও দৈনিকের প্রথম পাতায় কিছুটা, পঞ্চম পাতায় সচিত্র সংবাদ-সহ আশ্বাসবাণী ছেলে দিল—'উজান অসমর নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো আরু কটকটিয়া করা হল। সিক্যুরিটি ইজ বিফড় আপ ইন ইনসারজেন্সি প্রোনড এরিয়া অব আপার আসাম।'

এরপরও বেসুমার বিহারী মরে। কলকাতা-মুম্বাই-চেন্নাই-দিল্লি মনে করে—এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হোক। অগণিত আমজনতার মনে দ্বিধাহীন প্রশ্ন উত্থিত হয়—বঙাল খেদায় বাঙালী, দখার খেদায় নেপালিদের কেন অস্ত্র দেয়া হল না?

দক্ষিণে শস্ত্র দেওয়া হল নকশাল রুখতে। এ বড় মারণ-পর্বের ফর্মুলা প্রশ্ন উপরওয়ালার সেনাইল টকিং।

সুতরাং, ইরফানকে বলতেই হয়—ইউনিয়ন সরকারের মাথাটা চিবোতে চিবোতে ফাইভ স্টার আই-কিউ ফেইল। খালি ব্যাক, একটার পর একটা অধ্যায়।

ওদিকে কলকাতায়, আলট্রাদের সেফ হাইড-আউট। উচ্চমানের চিকিৎসার জন্যে বিলাস করে ওই নগর। শুধু কলকাতা কেন? চেন্নাই, বাঙ্গালোর, মুম্বই। চারখানা মহানগরে কিছু কিছু নার্সিংহোমের তুঙ্গে বৃহস্পতি। রমরমা কারবার। হটমানির ট্রাফিক।

চা-বাগিচার স্টেশন ওয়াগনের পেট্রল-ট্যাঙ্কে আগুন দিয়েছিল ওরা সন্ধেয়।

ভল্‌কা-ভল্‌কা জুঁই দেখেছিল লেবার লাইনের চরণ বাগদি। ওকে ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। তবে বলে দিয়েছিল,

—এ কেলা, শুনাছুন। লই গইছু মেনেজারক। কই দিবি, টকা নি দিলে তহতর মেনেজারর মুখটো পঠাই দিম বাকচত্ ভরি। হাবি মানুহক গুলিয়াই দিম। বুঝিছা, নে নাই? এতিয়া ভাগ্, কুকুর-পোয়ালি!

চরণ ফিরে এসেছিল। খবর দিয়েছে বাগানে যথারীতি। বলেছে সবাইকে চেঁচামেচির স্বরে,

—তুলি লিছে গো সাহেবটাকে। হপ্তার দরমাঠু বন্ধ হই যাবো। টকা কুনে দিবো। চল চল, অটায়ে যাম সাহেবটুকে ফিরৎ আনিব লই। এ খুড়া, কী ভাবিছ তুমি। শালা, হাম্‌দের বাগান, আর উদের ফুটানি।

লুটেরার দল ওদের 'ফুটানি'র প্রতিষ্ঠা বাঁচিয়েছে। সোর্স—কারবাইন, এ.কে ৪৭, এক.কে ৫৬। ইমপ্রোভাইজড় ডিভাইস, এলপিজি সিলিণ্ডার, এতে খরচাপাতি অনেক কম।

এফেক্ট—প্রত্যাশানুযায়ী।

এই বাগানের কর্পোরেট অফিস কলকাতায়। মূল মালিক থাইল্যাণ্ডে। জানাল—'নো র‍্যান্‌সম্ মানি। রিজন—অ্যামাউন্ট ইজ এক্সোরবিটেন্ট। কনট্যাক্ট রাখো। চলুক। পাঁচ বা সাতে নামাও। পেটি ম্যানেজারের কাঞ্চনমূল্য এতো হয় না। মার্কেট রেট আরও কম। যদিও নির্দিষ্ট কোনো ফেস্-ভ্যালু নেই। অ্যানিওয়ে, কীপ মি পোস্টেড।'

থাইল্যাণ্ড ডি-লিঙ্কড্ হয়ে যায় স্বভাবতই। ওদের অন্তর্জাল গ্লোবালি। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো যায়। টাইম-মেশিন চলছে গ্লোবাল নেটওয়ার্কে। কত্তো অ্যাসাইনমেন্ট। সময় কোথায়?

ওদিকে, বাংলোর নিরিবিলি বারান্দায় শেষরাত অব্দি দাঁড়িয়ে আছে অপহৃতের স্ত্রী ও ফুটফুটে মেয়ে মর্মভেদী প্রতীক্ষায় ভোররাত অবধি।

সিটিঙের সেন্টার টেবিলে নীলচে ফোনটাও চিরকাঙ্ক্ষিত অপেক্ষায়। বাজে না।

সাঞ্চারীরও একই হাল। কেবল এস.এম.এস, বিজ্ঞাপনী—'আপনার পছন্দের হিট নাম্বারের জন্যে কী-বোর্ড পাঞ্চ করুন। আলিশা চিনয়, সোনু নিগম গান শোনাবে।'

কলকাতার সেবাপরায়ণ ছেলে সঞ্জয় ঘোষকে, প্রায় একশো সতেরো কিলোমিটার দূরের কোনও অজ্ঞাত বালিয়াড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। লাশ আইডেন্টিফায়েড হল না আজও।

পুলিশ, কম্বাইণ্ড ফোর্সের দিনলিপিতে এখনও বিরাজমান এত ভয়ঙ্কর শব্দ—মিসিং।

প্রত্যেকের দোরে-দোরে সঞ্জয়ের বিপন্ন বিধবার (!) নিষ্ফল আবেদন—'খুঁজে আনুন ওঁকে।'

নিটফল—নেতা-মহানেতার প্যাটেন্ট আশ্বাসের বদ্‌বু। আর কিছু করার নেই এদের। ক্ষমতাও নেই।

প্রতিবার কি কান্দাহার এপিসোড সম্ভব? গ্রিশেঙ্কোর ব্যাপারটাও প্রায় একইরকম।

পিস্-পিস্ করে কেটে ডিহিং নদীর জলে। উজান আসামের নদীতে রাশিয়ার নিরিবিলি রুধির। সুতরাং, সিডিউলড্ ডিমাইস অর্থহীন। ওটা আর নেই।

এখন স্বয়ং বারুদ থেকে চুঁইয়ে পড়ে হিমোগ্লোবিন, যারা কোনও কিছুতে নেই, এমন অসংখ্য মানুষের।

চলিহা বলল,

—জানো?

নরোত্তম কাকতি জিজ্ঞেস করল,

—কী?

—গুলিয়াই দিলে।

—কুনে?

—আলফার নাম লই কেইটামান লরা।

—জানো ময়। উলটা মারিছে রেজিমেন্টর অ্যাসল্ট রাইফেল। তে মাখি গছর পাত রক্ষা হই গল।

—হয়। হুনিছু।

নরোত্তম বলল,

—এটা কথা হুনিলু।

—কী?

—রেপ্ করিলে দুটা ছোয়ালিক। গুজব হব পারে।

পপ-কর্ন চিবোনো চলিহা বলল,

—মনোরমার সিংহর সিকোয়েন্স নিকি?

উত্তেজিত হল এবার নরোত্তম। বলল,

—এ কেলা, এইখিনি মণিপুর ন-হয়। অসম। অসমর গাভরু বিলাক বেলেগ। জুঁই জ্বলিব। পুড়ি ধুড়ি ছারখান হই যাবো স্বর্ণিম চতুর্ভুজর মেরা ভারত মহান।

চলিহা বলল,

—রব রব। কুলডাউন। গুজব, গুজব, গুজব। একটানা মনগড়ন গুজব চলে শ্রান্তিবিহীন। এসবে কারও কোনও শ্রান্তি নেই।

বিকেল। আকাশে বড়ঝাড় দমদমের শেষ উড়ান—এ-টি-আর। দমদম ছুঁতে সন্ধে হবে। ওখানে কোনওমতে নাইট-ল্যান্ডিং হয়। রান-ওয়ের দু'পাশে জ্বলজ্বলে দু-ফালি আলোর মালা ছড়ানো থাকে। মুক্তোর দানা।

এখানে আকাশে ফাটা ফাটা মেঘ। মেঘের সংসার ঘেঁষে একটা দলছুট ধনের আর ভিন্ন পাখপাখালি। পশ্চিম আকাশজুড়ে দিন-নিঙড়ানো আপাত অন্তিম সূর্যের প্লাজমা আলো।

নর্থ ইস্ট শরাইঘাটে উঠেছে। একের পর এক পাইলন পেরিয়ে যায়—দড়াম, দড়াম, দড়াম-দড়াম, দড়াম। ডিজেল লোকোয় শঙ্খ-ধ্বনি। সন্ধে হচ্ছে।

ওরা সেঁকা তিতির পাখি চিবোতে চিবোতে বলল,

—আমাদের শত্রু কে? বেরঙের পুলিশ, না-আলট্রা? নাকি ওদেরই নেক্সাস?

—কুনে জানে? চার নিলাম কবে? ডেট পড়েছে?

—জানিনা। এবার সিন্ডিকেট যাবে। ওরা কমাণ্ড আর কন্ট্রোল নেবে। রাজস্থান-হরিয়ানার লবি খুব স্ট্রং।

সময় আরও পেরিয়ে যায়। চাংসারিতে ক্রসিং নিয়ে অসময়ে, অথচ দাপটে ছুটে আসছে তথাকথিত কুলীন রাজধানী। কী কী বার্তা বয়ে আনল রাজধানী সহ সম্রাটকুলের—কেউ জানেনা।

দু'জনেই এখন মফ্‌লঙী। পুরো বোতল ব্যাংক্রাপট।

চলিহা বলল,

—দু-একদিনের মধ্যে কারফিউ ইম্পোজড্ হবে, মনে হয়। প্রায় জেনোসাইড শুরু হয়ে গেছে। সব সিভিলিয়ান গান পাবে। সমোসার আলু আকৌ গিমিক দেখাব নহয় জাঁনো।

নিবিড় দোসর বলল জড়-জড় স্বরে—হয়, হয়। বিহারী তেজমাখা নির্বাচনী ট্র্যাম্প-কাড' উলাব পাছত্। এনক্যাশ করিব। ওহ্ শিট্। পাবলিক বকরি নেহি হ্যায়। শালা, বাঞ্চোৎ।

আরও কিছুসময় এরা সবুজে নীলে ডুমো মাছির মতো ভ্যান-ভ্যান করে।

টিভিল ফ্ল্যাট-স্ক্রিনে ঐশ্বর্য রাই—'নিম্বুরা রে নিম্বুরা ...'

৩.

এক আমরা-আঁতেল-কাম-কবি একটা গ্রন্থে লিখে অ্যামেচারিজম্ করেছে—'মাই ফ্রোজেন মোমেন্টস্ ইন নর্থ-ইস্ট এণ্ড ইটস্ পোল্ট স্টেজ।'

হাস্যকর। এখনও প্রক্রিয়াটি চলছে। অথচ হাইপ্রোফাইল লেখক চলে গেছে স্টেজে। বউ-ছাড়া বউ-ভাত।

বইটা পড়ে আছে ওয়াল সেল্ফের র‍্যাকে। অপহৃত ঋষভ কাপুরের কক্ষে।

সচিত্র খবর বেরিয়েছে ঋষভের। বয়স ৩৮/৩৯। ভালিণ্ডার লোক। পড়াশোনা দিল্লির রামজস কলেজে। পরিবারের সবাই থাকে ময়ূরবিহারে।

স্ত্রী, অনামিকা কাপুর। মিরাণ্ডা হাউসে বৈদিক সাহিত্য পড়ায়। ভীষণ সুশ্রী। বয়স ৩৩/৩৪।

সাতবছরের একটা মেয়ে আছে। শকুন্তলা। ডাক নাম—তিন্নি। দিল্লি পাবলিক স্কুলে পড়ে। ওখানে গান গায় সুরেলা—'হম হোঙ্গে কাময়াব, হাম হোঙ্গে কামিয়াব/এক দিন ...'

চরণ বাগদি জানত—সাহিব সময় পেলে সন্ধের একটু পর, বাংলোর লনে, লন চেয়ারে বসে ম্যাণ্ডোলিন বাজাত। ছুটিছাটায় মেমসাহিব আর ওদের মেয়ে এখানে চলে আসত। পনেরো কুড়ি দিন কেটে যেত ফুরফুরে হাওয়ার মতো।

মেমসাহিব, অর্থাৎ অনামিকা গাইত নির্মল দরাজ গলায়—'তু নেহি তো জিন্দেগী মে/ঔর ক্যা রহ যায়গা/অর দূর তক্ তনহাইয়োঁ কা সিলসিলা যায়েগা ...'

এন-এস-ডি-তে নাটক করত অনামিকা। ঋষভের সাথে ওখানেই পরিচয়। এতো অনুপুঙ্খ চরণ জানে না।

কখনও কখনও অনামিকা উন্মুখ হত গানে। বনানী অন্ধকারও মুগ্ধ হয়ে যেত।

তিন্নি লনের ডেকচেয়ারে দোল দিত।

পোর্সিলিন ডিশে রকমারি খাবার নিয়ে আসত চরণ। লনের মার্কারি ভেপার নিবিয়ে দেওয়া হত। আকাশে কাশফুলী মেঘ আর মহাকাশের নিকটতম কুটুম্ব জ্যোতিষ্ক প্রায় আসত পূর্ণিমার চাঁদ। কি অনাবিল বিকিরণ!

ঋষভ বলত,

—পরশুর ফ্লাইট ক্যানসেল্ড হলে ভাল, কী বল?

লেনের অন্যপ্রান্তে হেঁটে বেড়ানো অনামিকা বলত,

—ওহ্ গড। প্রবলেম হয়ে যাবে। থার্ড সেমেস্টার শুরু হবে নেক্সট ফ্রাইডে। আই মাস্ট সেট আউট ফর দেহলি, ডে আফটার টুমরো।

—কেন, বোর লাগছে?

—কাম-অন।

—থাকো না আরও দু'টো দিন।

চায়ে চুমুক দিয়ে অনামিকা বলত,

—ফাইন। থ্যাঙ্কু চরণ। বহুৎ বড়িয়া চায় বনাতে হো তুম।

ঋষভ বলত,

—চরণের কোনও কেরামতি নেই মাম। ওটা আমাদের প্রেসেসিং-এর কারিকুরি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

—ওকে ওকে। শোনো না, চলো আমাদের সাথে।

—কাঁহা?

অনামিকার কপালে স্বল্প বিরক্তির কুঞ্চন, বলল,

—হোয়াট ডু ইউ মীন বাই কাঁহা?

—এখন হবে না যাওয়া। পীক্-সিজন চলছে, ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্যাট? এবার টার্গেটের হাইরাইজ।

—থাক তোমার হাইরাইজ। তিন্নি কী ভীষণ মিস্ করবে তোমাকে, জানো? আর আমি? থাক্ ওসব কথা।

এবার তিন্নি প্রায় লাফিয়ে বসেছে বাপের কোলে, বলল,

—পাপা।

—ইয়েস বেটা।

—আপ চলোনা হমারে সাথ।

—অভী মুম্‌কিন নহী বেটা।

—পাপা!

মেয়েকে বুকে জড়াত ঋষভ। চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে দুটো হাত ঋষভের দুই কাঁধে রাখত অনামিকা। কোনও কথা হত না। অরণ্যে যেন নিশাচর পাখির ডাক। ঝিঁঝির শব্দ। আরণ্যক রাতের নিজস্ব ধ্বনিসহ বেমিশাল জ্যোৎস্না। একে বলে জুনেইদ।

একসময় তিন্নি বলত,

—পাপা, কব্ আওগে দিল্লি?

ঋষভ সান্ত্বনা দিত,

—জব তুম্‌হারা একজাম চলেগা না বেটা, তব্ ম্যায় তুমলোগোকে পাস রহুঙ্গা জরুর।

—প্রমিস?

—ইয়েস।

—ডান?

—ডান।

অনামিকার চোখে বিষণ্ণতার জ্যোৎস্না। ঋষভের মাথায় থুতনি স্থাপিত করে পেছন থেকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে আনল দু-বাহুতে।

—তিন্নি আর কদ্দিন একা একা থাকবে বল তো?

ঋষভ বলল,

—একা কেন? তুমি তো আছ। তুমি নেই?

—ওহ্ গড! মাথায় প্ল্যান্টেশন ছাড়া কিছু নেই তোমার?

তারপর ঋষভের কানে পুরো ওষ্ঠ প্রায় প্রবিষ্ট করিয়ে ফিস্‌ফিস করল,

—আই লাইক আ বেবি বয়। উড ইউ প্লীজ। আই নিড হিম।

তখন তিন্নি কোল ছেড়ে জোনাকির পেছনে ছোটাছুটি করছে লনের দক্ষিণ প্রান্তে গামাই গাছের তলায়।

ঋষভ অনামিকাকে টেনে আনল সামনে। অনামিকার সুচারু কোমর দু'হাতে জড়িয়ে, মুখ গুঁজে দিল বুকের নিবিড় কন্দরে। বলল অনামিকার মতই,

—মুঝে ভি এক বেটা চাহিয়ে অনুজি। দোগী না?

ঋষভের ঠোঁটে হালকা চুম্বন এঁকে অনামিকা বলল থরথরে গলায়,

—এক নেহি, পুরা এক দর্জন। ব্যাটালিয়ান বলো।

এরপর কন্যা ও সহধর্মিণীর অনুরোধে ঋষভ গাইত,

—'হম সফর বনতে হম/সাথ হ্যাঁয় আজ ভি/
ফির ভি হ্যায় ইয়ে সফর/অজনবি, অজনবি ... ...।'

ঋষভের অবারিত কণ্ঠে অবাক হয়ে যেত চরণ কোনও কোনও দিন। হামার সাহিব টিভির মত গায়। ভাত মারবে কুমার শানুর জরুর।

৪.

সাতাশ দিন পর ঋষভের মুণ্ডুহীন ধড় পাওয়া গেল লুংছুং ফাঁড়ির দিবং খালের পাশে। মাথাটা আর পাওয়া যায়নি।

স্বভাবতই বাংলোর লনে ম্যাণ্ডোলিন আর বাজেনি। চরণের সাহিবের গান আর শোনা হয়নি।

ময়ুর-বিহারের এক ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটে গুটিকয়েক পরিজনসহ অনামিকা—তিন্নি।

ওরা কাল ভোরের ফ্লাইটে গুয়াহাটি যাবে ঋষভের নিষ্প্রাণ ধড় আনতে। এর মধ্যে যদি মস্তক খুঁজে পাওয়া যায়, কোম্পানি দূরভাষে জানিয়েছে—তিন লাখ দেওয়া হবে মুহাফজা। আর অফিসিয়াল সমবেদনা।

ট্রাঙ্কুলাইজারে রাখা হয়েছে অনামিকাকে।

তিন্নি এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি এখনও। মরুর শুষ্কতা চুরি করে এনেছে ওর দুটো চোখ। ব্যালকনির রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। জলও খায় না। ঘুমোয় না। কাঁদতে কাঁদতে ওর পিসি ঝাঁকানি দিয়ে বলেছে—

'রো লে বেটে, থোড়া রো লে। এ তিন্নি! হায় রাব্বা!'

তিন্নি কাঁদেনি। সবাই বলেছে—মেয়েটা ভীষণ শক্ত। মায়া-মমতা কম।

আসলে, তা নয়। তিন্নি বুকের ভেতর অন্য বুক চৌচির হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে, বিড় বিড় করে নিঃশব্দে, যা কেউ শোনে না,

—পাপা, মেরা একজাম শুরু হোনেওয়ালা হ্যায়। আপ লওট আও পাপা। পাপা, আমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। তুমি ফিরে এস পাপা, ফিরে এস! মা'র এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তুমি না এলে আর ফিরবে না। আমি পুরো একা হয়ে যাব। তুমি ফিরে এস। মেরা একজাম শুরু হোনে কো হ্যায়। তুমি ফিরে এস। আমি তোমার পথ চেয়ে আছি। আর কোনোদিন ক্যাডবেরিস চাইব না। প্রমিস। তুম চলে আও জলদি। মেরে পাপা!

'মিল্টনের 'Lost Horizon' নয়, এ ভিন্ন 'Lost Horizon'।

শেখর দাশ

পরিব্রজন

মালাবার হিলের টিন্‌সেল আলোর আভা, আর তোমার চোখের তারার কি একই প্রভা সুনয়না ভাবেজা?

তোমার কি আবেগ নেই? আছে, ভীষণভাবে আছে। গত সন্ধেয় মাহিম পয়েন্টের ক্যালিপ্সো রেস্তরাঁয় ক্যান্ডেললাইটের নিবিড়তার সাক্ষ্যে কপোত-কপোতীর মূর্চ্ছনায় কেন বলেছিলে তুমি,—কুড়ি বছর আগে যদি দেখা হত দু'জনে? এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?

এরপরই দেখি—যা এতটা আকস্মিক নয় আমার কাছে; তোমার আবেগে ব্যাক্‌বে-র জলোচ্ছ্বাস।

তুমি জানো সুনয়না? সেপ্টেম্বরে এ-সময়ে এডেনের উপকূল থেকে পরিযায়ী হাওয়া ছুটে আসে তোমাদের মালাবার উপকূলে?

এমন হাওয়ার ভরসায়ই তো সহস্র বছর আগে, সুদূর পারস্য থেকে পালতোলা সমুদ্রপোতে ঊর্মিমালা চিরে, কিছু সন্ত্রস্ত পারসিক এসেছিল। যারা আজ এই খণ্ডিত উপকূলে মজ্জাগত হয়ে গেছে এতদিনে। এরা সহজাত যাযাবর ছিল না কোনোদিন।

একদার গ্রাম্যবন্দর, যা আজ মহানগর হল—-এর বুনিয়াদ প্রোথিত করেছিল পার্সিরা—তথ্যটা সবাই জানে।

আসলে, বাতাস ও গুটিকয়েক মানুষ ভবঘুরে থেকে যায় চিরকাল। ঘরের অভিধা যে ওদের ভিন্নতর।

আমি তেমন কোনো পরিযায়ী পারসিক নই গো পশ্চিমকূলবর্তিনী। তাই মনে মনে বলা—তুম্‌হারী জজ্‌বাঁত তুম্‌হে মুবারক। থ্যাঙ্কস্।

অবশ্য শব্দময় হাসিতে বললাম—ছিলাম তো এদিক-ওদিক।

অথচ, তোমার সাথে সরাসরি পরিচয়ের আজ মাত্র দিবস তেতাল্লিশ। ফোনালাপ, ফোনাচার, ই-মেল এসব বাদ দাও।

তুমি তো জীবনানন্দ পড়োনি সুনয়না আমি জানি, নামও শোনোনি। তবু, কীভাবে এমন কাব্যিক দ্যোতনায় বললে—এতদিন কোথায় ছিলে?

বনলতা সেনের বিপরীত লিঙ্গ ও বিপরীত মেরুর আমি, তুমি জানো তা। আবেগেরও লিঙ্গভেদ আছে—এত সংবেদনশীল হয়েও এই সহজ বাখান বোঝো না?

আর বয়স? বলছিলে তোমার চল্লিশ ছুঁয়েছে। আমি কত জানো? আটচল্লিশখানা শরৎ শীত অতিষ্ঠ করেছে।

তুমি বলেছিলে—অনুভবের কোনো বয়স নেই।

আমি বলেছিলাম—অনুভব যদি ইতিহাসে রূপান্তরিত না হয়, তবে এ অনুভবের মহিমাই বা কী?

তোমার উদ্বেল দৃষ্টি অবনত হয়েছিল তখন। ক্ষুণ্ণ হয়েছিলে, আমি জানি।

অথচ, আবোল-তাবোল বা ভিন্ন ব্যঞ্জনায় বলা যায়—তোমার সাথে প্রথম সামনাসামনি পরিচয় গত সেপ্টেম্বরের এক মেঘলা প্রত্যুষে। বারবার পরিশীলিত উচ্চারণে ক্ষমা যাচ্ঞা করছিলে,—Please, don't mind, Please.

আমার নির্লিপ্ত প্রশ্ন—হোয়াট ফর?

—তোমার আভিজাত্যসহ আবার মার্জিত বিনয়,—আই থট্, ইট ইজ নট ওয়াইজ টু ডিসটার্ব ইউ রাইট নাও, সো ...'

তোমার কথা কেটে সব হৃদয়ঙ্গম করেও অযৌক্তিক বিস্ময়ে বলেছিলাম,—হোয়াই? হোয়াট ডু ইউ মীন?

চোখের পল্লব নিমীলিত হয়েছিল তোমার। তুমি বলেছিলে স্মিত হেসে, ইয়েস, আই মীন ইট।

তোমার চোখে তখন আরব-দরিয়ার চিরনির্ভরসীল অ্যালবাট্রাস। তোমার কফিরং চুলের উদ্বেলতা সমুদ্রকে পরাস্ত করেছিল সেদিন। দুই ওষ্ঠে প্রাচীনতম সেই গোলাপ পাপড়ির দাম্ভিক ঐশ্বর্য, তবু খুব সলাজ-সুচারু।

ঝকঝকে দাঁত ঠোঁট ও চিবুকের তিল সহযোগে মৃদু হাসি। দৃষ্টিতে নাবিক-দোসর সেই বিশাল পাখির ডানার ভরাট ব্যাপ্তি।

সুনয়না, নারীর দলই কি পুরুষের রতিক্রিয়া ও কাব্যপ্রক্রিয়ার সর্বশেষ ইনগ্রেডিয়েন্ট?

'আমি কাব্য বুঝি না, জানো গো নারী? কে-কোনো ফিল্ড গানের নির্ঘোষ আমার পূর্বসূরী। সুতরাং, এতদিন কোথায় ছিলাম—সহজেই অনুমেয়। সশব্দে, যাতে শুনতে পাও, (মনে মনে বলা সব কথা তো শোনাতে নেই) তাই শোনাবার মতো বলেছিলাম,—কী বলতে চাও?

তখন, আরবসাগরের জল ক্রমান্বয়ে ছোটো হয়ে যাওয়া, চন্দ্রশেখর'স্ লিমিট-এর পূর্বাভাস নিয়ে সূর্য নামক তেজকে ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার করে পুরোপুরি ভিজিয়ে দিয়েছে নোনা জলে। জলে লাল। পূর্ব-আকাশ কৃষ্ণনীল।

এমনি আলো আছে, আলো নেই অস্থিরতায়, দক্ষিণ-পশ্চিমের মরশুমি, ভেজা শ্রান্ত হাওয়ার সাথে যুগলবন্দি হয়ে তুমি। বললে,—ইট ওয়াজ হাই টাইম, ইউ নো?

কপালের চুল সরিয়ে আবার বলেছিলে,—মেহতাব্ আর প্যাটেলকে সব দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে কোনো অসুবিধে হয়নি, আই থিংক?

আমি চুপ। তুমি আবার বললে,—প্লিজ ফরগিভ মি। ইট ওয়াজ হাই টাইম।

মনস্কামে সন্দর্ভ যাই হোক, বিতণ্ডার অর্থহীনতা এড়িয়ে বললাম,—ওয়েল সেইড। হাই টাইম। ইয়েস, অ্যাবসোলিউটলি হাই টাইম ফর আস্।

ক্যাফে প্যারেড এনক্লেভে শ্যু-শাইন-গার্ল। এমন অনেককে প্রায়ই দেখা যায়। বয়স চোদ্দ-পনেরো। এখন যে, এর হাইট পাঁচ-পাঁচ। শরীর-মহালক্ষ্মী রেসকোর্সের দামাল ঘোটকী। বাদবাকি সবকিছু, দেহ লেপটে, ছন্নছাড়া ধারাবী গ্রাম। মহা বিপন্ন। পকেটে পকেটে সেলফোন, স্টাডিতে কমপিউটারের অরণ্য। কিন্তু, সবার বস্ত্র পর্যাপ্ত নয় এই টিনসেল-টাউনে। রিল্যায়েন্সরা এখন বস্ত্র বানায় কম। ইনফোটেক আর পেট্রোকেমিক্যাল্সে বেশি নজর। লাভ ও খ্যাতি কোন্টায় বেশি? কেবল বাটখারা আর পরিমাপ। তথাকথিত কল্যাণকামী রাষ্ট্রশক্তি মাসতুতো ভাই। এনআরআই বানায় হোটেল, মাল্টিপ্লেক্স সহ ডিজনিল্যাণ্ড। ইস্‌রো বানায় এসএলভি সহ লাঞ্চিংপ্যাড। আর্মি অর্ডিন্যান্স বানায় অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাঙ্ক, মারুতি বানায় দশ ধরণের আদুরে শকট।

ওই মেয়েটার বস্ত্র কে বানাবে? এখন কি সবকিছু নিরাবরণ বা বিবস্ত্রীকরণের টেকনোলজি? আর অস্থির মস্তিষ্কের বাজার অর্থনীতি? সেনসেক্স ইনডেক্স, সুদূরের ওয়াল স্ট্রিট, এখানে দালাল স্ট্রিট। সবখানেই একই কুচকাওয়াজ—হর মোর্চে মে বিলকুল নাঙ্গা যানা হ্যায়। সিয়াসত্ সে তিজৌরী। কিম্বা, তিজৌরী সে সিয়াসত্।

কিন্তু, মেয়েটার সদ্য-প্রতিভাত স্তনযুগলের কোলের পাশের জামার সেলাই প্রায় ফেঁসে গেছে। সুডৌল উরু ঢেকে মাত্র তিন চার ইঞ্চি নামানো ওর জঙলা ছাপ জামা। আর, দুটো স্থানেই অসংখ্য বিষধরের বেনিয়মের ছোবল। মানুষের চোখ।

উপমহাদেশের বাইশ কোটি লোকের ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় ইসি বা ইউরোপিয়ান কমপিউটার যে-কোনে দেশের ক্রেতার, ফকিরের চেয়ে কিছুটা ভালো। এদিকে বলে ডিপ্রেশন চলছে।

ডিফ্লেশন আর ডি-ইনফ্লেশন কি এক হল?

যেখানে যা খুশি হোক, এই মেয়েটার শরীর জুড়ে বস্ত্র-স্ফীতির যে বড়ই প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদ্‌দের মুখে সেদ্ধ শাকালু, নুনবিহীন সেদ্ধ কাঁচকলা তেতো পেঁপে সহযোগে। তবেই না বুঝবে ভালো, মার্কেট ইকনমির হিন্টারল্যাণ্ডে শ্যু-শাইন গার্লরূপী উত্তপ্ত কিশোরীর বিদীর্ণ অবস্থান।

বস্ত্র যদি এত মহার্ঘ, তো এই কিশোরীর দেহে কেন এত আহ্বানের আয়োজন?

আমি তথাকথিত হিউম্যান-স্টোরি প্রোকিউরার। ধর্ষিত কোনো কিশোরীর নিষ্প্রাণ দেহ, বরফের স্লো-ডিউনে করিনা কাপুর-প্রীতি জিন্টার পেলভিক্ উল্লাস, সৌরভ-শচীনের বেতালা ছক্কা—এসবই আমাদের মনোরঞ্জনী মুখর 'হিট লিস্ট', সমান উত্তেজক। সুতরাং ক্যাফে প্যারেডের ঔজ্জ্বল্যে, এগারো লাখের শকটের পাওয়ার কন্ট্রোলড্ উইণ্ডশীল্ড নামিয়ে, গবাক্ষপথে গলা বাড়িয়ে ডায়নোসর সচেতনতায় যখন ওকে ডাকি—এ লড়কি। সুনো। ইধর আও।

ও তখন ঘুরে দাঁড়ায়। ওর কাঁধের ট্রের খোপে খোপে দামি পাদুকা পালিশের উপাচার। দশ আঙুলে লাল ও কালো কালির ছাপ: শরীরে সে তো মোটেই কিশোরী নেই আর। পুরুষের আদিম দাবানলসহ লকলক জিহ্বা চেটেপুটে নেবেই।

ওর দু-চোখে আগুন ও ঘৃণার বিচ্ছুরণ। বলল মরুভূমির রুক্ষতায়—কায় ঝালে? (কী হয়েছে?)

—ইধর আও।

কিশোরীর মেজাজে তখন জং-ধরা খড়্গ। বলল,—খালিপিলি কাহেকাওয়াস্তে বুলাতা তুম? গান্দা আদমী! হ্যাৎ। দেবা-রে-দেবা। লাইন কা সমঝা ক্যা? রৌকড়া দিখাতা হারামী?

একমুখ থুথু ছিটিয়ে সরে গেল সর্বগ্রাসী ভিড়ে। মেট্রোপলিস সব খায়।

বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী সবাই টিফিন—

—রেসিপি মেগাসিটির।

আর আমি? গাড়ির আদুরে সিটে নয়, ধারাবী বস্তির নিকৃষ্ট নর্দমায় তলিয়ে গেছি পুরোপুরি। এত তলায় যে মনে হয়—অ্যানফ্যাদোমিক। ভুল ধিকৃত হই। অথচ কিশোরী সম্পূর্ণ নির্দোষ। লব্ধজ্ঞান ওকে এমন একচক্ষু হরিণী করেছে।

মেয়েটাকে বোঝানোর অছিলায় নিজেকে সান্ত্বনা দিই—তোর দোষ নেই রে মেয়ে। তোর পূর্বজ্ঞান এমন রুক্ষ মরু-মরু করেছে তোকে।

আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—এই জনপদের সবচেয়ে মূল্যবান জামা তুই পছন্দ করে নে। আমার সামর্থ্যের বাইরেও তোকে কিনে দেব। তোর এই পরিধানে—জগৎ-সংসারের

যে কোনো কিশোরীকে মানায় না রে। বেমানান লাগে, বড়ো বেমানান। একটা আবরণীর ভীষণ প্রয়োজন তোর। এক নিরাপদ পরিধেয়।

আমার পকেটে নিষ্ফল হাজার-হাজার দিনার। বেকার হয়ে গেছে।

ওকে দিতে চেয়েছিলাম—শাশ্বত, চির-নিরাপদ এক আবরণী। যা ছোটো হয় না, ছেঁড়ে না কোনোদিন। শত চেষ্টায়ও টেনে খুলতে পারে না কেউ—কঠিন বর্মের মতন পরিধেয় দেওয়ার কথা ছিল রে পাগলি। ধিক্কার দিলি। তোর দোষ নেই। কতদিকে কত মেয়ের দল কতই না অসহায়।

নিজেকে কশাঘাত করি বারবার। আমার দৃষ্টিতে কি পুরুষচক্ষু ছিল সে-সময়? না, মোটেও না। তবু, কলঙ্কে আজ অবগাহন। মেট্রোপলিসে শ্যু-শাইন-গার্ল বেশি ইদানিং। একেকজন ট্রেডারের হেফাজতে থাকে সত্তর-আশি জন কিশোরী। যাদের দেহে শরীরী জোয়ার অবাধ। এদের নিবাস—মেগাসিটির বিভিন্ন স্লামে।

প্রতিদিন এদের দেয়া হয় জুতোর তিনরকম কালি। ব্ল্যাক, ব্রাউন, নিউট্র্যাল। এছাড়া দু-ধরণের লিকুয়িড পালিশ। বিভিন্ন আকারের ব্রাশ। কাপড়ের ফালি আর স্পঞ্জ। ফেট্টি বাঁধা কাঠের ট্রের মতো বাক্স। ওতে ফুটরেস্ট লাগানো।

পরিধেয় দেওয়া হয়—আঁটোসাঁটো ফ্রক, বা জিনস্-টিউনিক। এদিক-ওদিক কিছু কিছু ছেঁড়া-ফোঁড়া। যাতে অনেক কিছু দৃশ্যমান হয়।

ট্রেডারবা কিশোরেব চেয়ে কিশোরীদের কাজের সুযোগ দেয় বেশি। কারণ খুবই সরল। কিশোরীদের শরীর ও লিঙ্গ-ভিন্নতা পাব্লিক-পুলার। সুতরাং, বেশি জুতোয় পালিশ পড়ে ওদের হাতে।

কিশোরীরা ঘুরে বেড়ায়। কোথাও-কোথাও বসার নির্দিষ্ট স্থানও আছে। যেমন—রেলস্টেশন, বাসস্ট্যাণ্ড, মন্ডি, নানান নুক্কড়, রেসকোর্স।

দৃশ্যটা এমন—

ক) লোকটার জুতো নোংরা, বা হয়নি তেমন। কাঠের ফুটরেস্টে জুতোসহ পা রেখে বলল—চল, পালিশ মার। বিলকুল চক্কাস মাংতা, কিয়া?

ব্রাশ হাতে কিশোরী বলবে—চক্কাস বোলে তো অর্ডিনারি ইয়া ইস্‌পিশাল সাহিব?

উত্তরে লোকটা বলল,—স্পেশাল। চকাচক্ বনা ঝটাপট রানিমুকর্জি।

—জী সাহিব। ডবল রৌকড়া, মালুম?

—মালুম-মালুম।

ঝুঁকে-ঝুঁকে জুতোর চাকচিক্য আনায় ব্যস্ত। ভরাট কিশোরীর মধ্যবুকের খাঁজ স্পষ্ট হয়। ঘামে ভেজা সিনথেটিক অন্তর্বাসের পরিসরে যাবতীয় আভাস আর পুরুষের উত্তপ্ত

নজর—কিশোরীকে বিদ্ধ করে, কিন্তু সে নির্বিকার। এছাড়া উপায় নেই।

পালিশ শেষ হলে তথাকথিত দ্বিগুণ পারিশ্রমিক, এমনভাবে ক্ষিপ্ত আঙুল গুঁজে দেয় ঘামার্ত বুকের খাঁজে—যেন অসাবধানতায় পড়ে গেছে। সব বুঝেও কিশোরী তুলে নেয় বিদীর্ণ পারিশ্রমিক।

বুকের খাঁজ থেকে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরে যুগল-শ্রমের দাম। কেবল একপলক।

মুখে তেমন কিছু বলে না। বলে লাভ নেই। খরিদ্দার চাই আরও। ট্রেডারের স্থায়ী নির্দেশ। খোলা রাজপথে দিনানুদিনের চতুর ফ্রেশট্রেডিং। কিশোরীর কোনো চাতুরি নেই। সে শিকার। শিকার চিরকালই অসহায়। উলটে ওকেই বলতে হয়,—ফির আনা জরুর, সাহিব।

খ) পালিশ-করানো খদ্দের যারা, এদের বয়সে বিবিধতা আছে। যোলো থেকে ছেষট্টি। অবশ্য মধ্যবয়স্ক যারা, এদের সংখ্যা বেশি।

একজন শ্যু-শাইন-বয়ের চেয়ে একজন মার্কমারা শ্যু-শাইন-গার্লের উপার্জন অন্তত ছয়গুণ, সঙ্গত কারণেই ... ...।

সারা নগর জুড়ে এভাবেই প্রসারিত হয় দিনের ফটফটে আলোয়—অন্য এক আঁধার দুনিয়ার লালবাতি অঞ্চল।

খদ্দের আরোপিত বিভিন্ন নাম আছে এদের। যেমন—মাধুরী দীক্ষিত, উর্মিলা মাতন্ডকর, রবিনা টন্ডন, করিশমা কাপুর, শিল্পা শেট্টি, আরও কত।

কখনও কিশোরীরা আরও কিছুটা বিলায়। যেমন, কোনো কোনো খদ্দের নিচুস্বরে বলে দেয় সাফসুফ,—চলেগি? গাড়ি মে আ যা।

কেউ কেউ যায়। যেতে হয়। সারাদিনের বহুমুখী শ্রান্তির পর যে পারিশ্রমিক মহাজন দেয় ওর হাতে, দিন গুজরান হয় না ওতে।

কারণ, পেছনে—সংসার নামক বিপুল বন্দরের হিন্টারল্যাণ্ডে অপুষ্টি, অসুখ সহ কয়েকজন খাওনদার। স্যালিয়ান্ট ফিচার বদলায় না। চিরন্তনী।

যে-কোনো পার্কিং লট্। দামী গাড়িতে কালো কাঁচ। অতএব, পেছনের সিটে আয়াসে কিশোরীদের যোনিচ্ছেদ করে মধ্যবয়স্ক পুরুষের দল।

পুরুষের শরীর থেকে বেরোয় বিয়ার-সিগারেট-হালকা পারফিউমের বদ্‌বু।

আর, চিৎ-শোয়া কিশোরীর দেহ নিঙড়ে হালকা বাষ্পের মতো উত্থিত হয়—জুতোর কালির গন্ধসহ অঙ্গ-জোড়া অসময়ের ঘামের বড়োই করুণ ঘ্রাণ।

উপমহাদেশের গুটিকয়েক মেট্রোপলিসে দিনে দিনে নির্মিত হয়—বালিকা-কিশোরীকে শিকার ধরার বিলকুল অসংরক্ষিত অবাধ মৃগয়াভূমি, দিনের বেলায়।

দামী শকটে কৃষ্ণবর্ণ কাঁচ। কিছুই দেখা যায় না। যদিও পুলিশ জানে। ওরাও তেমন। অ-বর্ণিত নেক্সাস, দিনানুদিনের।

যতই আবেদন-নিবেদন, আভিজাত্য, আয়াস, হাতছানি থাকুক না চারপাশে কিশোরীর ভুল ধিক্কারে জমক-ঠমকের মায়ানগর এখন নরকপুরী। গাড়ি ছেড়ে দিই। ড্রাইভার বিস্মিত, বলল—কিয়া বাত হ্যায় স্যার? পয়দল কাঁহা যায়েঙ্গে?

হোটেল বহুৎ দূর হ্যায়।

আমি বিরক্তির চুড়োয়। বললাম,

—কোঈ বাত নেহী। তুম যাও। তুম্হারা ম্যাডাম কো বোল্না রাত কো মিল্তে হ্যাঁয়।

পালাতে ইচ্ছে করে। ছুটতে ইচ্ছে করে আমার বরাদ্দের একমুঠো অ-বিতর্কিত আকাশের খোঁজে। কোথায়, কোন্ ডামাডোলে হারাল কে জানে? কিছু-কিছু পুরুষও কত পরাধীন। আমিও।

ব্যাক্-বে, মাহিম-বে, হাজিআলী-ড্রাইভে নোনা বাতাস বয়। নীলে-সাদায় এক জাহাজ পোতাশ্রয় ছেড়ে চলে যায় দেশান্তরের বন্দরে। যাযাবর জাহাজের বড়ো বেশি বিদেশমুখী টান। ওটা যাবে লোহিতসাগর পেরিয়ে পোর্ট সৈয়দ।

তীব্র ঢেউয়ের অভিঘাত, সাগরজলের কুণ্ঠিত ফসফরাসে, আলোর ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছুরণ।

লাইট-হাউসের আলোর মোচড় সাগরের আঁধার সরায়। কিন্তু আমার বা আমাদের আঁধার?

একা বসে থাকি হাজিআলীর দরগায়। আজানের শব্দ ভাসে বাতাসে। এখন পশ্চিম উপকূলে মগরব্। পাথরে-পাথরে নোনা জল আছড়ায়। মহানগর এবার নিশাচরী হবে। আলো জ্বলে অজস্র।

মহানগরীর উত্তর উপকূলে ওলিফোর্টের পরম্পরাগত মহাঘন্টা অস্থির বাতাসতে খণ্ড-বিখণ্ড করে জানিয়ে দেয়—পশ্চিম উপকূলের এই আত্মবিস্মৃত ভূখণ্ডে সান্ধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়েছে একটু আগে।

আমি এখন বাতানুকূল হোটেলের আটতলায়। মোহিনীকক্ষে নিরালা প্রতীক্ষা, অথচ কোনো যাত্রা নেই। কী-ই বা থাকবে।

যেন স্পষ্ট শুনি, সেই ক্ষিপ্ত কিশোরীর হাই ডেসিবল্—মীড়-গমকসহ, দিনানুদিনের জীবন-জীবিকায় সময়ের দাবি-নামা সংক্রান্ত বিচিত্র বিজ্ঞাপন—বুটপালিশ ...। হর-দিবস বুটপালিশ। বাল্জী ঠাকরে বুটবালিশ ...। অটলবিহারী বুটপালিশ ...। গণপতি-বাপ্পা বুটপালিশ ...। তেলগি-দাদা বুটপালিশ। দাউদ ইব্রাহিম বুটপালিশ। হরদিবস বুটপালিশ ...। অ-যা সাহিব বুটপালিশ ...।

কিশোরী অনবরত থু-থু ছেটায়। আমার, আমাদের লোভাতুর কিংবা আত্মকেন্দ্রিকতায় নির্লিপ্তির মুখে। মুছে নেয়া যায় না, এমন ধিক্কার।

বিপণন-নগরীর লালসা-কাতর, ক্ষুধা-ক্ষুধা হাওয়া ওর সবকিছু চেটেপুটে তুলে নেয়ার আপ্রাণ অপচেষ্টা চালায়।

কিন্তু, রঞ্জক-কিশোরী তখনও সিংহভাগ অক্ষত, বিবেক ও অভিরুচির অমলিন প্রাচুর্য নিয়ে। সব কিশোরীর আভূষণ সবাই কেড়ে নিতে পারে না কোনোদিন—এটাই শান্তি।

পেড্ডার রোজে রাতের শকট ছোটে অবিরাম। কুইন্স্‌ন্যাকলেস এখন আলোময় হীরকমালা। চার্চগেট স্টেশন ছেড়ে একটু আগে বেরোনো শেষ লোকাল ট্রেন হয়তো দাদর পেরিয়ে যায়। সেন্ট্রাল মুম্বই ও ভিটির প্ল্যাটফর্মে মাঝরাতের আগত ও বিগত রেলের ধ্বনি। অনেক ট্রেন ছুটে যায় মুসাফির কোলে নিয়ে। গন্তব্য—নয়ী মুম্বই।

সমুদ্রের শরীর নিয়ে ধীর হাওয়ার শালীন জলোচ্ছ্বাস। চারধারের স্কাইলাইন-জুড়ে হিলিয়াম-বিজ্ঞাপনীর মনোহারী আস্ফালন।

হয়তো, কোনো পার্সি লোকালয়ে উদাস ম্যান্ডোলিন বাজে। কেউ শোনে, অনেকে শোনে না।

আরব-দরিয়ার বুকে পোতার্ণব। ঝিলমিল আলো। জাহাজের গগনচুম্বী ফানেলে গাঢ় লাল আলো।

সাহার বিমান বন্দরের আলোয়-আলো শরীরে প্রায় আছড়ে পড়ে ল্যুফ্‌তুন্‌সা-র বিশাল বিমান। ওই উড়ান ছিল প্যান-অ্যাম এয়ারওয়েজ। গন্তব্য নিউইয়র্ক।

নরিম্যান-পয়েন্ট প্রায় ফাঁকা। বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওয়ার্ল্ড-ট্রেড-সেন্টারের সুপার ম্যানসান। টাটা-থিয়েটারের আলোর দ্যুতি এখনও প্রতীয়মান। শো শেষ।

গত পরশু আমি ও সুনয়না ওখানে সংস্কৃত নাটক দেখেছি—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌। এমন অ্যাকুস্টিক ডিজাইন দেয়ালে, আলাদা মাইক্রোফোন লাগে না।

সুনয়না আলতো ধরেছিল আমার হাত। কেন, জানি না।

আমি হোটেলে নয়, যেন খন্ডহরে বসে আছি। উত্তাপহীন নৈঃশব্দ এখান।

বিবেক নামক আগাছার পাশে অথবা, কোনো সুপ্রাচীন পরম্পরায় জীবাশ্মের সন্নিকটে বসে বসে কতক্ষণ আর পড়া যায়—মনোরঞ্জনী সাময়িকী? গলাধঃকরণ করা সমীচীন কি তিতিরের কষা মাংস সহযোগে নামজাদা ক্রুয়ারিস রয়্যাল স্যালুট আর ম্যাডনেলের কক্‌টেল? আমার ট্রলির পেটে ভরপুর সৌখিন শপিংসহ নানা কমিক্সের সিডি ক্লিপিংস। স্ক্রিন-প্লের ফাইনাল ডিটিপি কপি প্যাটেলকে সমঝে দিয়েছি। সুনয়না পরে দেখবে। মুখে কি এখনও লেগে আছে কিশোরীর থুথুবাহী তিরস্কার? বিপণীর সর্বোৎকৃষ্ট হ্যাঙ্কি এর গ্লানি মুছতে পারে

না। পারতে নেই।

হাতে স্টিফেন হকিং, কুরোশাওয়া, সত্যজিতের জগাখিচুড়ি অহেতুক প্যাস্টাইম। আঃ কতদিন নিজের মেধা-বুদ্ধি-প্রাজ্ঞতার প্রদর্শনের জন্যে বৃথা পাঠ করা যায়?

অথবা, কোনো কিছু লেখা লেখার ছলে নিজেকে মানবিক মানবিক ভাবার হাস্যকর গিমিক করা যায়? কাজ নেই তো খই ভাজ—কথায় আছে।

গোলি মারো লেখার কপালে। কলম না, একটা বিপুল ঝাড়ু চাই হাজার হাজার বছরের স্তবীভূত ও রূপান্তরিত আবর্জনা সরাতে। অ্যান অ্যাক্সটেনসিভ্ সুইপিং। এখানে সবকিছুই বর্জ্য।

আমি সেই ঝাড়ু চাই অতি সত্বর।

মেথর ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় থাকবে না আমার। অ্যা গ্রেট সুইপার। বড়ো বেশি প্রত্যাশা।

এই সময় সুনয়না এল। ও আজ থাকবে নাইনথ্ স্যুটে। গল্প করবে অনেক রাত অব্দি। টুকটাক কাজের কথাও হবে শু্যটিং সংক্রান্ত।

একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলাম ওকে। দীর্ঘ, টানটান শরীরের উপস্থিতিতে নিবিড় আতিথেয়তা। পরনে ফেডেড্ জিনস্, ওপরে স্ট্রাইপড্ হোয়াইট শার্ট। চুলের সমুদ্র পিঠে ছড়ানো। গলার সংক্ষিপ্ত হারের ক্ষীণকায়া লকেটে একবিন্দু জলরং হিরে। পায়ে অফ্-হোয়াইট কোলাপুরি। বাঁ-হাতের কব্জিতে রোলেক্স। ডানহাতে একগাছি গুজরাটি কংগনস্। ঠোঁটে স্মিতহাসি।

পাশের ডিভানে আয়াস করে বসল—ইকবাল বোল রথা থা, দোপহর কো তুম্নে গাড়ি ছোড় দিয়া অচানক। হোয়াট ওয়াজ রং উইথ দা কার?

হাতের বইগুলো ট্রলিতে রেখে বললাম,—ন্যথিং রং। আই ইনটেনডেড টু রোম অন ফুট। সুনয়নার হালকা বিস্ময়। বলল,—ইন স্কচিং সানলাইট? কাহাঁ কাহাঁ গয়ে থে?

—কহীঁ নেহী।

—কিয়া মতলব? ফির থে কাঁহা সারে দিন?

আমি বললাম,

—য়ুঁহী ভটক্তা রহা আখ্খা মুম্বই।

এবার মায়াময় হাসল সুনয়না। বলল,

—হোয়াট অ্যা ক্রাজি ম্যান। আয়াম ওয়েটিং, ইউ নো? চিন্ময়ী আসকড্ ফর ইউ।

চিন্ময়ী। সুনয়নার ষোলো বছরের মেয়ে। মা-বাবার ডিভোর্সের পর মা'র কাছেই থাকে। তখন বয়স ছিল বারোর আশপাশ, যখন বাপ দাম্পত্য বিচ্যুত হয়।

গত দু'দিন জমিয়ে গল্প করেছে। খুনসুটি হয়েছে। গান শুনিয়েছে। নেচেছে, গর্বা, ভাঙড়া,

হাওয়াইন, মেক্সিকান। আমাকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েছে মীর-তকী-মীর, বাহাদু শা জাফর, রবীন্দ্রনাথ। গান গাইয়ে ছেড়েছে—সজনোয়া বৈরী হো গঈ হামার।

আমার দু-কাঁধে হাত রেখে দুলে দুলে নেচেছে বল্।

অদূরে সোফায় বসে-বসে সুনয়না তৃপ্তির হাসি হেসেছে, কিছুটা অন্যমনস্কতায়। চিন্ময়ী—তরবারির মতন ঝকঝকে ধারালো সুন্দর ষোড়শী। গায়ের রঙে স্ট্রবেরির নির্যাস। দারুণ শখ—ওভারসিজ ফ্লাইটের এয়ার হোস্টেস হওয়ার। পড়ে ন্যান্সী কনভেন্টে। ভীষণ ছটফটে। সুন্দর দু-চোখে গগনব্যাপ্তির চপলতাসহ সারল্য।

আমি চুপ দেখে সুনয়না প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল,—সো মুডি ইউ আর! এত উস্‌কোখুস্‌কো কেন?

এরই প্রতিপক্ষী জবাব না দিয়ে বললাম, জলদ গম্ভীর স্বরে,—থ্যাঙ্কস্ ফর এভরিথিং ম্যাম। আয়াম লিভিং টুমরো।

ঠাণ্ডা পানীয়ের গ্লাস অবাঞ্ছিত করে বিব্রত-স্বরে সুনয়না বলল,—হোয়াই? হোয়ার?

একটু হেসে বললাম,—ফিলহাল পুনে। বাদমে কাঁহা, নেহী মালুম।

সুনয়না পুরোপুরি বিপন্ন। একটু থমকাল হয়তো। তারপর সব দ্বিধা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল—ডোণ্ঢ ইউ লাইক টু মিট চিন্ময়ী ওয়ান্স-এগেন?

আমি মাথা হাল্‌কা নেড়ে বললাম,—নো।

এবার সুনয়না পুরোপুরি বিষণ্ণ। বাঁ গালের কয়েকগাছি চূর্ণ চুল কানের পাশে সরিয়ে বলল, প্রায় খাদে নেমে-যাওয়া গলায়,

—হোয়াই নট?

—নট্ মীনস্ নট।

থিতিয়ে-আসা স্বরের সুনয়না উদ্ভাসিত হল পাহাড়ী বিকেলের ম্রিয়মাণ আলো ছুঁয়ে, সম্পূর্ণ উদ্বেলিত আবেগে বলল,—চিন্ময়ী কলড্ ইউ পাপা। ইউ ফরগট্ দ্যাট? টেল মি।

সুনয়নার দু'চোখে হীরক-সম অশ্রুদানা। গাল বেয়ে থুতনিতে নামে। মোছে না।

আমি কঠিন প্রত্যয়ে বললাম,—হোয়ার? ডিড্ শী কাম ওভাব হিয়ার টু মীট ইউ?

—ইয়াহ্।

—হোয়্যার? অ্যাট হোটেল?

—নো।

—দেন?

—অন্য দ্য স্ট্রিট রুথলেস রাশ, আই হ্যাভ সীন অ্যানাদার চিন্ময়ী। হু স্পিটেড্ অন আস্। অ্যাণ্ড উই মাস্ট নট ওয়াইপ অ্যাওয়ে হার স্পিট।

সুনয়না বিস্মিত বিনয়ে বলল,

—হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? টেল মি প্লীজ, হোয়াট ইজ রং উইথ ইউ?

আমি ভাসা-ভাসা স্বরে বলে গেলাম,

—নাথিং, অল এভ্‌রিথিং ইজ রং উইথ হার।

গোটা মহানগরী সহ হোটেলকক্ষে সময় কাটে নৈঃশব্দকে সঙ্গত দিয়ে।

কার্পেটে এলানো সুচারু পায়ের পাতা সুনয়নার। নাতিদীর্ঘ পারিপাটি নখে ন্যাচারেল নেলপালিশ। গোড়ালি রক্তাভ। চোখমুখে সারাদিনের শ্রান্তিজনিত আলাদা আকর্ষণ। চব্বিশ ঘন্টার সিংহভাগ বাতানুকূল পরিবেশে দিন-যাপন, তবু হালকা অবসাদ। দুই চোখের দীপ্তিতে কার্পণ্য নেই।

ডিভানের উল্টোদিকের বেলজিয়ান আয়নায় ওর নির্বাক অথচ ভীষণ সরব প্রতিবিম্ব। আর শরীর জুড়ে ভীষণ আয়োজন। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই হলেও বত্রিশ-তেত্রিশের প্রতিভাস, প্রকট। দেহ উত্থিত সামুদ্রিক হাওয়া তো আছেই।

চায়নাটিক্ সেন্টার টেবিলে অবহেলায় ফেলে রাখা সেলফোন পোল্‌কা-টোন অস্থির। বাজতেই থাকে। সুনয়না তোলে না।

অবহেলিত সেল-ফোন বোবা হয়ে যায়।

সুনয়না হাত রাখে আমার কাঁধে। প্রায় জোর করে ঘোরাতে চেষ্টা করে আমার শরীর। তারপর নিজেই ঘুরে মুখোমুখি হয়।

দুটো চোখ আপাত অস্থির ডানা মেলে ধরে। উড়ানে উন্মুখ দৃষ্টি। আমার চোখে অবতরণ করে।

একসময় চার ওষ্ঠের প্রগাঢ় স্পর্শ। নির্যাস শুষে নেওয়ার পার্থিব আকুতি। এতে যতই মোহময়তা জমাটবন্ধ হোক, তবু বিতর্কিত। সব বিতর্কে মন বসে না। সুতরাং বিচ্যুতি অকস্মাৎ।

এখন ওর্লির পুরাতন দুর্গে বিলম্বিত মধ্যরাত। কক্ষে মুহ্যমান সুনয়না। মুখাবয়বে ভাসা-ভাসা হাসির ম্লানতায় বঞ্চিত যাজ্ঞ্যার অসহায়ত্ব। বলল প্রায় না-বলা স্বরে,—অ্যাজ ইউ উইশ। গুড নাইট।

বলেই সময় নিল না আর। ফিরে গেল ওর নির্দিষ্ট স্যুটে।

আমি একলা বাতায়নে। কক্ষে এসি-র শব্দ। বাইরে হালকা বাতাসের।

লাইফ-সাইজ ভারি কার্টেইন সরিয়ে দিই।

দেখা যায়—অনেক দূরে, নরিম্যান পয়েন্টের তির-তির আলোয় মেগাসিটির নিশাচরী ঘুম।

পাখিদের ঘুম ভেঙেছে। এখনও প্রায় অন্ধকার। ঐতিহ্য-প্রিয়-ইংলিশরা এমন ক্ষণকে বলে—ডন্।

সেপ্টেম্বরের শেষ। বাতাসে সামুদ্রিক আর্দ্রতা। তবে ভ্যাপসা গরম তেমন নেই। ভাড়াটে ছোট গাড়ি ছুটছে দূরত্ব গিলতে ফিটফাট সিক্সলেন হাইওয়ের পাঁজর চিরে। উপমহাদেশের সর্বপ্রথম বিছানো কংক্রিট সড়ক। পুনা-বোম্বে।

আমার দৃষ্টি বাইরে। গাড়ি প্রায় উড়ছে। সব গাথা পেছনে পড়ে রইল মহানগরীর বৈভব ও নিঃস্বতা সহ।

পেছনে মহানগরী অদৃশ্য। এখন গাড়ির গমন সহ্যাদ্রির টানেলে। অনেক নিচে অধিত্যকা। শিফন মেঘ। মাথার ওপর মগ্ন আকাশ।

পাহাড়-শিখরের স্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে, নধর সূর্য নির্যাস চোষে মাটি আর পাথরের। জানালায় ভেজা বাতাস। রিয়ারসিটে আমি। শকটের শৌর্যে অজস্র অশ্ব-ক্ষুর।

একসময় ড্রাইভারকে বললাম,

—মধুকর।

—জী স্যার?

—কোরেগাঁও আনে সে বোল্না, ঠিক হ্যাঁয়?

—জী স্যার। আভি ভী দো ঘন্টা বাকি ঝালে। এসি চলা দুঁ ক্যা?

—নেহি। ঠিক হ্যায়।

—মিউজিক?

—নেহি নেহি।

—আচ্ছা স্যার।

আবার বললাম,

—মধুকর।

—জী স্যার।

—ডেকান-কুইন কী ক্রসিং কল্ইয়ান মে হোকা কিয়া?

—নোকো স্যার।

—ফির?

—পিম্পড়ি মে হোগা স্যার।

—অ।

ড্রাইভার অ্যাক্সিলারেটর, ক্লাচ্, ব্রেকস্, স্টিয়ারিং হুইল, ব্যাকভিউফাইণ্ডারে আপাতত নিমগ্ন তপস্বী। তবু, সময় কাটানোর জন্য কিছু না কিছু বলতে হয়, তাই বললাম,

—তুম্হারা ঘর কাঁহা হ্যায়? মুম্বাই?

—নোকো স্যার। অস্‌লী ঘর বোলে তো নগর।

—নগর?

—জী।

মারাঠিরা আহমদনগরকে সংক্ষেপে বলে 'নগর'। মধুকরও তেমনি।

স্পিডোমিটারে আশি-পঁচাশি। কংক্রিট সড়কে চারখানা চাকার রেডিয়াল টায়ারে টর্নেডো। এখন পঁচানব্বই।

আমার দৃষ্টি সামনের উইণ্ডস্ক্রিনে। খোলা রাস্তা। পাহাড় পেরিয়ে গেছে। এখন প্রায় সমতল। দু'দিকে বনানী। স্ব-মুখী, বিপরীতমুখী অজস্র শকট। পুনে-মুম্বই হাইওয়ের উদ্দামতা।

আরও পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পেরোলে পুনে। ওখানে আমার ভিন্ন আখ্যান। যা আজও নিদারুণভাবে ভাস্বর। হয়তো আজীবন।

গাড়ির ফ্রন্টহুইল টার্ন করে। রাস্তার বাঁক।

এমন হয় বলেই আঁকাবাঁকা নদী আর পথ-সহ গোটা একটা জীবন।

ড্রাইভার বলল একসময়,

—আপ সো যাইয়ে স্যার। কোরেগাঁও আনে সে জগা দুঙ্গা জরুর।

—রহনে দে।

—কোরেগাঁও মে কিয়া হ্যায় স্যার?

একটু সময় নিয়ে বললাম,—বচ্‌পন।

ড্রাইভার বলল,

—বচ্‌পন? মতলব?

—মতলব কুছ নেহী।

—কায় সাঙ্গিতলে স্যার? কোয়কা বচ্‌পন্‌?

আবার সময় নিলাম কিছুটা। বিরোধাভাসে পরিপূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতেই হল। বললাম,

—তামাম জিন্দেগী কা।

ড্রাইভার একপলক ঘুরে তাকাল আমার দিকে, তারপর আবার নিবিষ্ট হল গমন ও গন্তব্যে। কী বুঝল, সেই জানে। তবু বলল আবার,

—আপ সো যাইয়ে।

আমি তা করি না। কোনোকালেই সময়-অসময়ের ঠিক- বেঠিক নিদ্রা আমার নেই। উদগ্রীব হই—পুনে আর কতদূর?

তুচ্ছ শব্দের অনাড়ম্বরের মতো, প্রায়-আর্তি, এমন উচ্চারিত স্বর কানে এল সুনয়নার, আবার,

—তুমি চিন্ময়ীর সঙ্গে দেখা না করে সত্যি চলে যাবে?

ওই আহ্বান এখন, বিলাসময় পান্থশালার পরিত্যক্ত কক্ষে আতুল হয়ে আছে হয়তো। বড়ো তীব্রভাবে মনে হল এই প্রথমবার, চিন্ময়ীকে একবার বলে এলে ভালো হত। গাড়ি ছুটছে নিজেকে উজাড় করে। পুনে এসে গেল প্রায়। ড্রাইভারকে বললাম,

—মধুকর, ধীমা চালাও।

স্বপ্না ভট্টাচার্য

বাস্তুহীন

তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে রোজকার অভ্যাস মতো পশ্চিম আকাশে তাকাতেই কেমন একটা বিষণ্ণ আলো এসে চোখে লাগে। আকাশের অনেকখানি কেমন যেন ফাঁকা! সূর্য অস্ত গেছে। আকাশের শেষ লাল রঙটুকুও যাই-যাই করছে! আর তখনই স্বাতী আবিষ্কার করে ঐ কোণের ছাতিম গাছটা নেই। হাওয়ায় ভেসে আসে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। শরতের সন্ধ্যায় ছাতিম ফুল ঋতু চিনিয়ে দেয়। বিয়ের পর থেকে ঐ কোণের ছাতিম গাছটাকে বাড়তে দেখেছে। নিজের জীবনের অনেকখানি সময় জুড়ে ছাতিম গাছটা তার গন্ধ নিয়ে মিশে ছিল! শাশুড়ি চিনিয়েছিলেন গাছটা। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্বাতী। দূরে শিববাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘন্টা বাজে। স্বাতী ভাবে কত নিঃশব্দে গাছটা সরে গেল! আবার শরৎ আসবে কিন্তু গাছটা থাকবে না!

অন্যমনস্কভাবে শাড়ি পাল্টাচ্ছিল স্বাতী। পাশের ঘরে সুদীপ আর ভাসুরের কথোপকথন কানে আসে ... ... অন্যমনস্কতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একটা প্রবল রাগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ম্যাক্সি পরার বদলে পাল্টানো শাড়িটাকেই টেনে নেয়। চিড়বিড় করে রক্তচাপ বাড়তে থাকে। কান ও মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরোতে থাকে। প্রবল আক্রোশে আর রাগে নিজের চুল নিজেই খামচে ধরে। তারপর রাগে-দুঃখে অসহায় স্বাতী শিথিলভাবে মাটিতে ধপ্ করে বসে খাটে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দু'হাতে কান চাপা দেয়। কিন্তু শব্দব্রহ্ম। অনায়াস তার গতি। তারা অবলীলায় ঢুকে যাচ্ছিল স্বাতীর মাথায়।

—দেখ সুদীপ, এ-মাসের মধ্যে তোরা বাড়ি না ছাড়লে ... ...

—আমি চেষ্টা করছি।

—গত একবছর ধরেই তো বলে যাচ্ছিল... ...'

—দেখি দু-তিন মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটটা পেয়ে গেলে—'

—তুই বুঝতে পারছিস না, তোর অংশটা ভাড়া না দিলে আমি আর পেরে উঠছি না। মিনিকেও বাইরে পাঠিয়েছি। দু-দুটো ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ ... ...

—আমি চেষ্টা করছি ... ... ফ্ল্যাটটা এখনও... ...'

—সুদীপ, তোর অসুবিধে হবে, তবুও বলছি ... হাউসিং লোনের চাপ আছে ... এ-মাসটার বেশি আর অপেক্ষা করতে পারছি না-রে।

শব্দব্রহ্ম তারপর সন্ধ্যার বিষণ্ণ আকাশ অতিক্রম করে শান্ত গাছপালায় মিলিয়ে যায়। পাশের ঘরে দীপ্ত ও কেয়া টিভিতে মগ্ন। বাড়িটা কি একটু দুলে উঠল?

বিজ্ঞাপনে শব্দ প্রাণ পায়। Aquasure মানে শুদ্ধ জল ... শুদ্ধজল মানে সব মায়েরই কর্তব্য। কেউ টিভির ভল্যুম কমিয়ে দিল। শব্দ এখন নিজস্বসীমায়। স্বাতী মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। শাড়িতে গড়িয়ে পড়া চোখের জল ও নাক মোছে। শাড়িটা পা দিয়ে ঠেলে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দেয়। আট ইঞ্চি বাই ছ' ইঞ্চি কাঁচের ফ্রেমের ভেতর থেরে হেমাঙ্গিনী ও বারিদবরণ তাকিয়ে থাকেন নির্বাক। ম্যাক্সিটা গায়ে গলিয়ে স্বাতী বাইরে আসে। বসার ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখে কেউ নেই। ভাসুর ও সুদীপ দু'জনেই বেরিয়ে গেছে। স্বাতী বারান্দায় দাঁড়ায়। পুরোনো কাঠের আসাম টাইপ বাড়ি। ঢেউটিনের চাল। লোহার জালি দেওয়া বারান্দায় দু-হাত রেখে বাইরে তাকায়। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাতেই ছাতিম গাছের শূন্যতায় বুকটা মুচড়ে ওঠে। বাড়ির সামনে সামান্য মাঠ, তারপর রাস্তা। বারান্দার ডানপাশে উঠোনে তুলসী তলায় তারই দেওয়া প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে। ঐখানে তুলসীতলায় শ্বশুর-শাশুড়ির অস্থি রাখা আছে। স্বাতী তাকিয়ে দেখে। সুদীপ অফিসে যাওয়ার আগে স্নান করে অস্থিতে জল দেয় আর সন্ধ্যায় স্বাতী প্রদীপ জ্বালায়। মধ্যবিত্ত ছকে তাকে গয়াযাত্রা আর হয়ে উঠছে না।

গেট খোলার শব্দে তাকায় স্বাতী। সুদীপ এসেছে। অন্ধকারে তার অবয়ব আবছা। শুধু সাদা শার্ট দৃশ্যমান। স্বাতীর ভেতরে একটা উন্মাদ সিংহ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সেই সিংহটা সুদীপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চায়। সুদীপ অন্ধকার পেরিয়ে ভেতরে আসে নির্বাক। স্বাতী বারান্দার তারের জালি খামচে ধরে চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে একা। বাসি ছাতিমফুলের গন্ধ নিয়ে একটা মৃদু বাতাস বয়ে যায়। তুলসীতলার প্রদীপ দু-তিনবার দপ্ দপ্ করে নিভে যায়।

—যা-যা, সব পড়তে বোস। তোর কাল স্টাডি পয়েন্টে পরীক্ষা না? পাজি হতচ্ছাড়া! বসে বসে টিভি দেখছিস? কী, কী পেয়েছিস তোরা সবাই? বাবার গুচ্ছের টাকা! তোদের পেছনে ঢালবে?

সমস্ত রাগ দীপ্তের উপর ফেটে পড়ে। দুমদাম কিল কষায় ছেলের পিঠে।

—হারামজাদা। মজা দেখাচ্ছি দাঁড়া।

মায়ের মারমুখী চেহারা দেখে রুখে দাঁড়াতে গিয়েও ঘর ছেড়ে পালায় দীপ্ত। কেয়া ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। অস্থিরভাবে স্বাতী সোফায় বসে। হাতে রিমোট নিয়ে চ্যানেল পাল্টাতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সোফায় গা এলিয়ে দেয়—

—'রাণীকাহিনী'—একটি মেয়ের বিকশিত মুখ! রাণীর সংগ্রাম চলছে অন্তহীন। সিরিয়ালের পর সিরিয়াল। এতগুলো এপিসোড পেরিয়েও শেষ হচ্ছে না। রাণীর লড়াই বড় ননদ বিজিতার সঙ্গে। জা আর জায়ের মা! স্বাতী ধীরে ধীরে গল্পের ভেতর ডুবে যেতে থাকে।

এতবড় বাড়ি ... কিন্তু রাণী পথে পথে ঘুরে বেড়ায়
... বারবার মাস্তানের দ্বারা আক্রান্ত হয়... তবুও রাণী
প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় না। ... ...

আচ্ছা, রাণীটা এত ভালো কেন? এত ভালোমানুষ হতে পারে, না হওয়া সম্ভব? স্বাতী নিজের সঙ্গেই মেতে ওঠে। ভেতরে ভেতরে বিজিতাকে বিধ্বস্ত করার জন্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাণীর ভাগ্নেটা কী ভালো! ওর ভাগ্নে যদি রাণীর ভাগ্নের মতো হত। আর হবে! সবাই বড়মামার ভক্ত! টাকা আছে না। স্বাতী সংলাপে মগ্ন হয়ে দেখতেই থাকে ... ...

এখন বিরতি। হরলিক্সের বিজ্ঞাপন। স্বাতী ওঠে। অনেকক্ষণ সুদীপ এসেছে, চা দিতে হবে। গ্যাস ধরায়। 'শুদ্ধজল সব মায়েরই কর্তব্য।' পঙ্‌ক্তিটা স্বাতী মাথায় ঘুরপাক খায়। এপাশ-ওপাশ, উপর-নিচ সবদিক থেকেই aquasure-এর বিজ্ঞাপন ভেসে আসছে—শুদ্ধজল ... শুদ্ধজল ... শুদ্ধ ... ...'। সবাই শুদ্ধতা চায়। স্বাতী ভাবে কোথায় শুদ্ধ জল? সুদীপ আজও ওকে একটা Aquaguard কিনে দিতে পারেনি। ওর দাদা বাড়ির পুরোনো অংশে ওয়াটার প্ল্যান্ট করবে—ভাড়া দেবে! উঠে যেতে হবে স্বাতীদের শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে। কেন, সুদীপ কি শ্বশুরের ছেলে নয়! আবার অন্ধ ক্রোধটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিয়ের পর শাশুড়ি বলেছিলেন—

—অধীর তো এখানে থাকে না, আর আসবে বলেও মনে হয় না, বাড়িঘর তুমিই দেখে রাখবে।

বিছানায় গা এলিয়ে সুদীপ খবরের কাগজ পড়ছিল! অফিসের পোশাক ছাড়েনি। স্বাতী সশব্দে চায়ের কাপ টেবিলে রাখতেই চমকে তাকায়,

—কী বলে গেলেন তোমার দাদা?

সুদীপ পত্রিকায় চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোনও জবাব দেয় না।

—কী, শুনছ না যে!

—কী বলব! তুমি তো শুনেছ। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

—বলি এ বাড়িতে তোমার কি কোনও অধিকার নেই?

—এ'কথার উত্তর আমি বহুবার দিয়েছি স্বাতী।

—নাহ্। আমি শেষবারের মতো শুনতে চাই।

—সবকথার শেষ হয়না।

—কী ঠিক করলে? দাদাকে কিছু বললে না?

—ছেড়ে যখন চলেই যাব, তখন কথা বাড়িয়ে কী লাভ?

—নপুংসক!

—চো-প স্বাতী। জিভ ছিঁড়ে ফেলব।

—জিভ ছিঁড়ে ফেললেও সত্য চাপা থাকবে না।

—চুপ। একদম চুপ। ঝগড়া বিবাদ আমার দ্বারা হবে না।

—তা হলে এখানে লাথি খেয়ে পড়ে আছ কেন?

তড়াক করে বিছানা ছেড়ে ওঠে সুদীপ। দু'হাত মুঠো করে স্বাতীর দিকে এগুতে গিয়েও থমকে যায়—তারপর শিথিলভাবে খাটের উপর বসে পড়ে। স্বাতী দু-পা পিছিয়ে যায়। মারমুখী স্বাতী ও সুদীপের মধ্যে সশব্দে ঢুকে পড়ে এশিয়ান পেইন্ট, শুদ্ধজল, হরলিক্স, আরও কত কত বিজ্ঞাপন। রাস্তায় ক্রমাগত মোটরবাইকের শব্দ। রিক্সার ক্রি ক্রিং ...। স্বাতী পিছিয়ে যেতে যেতে দরজা পার হয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে যায়।

অসহায় সুদীপ লক্ষ্যহীন ভাবে ঝোলানো পর্দার দিকে চেয়ে থাকে। হাওয়ায় পর্দা দোলে। লোডশেডিং হয়। বাইরে অন্ধকার। তুলসীতলায় স্বাতীর দেওয়া প্রদীপ কখন যেন হাওয়ায় নিভে গেছে।

অফিসের কাপড়েই বেরিয়ে পড়ে সুদীপ। বোনেরা এখন বহু দূরে। নিজের বৃত্তে বন্দী। অদ্ভুত এক অবস্থায় পড়েছে ও। এমন সমস্যায়ও মানুষ পড়ে! এহেন চক্রব্যূহ। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে সুদীপের। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ননীদার চায়ের দোকানে চলে আসে। এককাপ চা দেওয়ার কথা বলে ফুটপাতে রাখা বেঞ্চের উপর বসে। লোডশেডিং, মশা, নর্দমার উৎকট গন্ধ, যানবাহনের কান ঝালাপালা করা শব্দ। ভাঙা রাস্তায় গাড়ির দৌরাত্ম্য। আজকাল দু-এক খানা ন্যানোও চলছে। সামনে বরদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় ঢেকে যাচ্ছে ফ্ল্যাটে। আগে এইখানে দুর্গাপূজার সময় যাত্রা-থিয়েটার হত। ক্যাপ্টেন বিশ্বাস, মিলন সেনের 'চাঁদ বিবি' পালা কত দেখেছে। বরদাসুন্দরী কে ছিলেন? এখন পাঠশালায় মধ্যবিত্তরা ছেলেমেয়ে পড়ায় না। তার মেয়েও কি পড়ে? অধীর বিশ্বাস কি ওর দাদা? দাদা কে? যে কাঠের ঘরের আধখানায় এখন সুদীপ থাকে তার দোতলায় বসে অধীর পড়ত—

এক বাও মিলে না, দুই বাও মিলেনা ... ...

সুদীপ শুনত।

—দাদা, ফটিক কে?

—বকিস্ না, পড়তে দে।

—দাদা, ফটিক কেন পালাল?

—তুই বুঝবি না, ঘুমো।

শীতের রাতে লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে দাদার পড়া শুনত আর নানা প্রশ্ন করত। দাদার সঙ্গে প্রথম সে গান্ধীমেলায় গিয়ে চরকি চড়েছিল। জানুয়ারী মাসে গান্ধীবাগে সাপনালার কিনারে জমে উঠত মেলা।

—কী রে সুদীপ? কেমন আছিস?

সুদীপ তাকায়, সামনে উৎপল।

—তারপর তুই এখানে! তারাপুরে কোথায় আছিস?

—শিলচরে ছ' মাস। ভলান্টারী রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চলে এলাম। আছি কলেজ রোড। ফ্ল্যাট নিয়েছি। এক ছেলে ব্যাঙ্গালোরে। তোর?

—একটা খোঁজ পর্যন্ত করলি না? একেবারেই ভুলে ছিলি!

হঠাৎ ফস্ করে সুদীপ বলে, 'আমাকে একটা ভাড়াবাড়ির সন্ধান দে না!'

—ভাড়া? কার জন্যে?

—আমারই দরকার।

—তোদের তো নিজের বাড়ি, তবে?

—তা আছে। বাড়িটা নতুন করে তৈরী হবে তাই আপাতত... ...' বলেই মনে মনে হাসে। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

সুদীপের কথায় একটু সময় চুপ করে থাকে উৎপল। বলে,

—কত দিনের জন্যে বল্। আমাদের পুরোনো বাড়িটাই তো পড়ে আছে। নদীর পাড় ভাঙছে। কী করব, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। বিক্রিও হচ্ছে না। তুই দেখতে পারিস। যদি তোর হয় ... ২/১ বছরের জন্যে হলে নিতে পারিস।

সুদীপ যেন হাতে চাঁদ পায়।

—তোর বাড়ি? সেই মাছিমপুর রোডে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বাড়িটা ফাঁকা। বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

—নদী খুব কাছে, না?

—তুই তো জানিস বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। মেরামত করেও বাড়ি রক্ষা করতে পারব বলে মনে হয়না। তবুও পৈত্রিক ভিটা!

—শেষমেশ তো নদীই নেবে।

—তা হয়তো নেবে—তুই গিয়ে দেখে আয়।

সুদীপ অন্যমনস্ক হয়। উৎপলের সঙ্গে কতদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ হয়ে নদীর খাড়ি বেয়ে নেমেছে। সাঁতার কেটেছে ... বনেবাদাড়ে ঘুরেছে। আমলকি বনে হরিণেরা ঘোরাফেরা করে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে সুদীপ-উৎপল। শব্দ পেলে হরিণেরা পালিয়ে ছুটে পালায়।

—হ্যাঁ দেখব। কবে বল্। বাড়ি তৈরী হলেই উঠে আসব। আসলে পাড়া ছেড়ে যেতে মন চায়না রে।

'চল কপাডি তারা/নিতাই আমার শালা.
বংশী আমার গুণের ভাই/টিকি জ্বালাইয়া
তামাক খাই ... ... তা...মা...ক। ... তা ...মা ...
... ক ... খা ... ই।'

সুদীপের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

—উৎপল! তোর হা-ডু-ডু খেলার কথা মনে পড়ে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে দৌড়োনোর কথা? ওভাবে কি এখন দৌড়োতে পারব? বল?

—কীরে? তোর কি মন খারাপ?

—নাহ্-নাহ্। বুঝতেই তো পারছিস অনেকদিনের পুরোনো বাড়িটা ভাঙা হবে। আচ্ছা, কবে যাব বল?

—কালই আসতে পারিস। সকালে এখানে থাকব। আমি ভালো লোক খুঁজছিলাম। কিছু মেরামত করিয়ে দেব।' সন্ধ্যার বাতাসে একটা ঝাঁঝালো ছাতিমফুলের গন্ধ ছড়িয়ে যেতে থাকে।

খাওয়ার টেবিলে খিচুড়ি দেখে একটু অবাক হয় সুদীপ। তার প্রিয় খাদ্য। স্বাতী মুখ হাঁড়ি করে পরিবেশন করছিল। লেবু আছে কি না জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে যায় সুদীপ। দীপ্ত, কেয়া অস্বাভাবিক শান্ত। হাতা, খুন্তি, প্লেট, ডিশ একটু বেশি চঞ্চল।

—আমি কিন্তু এ-বাড়িতে আর একদিনও থাকব না।

উত্তর না দিয়ে সুদীপ নীরবে খেয়ে যেতে থাকে।

—কী, কথা বলছ না যে!

—থাক্‌তে হবে না।

—এ'কথা তো বহুদিন শুনেছি।

—আর শুনতে হবে না। বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি।

—কোথায়? ভাড়াবাড়ি?

—জেনে লাভ?

—কোন চুলোয় যাব জানব না?

—পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে যাচ্ছি—এখন সব সমান।

—পৈত্রিক ভিটায় তোমার কোনো অধিকার নেই? তবে যে তোমার মা ... ...'

—না-না।

—কেন নয়?

—স্বাতী, খেতে দাও। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। সব তোমার জানা।

—তাই বলে বাড়ি বানিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও দেবে না?

দীপ্ত, কেয়া খাওয়া সেরে টেবিল ছেড়ে চলে যায়। চুপচাপ খেয়ে যেতে থাকে সুদীপ। স্বাতী চামচ হাতে খিচুড়ি নাড়াচাড়া করতে থাকে।

—এতদিন গেলে না কেন? কেন, কেন এভাবে অপমানিত হলে!

—ভেবেছিলাম নিজের ফ্ল্যাটে যাব। তাতে লোক হাসত না।

—তুমি তো বাড়ির দাবি ছেড়েই দিয়েছ। তবুও ... ...'

—স্বাতী, এসব কথার মীমাংসা নেই। খাও।' সুদীপ নিঃশব্দে কিছুক্ষণ স্বাতীর কান্নাভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফোলা ফোলা চোখ। চেহারায় অযত্নের ছাপ। বুকের ভেতর কিছু একটা গড়ায়। স্বগতোক্তির মত করে সুদীপ বলতে থাকে—

—জানো স্বাতী, CDA-তে চাকরী পেয়ে দাদা প্রথম বমডিলা-তে জয়েন করেছিল। যেতে কি দাদা চায়? মা-বাবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠালেন। ফিরে আসার জন্যে তার কী আকুতি। আমাকে ছাড়া সে থাকতে পারবে না। সময় ... স্বাতী, সময়!

সন্ধ্যার ঝড় এখন শান্ত। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল সুদীপ। স্বাতী পাশে দাঁড়িয়ে।

—জানো, ঐ মাঠের কোণের ছাতিম গাছটা কারা যেন কেটে ফেলেছে। ফুলে গন্ধে ভরে ছিল গাছটা। ঐ কোণটা ফর্সা হয়ে গেছে!

—ঐখানে ফ্ল্যাটবাড়ি হবে।

—জায়গাটা ঘিঞ্জি হয়ে যাবে।

—তাতে তোমার কী! উৎপলকে চিনতে স্বাতী?

—হ্যাঁ, সেই লম্বা মতো কালো, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু!

—ওর মাছিমপুর রোডের বাড়িটা ভাড়া দেবে। বাড়িটা পুরোনো, হোক। তাতেই চলে যাব। মাত্র কয়েকটা মাস তো!

—কিন্তু নদীর এত কাছ ঘেঁষে বাড়ি!

—তাতে কী?

—ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকব।

—সবই নদীতীর।

—হেঁয়ালি ছাড়ো।

—বাবার তো উপায় ছিল না স্বাতী। দু-দুটো বোনের বিয়ে, মায়ের চিকিৎসা, আমার পড়া ... ... বাবা কোত্থেকে পাবেন এত টাকা!

—তা বলে ছেলে নিজের নামে বাড়ি লিখিয়ে নেবে!

—বাবা সেটা বুঝতে পারেন নি।

বাইরে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। কোণে কি মেঘ জমেছে? টিনের চালে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। কী আশ্চর্য, আশ্বিনেও হিমের আমেজ নেই। গরম! টানা খরা চলছে।

—এখন খরাই হবে স্বাতী। পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে। পারিবেশ বাঁচাতে পারছি না আমরা।

হাওয়ার মাতন বাড়ে। গাছের শুকনো পাতায় খস্‌খস্ শব্দ বাজে। বাতাসে শিসের শব্দ হাহাকার করে। কারা যেন ফিস ফিস করে বলে :

—আমাদেরে নিয়ে যাবিনা সুবো? হাড়ে যে দুব্বো গজিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যে গঙ্গাযাত্রা হলো না।

চমকে ওঠে সুদীপ। হেমাঙ্গিনী কি? বারিদবরণ কি? না-না, ওরা নয়। ওরা নয়।

স্বাতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, শ্বশুরমশাই বাড়িটার নাম রেখেছিলেন সন্ধিনীড়। বিয়েব পর তারাপুর দীনময়ী রোজের এই বাড়িতে এই নামটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল স্বাতী। এখন 'সন্ধিনীড' অস্পষ্ট। অর্ধেক পাকা আর অর্ধেক কাঠের বাড়ি গায়ে গা লাগিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে আছে।

—আচ্ছা স্বাতী, হাড় দুটোর কী হবে?

—ছিঃ ছিঃ। হাড় বলছ কেন। 'অস্থি' বল।

—ঐ একই হল। অস্থি মানেই হাড়।

—সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।

—বাড়ি তো ইট-কাঠ-বালি-পাথর নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

তুলসীতলায় এখন ফুটফুটে অন্ধকার জমাটবাঁধা। সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকারে মিশে আছেন বারিদবরণ ও হেমাঙ্গিনী। পাশের দালানে ইনভার্টারে টিভি চলছে। বড়বৌদি রাত জেগে টিভি দেখে। ক্ষণে ক্ষণে হাওয়ার পৌরুষের আস্ফালন ভেসে আসছে! নিস্তব্ধ অন্ধকারে সুদীপ ও স্বাতী রাত জাগে—নিঃশব্দে।

বাড়িটা খুবই পুরোনো। তবুও ঐ বাড়িতেই যাবে বলে স্থির করল সুদীপ। আর থাকা যায় না। গত ছ' মাসে বড়দা কতবার যে নানা ভাবে উঠে যাওয়ার কথা বলেছে! বৌদি দিন-দিন অসহনীয় ব্যবহার করেছে। মা-বাবা যতদিন ছিলেন, আকারে ইঙ্গিতে বলেছে। এখন সরাসরি। আইনত বলতেই পারে। সুদীপের কিছুই করণীয় নেই। বড়দাকে কিছুটা ভাড়া সেও দিচ্ছে! তবুও ... তবুও অধিকারের প্রশ্ন যদি এসে যায় ... আশঙ্কা! সবই বোঝে সুদীপ। তবুও

ভেবেছিল নিজের ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার আগের সময়টুকু শ্বাস বন্ধ করে কাটিয়ে দেবে! কিন্তু বুড়ি ছুঁতে সে পারল না। আর স্বাতীই বা কেন এসব মেনে নেবে? ছেলেমেয়েদের সামনে কুৎসিত ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে রোজ। বাবা বারিদবরণ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। পাড়ার মাস্টারবাবু! সিলেটের এম.সি কলেজের গ্র্যাজুয়েট। নীতিনির্দেশক। বাবা, তুমি হেরে গেলে!

পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে জ্যাঠামহাশয় ও নারায়ণশিলা গলায় ঝুলিয়ে স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে একা সীমান্ত পেরিয়ে বারিদবরণের কাছে চলে এসেছিলেন। সংসারে নতুন মুখ যুক্ত হয়েছিল। আয় সীমিত। বারিদবরণ আপন-পর ভেদ করেন নি। দাদাকে নতুন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। নারায়ণ শিলাও অরুণাচল আশ্রমে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু বারিদবরণ এখনও ভদ্রাসনে আটকে আছেন হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে। সুদীপ ভাবতে থাকে ... ... ভাবতে ভাবতে বহুদূর ছড়িয়ে যেতে থাকে মন .. সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ ... তারও আরো পূর্ব পাকিস্তান ... তারও আগে শুধুই বাংলা! বারিদবরণ ট্রান্সলেশন করাতেন—

১) আমাদের পূর্ব বাড়ি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

২) গ্রামের নাম টোল।

৩) বিপিনচন্দ্র পাল টোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৪) দেশভাগের ফলে বহু বাঙালী উদ্বাস্তু হইয়া কাছাড়ে চলিয়া আসে।

৫) কাছাড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

৬) কাছাড় জেলা ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল।

বাবার মুখে-মুখে বলা বাক্যগুলো মনের মধ্যে ক্রমাগত চলতে থাকে।

ক'দিন থেকেই গোছগাছ চলছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে সুদীপ। অলস স্থবির মন নিয়ে উচ্ছেদের কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে হাত দেয়, মায়ের স্মৃতি! কতদিনের কত কথা! হাত থেমে যায়—। স্বাতী লুকিয়ে চোখের জল মোছে। গোছগাছ যেন শেষ হতে চায় না। এরই ফাঁকে নানা চিঠিপত্র হাতে এসে পড়ল সুদীপের। বড় একটা তারের মধ্যে মা ডাকে-আসা চিঠিগুলো গেঁথে রাখতেন। এর মধ্যে বহু ঠিকানা এখন হারিয়ে গেছে। মায়ের আমলের সব পুরোনো জিনিস নিয়েই সুদীপের সংসার। নতুন কিছু করে রাখার মত জায়গাও ছিলনা। আর পুরোনো জিনিসে লেগে আছে মায়ের গন্ধ। অনেক কিছুই ফেলে যেতে হচ্ছে। পুরোনো আসবাব, দাবিদার নেই। বড়দা-বৌদি কোনও খোঁজও করেনি চলে যাবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার পর। তিনদিন থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে দু'জনে। ছেলেমেয়ে দুটো শুধু আলুভাতে খেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। কেয়া বারবার প্রশ্ন করছে—

—আমরা কোথায় যাচ্ছি মা?

—জিনিস গোছাচ্ছ কেন?

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্বাতী চোখ মোছে। বাড়িটা যেন দু'টো শিবির। স্তূপীকৃত কাগজ জ্বালিয়ে দিতে হচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ে বড়দা অধীরের কার্ডে লেখা একটা চিঠি—১৯৭০ এ বমডিলা থেকে :

শ্রীচরণেষু মা,

বাড়ি ছেড়ে আমার একটুও ভালো লাগছে না। এখানে আমি চাকরি করতে পারব না। এত একা! বাড়ি ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে ভালো লাগছে না। তুমি কেমন আছ? ঔষধপত্র নিয়মিত খাও তো! 'সন্ধিনীড়' সবসময় আমাকে হাতছানি দেয় মা। বাবা যে কাঠের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসেন তাতে বাবার মাথার তেলের দাগ লেগে থাকে। সেটার কথাও যে আমার মনে পড়ে। দাগটা কিন্তু মোছো না। ভাই পড়াশোনা করে তো? ... ...

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আর পড়তে পারেনা সুদীপ। কাগজের স্তূপে চিঠিটা গুঁজে দেয়।

হোক না ভাড়াবাড়ি, তবুও দিনক্ষণ দেখেই যাওয়া স্থির করে স্বাতী। বুধবার মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বাতীর কথায় প্রতিবাদ করেনি সুদীপ। জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছু কিছু ভাঙা জিনিস পড়ে আছে। এরই মধ্যে বৌদি একবার বলে গেছে—সুদীপ, অস্থিদুটো নিয়ে যেও। শাস্ত্রের নিয়ম ছোট ছেলে অধিকারী। ... নইলে ...

—আচ্ছা।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। বড়দা আসলে মেজদা। হেমাঙ্গিনীর প্রথম সন্তান শৈশবে মারা যায়। সে'কথাই বৌদি মনে করিয়ে দিয়ে গেল। স্বাতী নাছোড়বান্দা।

—স্নান করে অস্থি তুলতে হবে।

—কেন? স্নান না করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

—আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি না?

—এর সঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকার সম্পর্ক কী?

—কুতর্ক করো না তো। স্নান করেই তুলতে হবে। মঙ্গল-অমঙ্গল বলে কথা।

—বাবা মায়ের দ্বারা কারো অমঙ্গল হয়না স্বাতী।

—লেকচার ছাড়ো। যা বলি করো তো।

অগত্যা সুদীপ স্নান করে শাবল হাতে নেয়। ছেলে দীপ্ত উল্টোদিকের মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছে। এই কর্মযজ্ঞেও সে উদাসীন; অদ্ভুত ভাবলেশহীন ছেলে। টিভি আর টিচারের বাড়ি। কেয়া মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। সুদীপ শাবল দিয়ে খুঁড়েই চলে। তুলসীগাছের পেছনে ছোট একটা কামিনী ফুলের গাছ। দু-চারটে সাদা ফুল ঝরে আছে তুলসীতলায়। সুদীপ খুঁড়ে চলে। ভাঙা কংক্রিটের টুকরো, পচা পাতা, পলিথিন, বালু সরাতেই থাকে। গর্ত গভীর থেকে গভীরতর হয়। একটা প্লাস্টিকের হাতহীন পুতুল। বোন দীপা ছোটবেলায় যা দিয়ে খেলা করত। মায়ের হাতের শাঁখার টুকরো, কত কী! সুদীপ আরও গভীরে যেতে থাকে। একসময়

ইঙ্গিত কৌটো দুটো বেরিয়ে পড়ে। মমতায় কৌটো দুটোর গায়ে হাত বোলায়। ঝরে পড়ে পুরোনো লেপ্‌টে থাকা মাটি। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে। নিজের ধুতির আঁচলে কৌটোর গায়ের মাটি মুছে নেয়। দু'হাতে কৌটো দুটোকে বুকে জড়িয়ে ধরে। স্বাতী একবার দোতলার জানালায় তাকায়। বড়বৌদি দাঁড়িয়ে। ... একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে ... ... 'বড়দি, আমরাও একদিন ... ...' একমাঘে শীত যায় না। মনে মনে আওড়ায় স্বাতী। মেয়ের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলে—

—চল্ চল্, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

কেয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে,

—আমি যাব না।' উপরের জানালার দিকে তাকায়। স্বাতী মেয়ের হাত ধরে টান দেয়। উপরের জানালা থেকে বিদায়ী হাত নড়ে ওঠে। সুদীপের পিছু পিছু স্বাতী এগোতে থাকে।

ও-পাশের মাঠ থেকে প্রবল চিৎকার ভেসে আসে—'বোল্ড। বোল্ড। গোল্ড আউট'।

বাড়িটা খুবই জীর্ণ। কাঠের বাড়ি দেড়তলা। কাছাড়ে ঝড়বৃষ্টি বেশি। একসময়ে বৃষ্টি পড়লে ১০/১২ দিন ব্যাপী চলত। এখন অবশ্য তত বৃষ্টি হয় না। কিন্তু বন্যা হয় বেশি। এ অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণও। বন্যার কথা ভাবতেই মেরুদণ্ড দিয়ে শিহরণ বয়ে যায়। বর্ষায় বাড়ি টিঁকবে তো? বন্যায় ছেলেমেয়ে নিয়ে বরাকের জলে না ডুবে যায় শেষ পর্যন্ত! আর ভাবতে পারে না সুদীপ। যা হবার তা-ই হবে। ঘন ঘন সারা অঞ্চল জুড়ে মৃদু ভূমিকম্প হচ্ছে গত ২/৩ মাস ধরে। পত্র-পত্রিকা নানা খবর ছড়ায়। হয়তো গুজব। উত্তর-পূর্বাঞ্চল না কি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তলিয়ে যাবে। গেলে যাবে। 'মারে কৃষ্ণ রাখে কে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?' কাঠের বাড়িগুলো খুব পছন্দ সুদীপের। কিন্তু এখন দালান কোঠায় ভরে যাচ্ছে চারদিক। ডেভেলপমেন্ট অথরিটির রমরমা। দেড়-দুই কাঠা জমির উপর বাড়ি তৈরী হচ্ছে। সুদীপ নিজেও তো ফ্ল্যাট কিনতে বাধ্য হয়েছে। টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে প্রমোটার—কিন্তু বাড়ি শেষ হচ্ছে না। শুয়ে শুয়ে অলস চিন্তা করে সুদীপ। যদি এমন খোলামেলা জায়গায় বাড়ি করা যেত! পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু, গোলায় ধান, বক্‌বকম্ পায়রা। আর কামিনী, বকুল, ছাতিম নিয়ে বড়ো উঠান! ভেতরে বারিদবরণ কথা বলে ওঠেন। ফিরে ফিরে আসে পুরোনো বাড়ির স্মৃতি।

সকালে নদী থেকে একটা হিমেল হাওয়া উঠে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল বাড়িময়। কুয়াশায় ঢেকে গেছে নদী। উৎপলের বাড়িতে সুদীপ ভাড়া থাকে! সুদীপ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। স্বাতী ঠাকুর নিয়ে ব্যস্ত। অনেক জিনিস এদিক সেদিক গচ্ছিত রেখে এলেও স্বাতী ঠাকুরের আসন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ভাঙা পুরোনো বাড়ি নিয়ে অবিরাম ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছে। শাপ শাপান্ত! কিন্তু বাড়ি ছাড়বে না, ছাড়বে না করেও শেষ পর্যন্ত উঠে আসতেই হল। বাইরে পাখির কিচির মিচির। গরাদহীন জানালা দিয়ে তাকালে নদী দেখা যায়। কুয়াশার ভেতরে আবছা নৌকো। এমন নৌকোয় কি সত্যবতী খেয়া পারাপার করত! অলস মনে ভাবে—

'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না—'

স্বাতীর ঝাঁঝালো আওয়াজে খোয়াব ভাঙে।

—এনে তো ফেলেছ ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর। এত নোংরা গলি। মেয়েটা বেরোয় কী করে? দু-ধারে পুকুর!

—কয়েকটা মাস অপেক্ষা করো স্বাতী।

—এ তো শর্বরীর অপেক্ষা হয়ে যাচ্ছে।

—সবুরে মেওয়া ফলে।

—মেওয়া অনেক ফলেছে। ওঠো, মুখ ধুয়ে চা খাও। উদ্ধার করো আমাকে।

সুদীপ বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে টের পায় খাট যেন নড়ছে। নাহ্। আবার পরীক্ষা করে—না তো! ভাবে মনের ভ্রম। তবুও যেন মৃদু কম্পন!

গত ক'দিন থেকেই সুদীপ টের পাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ যেন ভিত কেঁপে উঠছে! হয়তো মনের ভুল। রোজকার অভ্যাস মতো ব্রাশ নিয়ে বেরোয়। দাঁত মাজতে মাজতে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে আর হিসেব করে ফ্ল্যাট শেষ হওয়া পর্যন্ত এ বাড়িতে টিঁকতে পারবে তো! চলে আসার পর দাদা বৌদি কোনও খবর করেনি। বোনেরা এসে দেখে গেছে। মাঝে মাঝে ফোনে কান্নাকাটি করে।

হাঁটতে হাঁটতে উঠোনে বেরোয়। সকালবেলা বারিদবরণ আর হেমাঙ্গিনীকে একবার স্মরণ করে সুদীপ। স্বাতী নদীর দিকে বাড়ির শেষ সীমানায় একটা আমগাছের নীচে অস্থি দুটোকে পুঁতে রেখেছে। যথারীতি সকালে স্নান করে জল দেয় সুদীপ আর সন্ধ্যায় স্বাতী দেখায় প্রদীপ। সুদীপ ভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে এক কাপড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন। অনেক সংগ্রাম করে কাছাড়ের মাটিতে একখানা বাড়ি করেছিলেন। বারিদবরণের উদ্বাস্তু হওয়া ঘুচল না। এখন উৎপলের বাড়ি তে। আসলে সবাই বাহাদুর শাহ্ জাফর। ফ্ল্যাটে গেলে কোথায় স্থান হবে তাঁর। গয়াতেই বা কবে যেতে পারবে সুদীপ! হঠাৎ দীপ্তের চিৎকারে নদীর দিকে চোখ ফেরায়।

—পাপ্পা, পাপ্পা, দেখে যাও ...' উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নাড়ে দীপ্ত।

—কী হয়েছে বলবি তো!

—এসো না দেখো এসে, বলে হাত তুলে দেখায়।

সুদীপ এগোয়। উঠোনের শেষপ্রান্তে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জমিতে বিশাল হাঁ মুখ গহ্বর। এক দীর্ঘ ফাটল উঠোনটাকে দু-ভাগ করে নদীর দিকে বসে গেছে। আমগাছ মাথা এলিয়ে নদীর দিকে পড়ে আছে। দু-তিন ফুট দূরে বসে গেছে অনেকখানি জমি। সে খুঁজে চলে স্বাতীর পোঁতা তুলসীগাছ যার নিচে বারিদবরণ আর হেমাঙ্গিনী শুয়ে আছেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। তখনও টুপটাপ মাটি ঝরছে। আর সেই ফাটল ক্রমশ নদীর দিকে নেমে বরাকের স্রোতধারায় মিশে গেছে।

ঝুমুর পাণ্ডে

কথা বল লক্ষীন্দর

কাউয়া করে কা কা
কোথায় গো বেহুলার মা
বেহুলা সুন্দরী কইন্যা
জলে ভাইসে যায় .. ...

ভাইসে যা ভাইসে যা সব ভাইসে যা। ঝাড়ুর বাঁশগুলোকে দা দিয়ে চাঁচতে চাঁচতে ভেতরে ভেতরে খিঁচিয়ে ওঠে লক্ষীন্দর। এমনি করে সেই ছেলেবেলা থেকেই তো খিঁচিয়ে আসছে। কুসুম মাস্টার যখন নামতা না-পারার জন্য কান ধরাত। ইস্কুলের বারান্দায় সাপের ডিম এনে ফাটানো জন্য উঠ-বোস করাতো। তখনও ভেতরে ভেতরে রেগে উঠত লক্ষীন্দব। এই তো সেদিন উগ্রপন্থীরা ভগবানপুর থেকে কালা মিঞা আর ওর ভাইকে ধরে নিয়ে গেল। এইদিন লক্ষীন্দরেরও ঘরে ঢুকে গরু বেচার এক হাজার টাকা, তার কাছে রাঁধা ফান-ভাতটুকুও খেয়ে গেল। ওই দিনও ভেতরে ভেতরেই রেগেছে লক্ষীন্দর। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোয় নি। তারপর কালাইন চা-বাগানের ম্যানেজারের বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন পালাচ্ছিল উগ্রপন্থীরা ওইদিনও জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ আনতে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে দেখছিল লক্ষীন্দর। বাচ্চাটার মুখে কাপড় গোঁজা দেখে হাতদুটো নিসপিস করছিল। ভেতরটা রাগে দুঃখে পুড়ে যাচ্ছিল। তবু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় নি। বেরোয়নি সে কথা ভালই হয়েছে। কেনে?

নইলে তোকে আর বাঁশ চাঁচতে হত না লক্ষীন্দর। তা বলে লেড়কাটাকে ... ...

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় লক্ষীন্দর। মেঘগুলো হাত ধরাধরি করে জমছে। হেলে আছে চাঁদটা। আজ কোন তিথি? কে জানে! বলতে পারত রামীর মা। সেবার হাতির দল সবার সঙ্গে লক্ষীন্দরেরও দুই কিয়ার ধান খেতি মাড়িয়ে রামীর মা'কেও পা দিয়ে মাড়িয়ে

চ্যাপ্টা করে দিল। ওই বারই পুজোর বোনাসের জন্য গুলি খেয়ে মরল রামীর মামা সুবল। ওর ছোট্ট ছেলেটা নাকি তখন মেড় দেখছিল। খড় বাঁধা মেড়। তখনও একতালও মাটি পড়েনি গায়ে। আশ্চর্য! চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়েনি লক্ষীন্দরের। শুধু রাগে হিস্ হিস্ করেছে সারা শরীর। হিস্ হিস্ করতে করতেই হাতিমারা শিকারির সঙ্গে ঘুরেছে ক'টা দিন। তার বাদে ... ...

ভাদ্রমাসে ভরা গাঙ অকূল পাথার
কেমনে আসিবে মা জানে না সাঁতার ...

—লক্ষীন্দর। হে লক্ষীন্দর!

—কি?

—যাবিস?

—কাঁহা?

—কেনে?

—কাউয়া ফল খাব।

—চ' ..

লক্ষীন্দরকে গাছে উঠিয়ে যখন চিতার গন্ধ পেয়ে পালিয়ে এল সনাতন, ওইদিনও শুধু রাগে জ্বলেপুড়ে গেছে সাত-আট বছরের ছোট্ট একটা শরীর। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় নি। আজও চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই বয়সের সারাটা শরীর জ্বলে যায় সনাতনের বউটা যখন শরীর দুলিয়ে হাত মটকে, চোখ মটকে অ্যালুমিনিয়ামের কলসিটা দোলাতে দোলাতে (নাকি লক্ষীন্দরকে পোড়াতে পোড়াতে) জলকে যায়। আকাশের দিকে আবার তাকায় লক্ষীন্দর। মেঘগুলো হাত ধরাধরি করে এতক্ষণ বেশ জমছিল। এখন কি ভেবে আবার উড়ে যাচ্ছে। উঠোনের ধারে রামীর মায়ের লাগানো বেলফুলের গাছটা এক গা ফুল নিয়ে হাসছে। রাত পাখিটা আকুল হয়ে ডাকছে ঝি উঠ। ঝি উঠ, বউ উ ... ...

বাঁশগুলো আবার কাটে, আবার চাঁচে লক্ষীন্দব। নিজের শরীরটা দেখে। ছ'ফুট শরীরটা এখন বেঁকে গেছে কয়েক ইঞ্চি। সাদা ধবধবে রঙ এখন তামাটে মাথার সোনালি চুলগুলোও কেমন জট পাকিয়ে গেছে। এই সাদা ধবধবে শরীরটা আর সোনালি চুলগুলো দেখেই না তখন মুখ টিপে, চোখ টিপে হাসত সনাতন। বলত কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে বাঁশ কড় লিখিস কেনে? তুই তো মেকে সাহেবের পয়দা। লক্ষীন্দর সোজাসুজি সনাতনের দিকে তাকাতেই থতমত খেয়ে বলত, 'ঝুট বলছি? পুছিস। তোর মা'কে পুছিস। সব্বে জানে।' তখনও রাগে হিস্হিস্ করত সারা শরীর। মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোত না। বলতে ইচ্ছে করত শালা তোর বাপের বাপের বাপ তো শালা আড়কাঠি ছিল। আড়কাঠি গোষ্ঠী। ভুলায় ভালায় দেশ

ছাড়া গাঁ ছাড়া করে লিয়ে আইসেছে এই চা-বাগিচার সাদাসিধা মানুষ গিলানকে। জানি শালা সব জানি। এই লাগি তো ... ... কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোলে তো বলবে লক্ষীন্দর। চা-বাগানের লেড়কা দফায় ঢুকেছিল লক্ষীন্দর সেখানেও জন্মশত্রু সনাতন। নম্বরে চা-পাতার সবুজ গন্ধ গায়ে মেখে লুকোনো বাঁশিটা বের করে চাম কাঁঠালের গাছটার তলায় বসে একটু ফুঁ দিয়েছিল আর সনাতন সর্দারকে চুগলি লাগিয়ে সাতকান করে ... ... ওইদিনও রাগে রি-রি করেছে সারা শরীর। আরেকদিন তলপ শালের বাজার থেকে বাদাম কিনছিল আর সনাতন ... ওইদিনও রাগে ... ধেৎতেরি যত্তসব ... আবার আকাশের দিকে তাকায় লক্ষীন্দর। তারায় তারায় ছয়লাপ আকাশ। আরে, চাঁদটা কোথায় গেল?

লাল ফুল লীল ফুল
রক্ত ফুলের মালা
কেমনে পুজিব মাগো
চরণ কমলে বলো . ...

—হে লক্ষীন্দর?

—কি?

—বাইরে আয়।

—কেনে?

ঘুমচোখে বাইরে বেরুতে বড় ভয় পায় লক্ষীন্দর। তবু বেরিয়ে আসে।

—এই ব্যাগটা রাখ। পরে এসে নিয়ে যাব।

—কি আছে গো ব্যাগে?

—নেশা রে নেশা।

—মণিপুর লে আনছ?

—হঁ। কেনে?

মায়ানমার থেকে মণিপুর হয়ে আসে। জানে লক্ষীন্দর। বটতলার সুভাষের দোকানে সবাই বলাবলি করে। তা বলে লক্ষীন্দরকে রাখতে হবে? কি আপদ ...

—পুলিশ যদি আসে?

—আসবেক নাই।

সারা শরীর গুলিয়ে উঠেছিল লক্ষীন্দরের। ভাত খেতে পারেনি কদিন ভাল করে। তবু ভেতরে ভেতরেই শুধু খিঁচিয়েছে। রাগে ঝরঝর হয়ে গেছে সারা শরীর। তবু জ্বলে উঠে দুটো কথা বলতে পারেনি লক্ষীন্দর।

কি যে জ্বালা—

কলার মাঞ্জা বানায়ে দে গো

চান্দ সদাগর ... ...

ভেসে ভেসে চলে যাব উজানি নগর।

কলার মাঞ্জা।

আবার বাঁশ চাঁচে লক্ষীন্দর। কাল কতটা যে ঝাড়ু হবে। লক্ষীন্দর বাঁশফড় ঝাড়ু বানাবে না তো কি বানাবে? হোক না মেকে সাহেবের পয়দা। মা তো সেই ডোমই ছিল। রাবণকে আর ক'জন ঋষি বলে রে লক্ষীন্দর? রাক্ষসই তো বলে। জয় মাতা। আশ্চর্য, মায়ের মুখটাই মনে করতে পারে না লক্ষীন্দর। শুধু মল পরা দুটো পা। মুখটা? না—একদম মনে করতে পারে না।

ওলো ওলো কালো ছোঁড়ি

তোর যে বড় নাম শুনি

বাংলার ভেতর কদম কলি

সাহেবের মন ভুলালি

ছি ছি লাজ লাগে না

কালো মুখে পান খাওয়া

তোর সাজে না . .

বাবারে বাবা কী ঠমক ছমক।

কার?

কার আবার? সনাতনের বউটার। আজ আবার পায়ে মল পরেছে। ছমছম, ঝমঝম উঠছে শব্দ। যেন লক্ষীন্দরের বুকের উপর দিয়ে হাঁটছে। মরদ ছাইড়ে আসেছিল সনাতনের ঘরে। অত গরম কীসের? আবার আকাশ দেখে লক্ষীন্দর। মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে সারা আকাশ। পেটটা চোঁ-চোঁ করছে। এখনও বাঁধাবাড়া হয়নি। বেলফুলের গাছটা গা-ভরা ফুল নিয়ে যেন লক্ষীন্দরকেই দেখছে।

বড়বাবুর ওই কোঠাটায়

ওই ছোঁড়িটা কে বটে

হাতেতে ডায়মন্ড কাটার বালা

কি মজাতে আইসেছে ... ...

ধেৎতেরি। আবার আসছে সনাতনের বউটা। কাজললতার তরকারি দিয়ে ভাত মাখে লক্ষীন্দর। সকালের ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। এত রাতে কে আর রাঁধে? শুধু কাললতাটাই রেঁধেছে দুটো পুঁটি চিংড়ি দিয়ে। দুপুরে সুপল বিল থেকে দুটো পুঁটি চিংড়ির সঙ্গে একমুঠো কাজললতাও তুলে এনেছিল। তাই এখন রেঁধেছে পেঁয়াজ আর লঙ্কাবাটা দিয়ে।

—লক্ষীন্দর, হে লক্ষীন্দর।

এত রাতবিরেতে কে চেঁচায়?

—কে গো?' খেতে খেতেই মুখ বাড়ায় লক্ষীন্দর। মুখজুড়ে পুঁটি চিংড়ির স্বাদ কেমন লুটোপুটি খায়।

—বাহিরে হো।

—ভাত খাচ্ছি গো। কাজললতা দিয়ে।

—রাখ তোর কাজললতা ভাত।

—মাখা ভাত ফালায় যাতে নাই গো। মা বলেছে।

—বাইরাহ্ শালা।

—কাজললতা ভাত ফেলে বেরিয়ে আসে লক্ষীন্দর।

মেঘ সরে গিয়ে এখন ঝলমল করছে বড় মায়াময় চাঁদ। আর ওই চাঁদের আলোয় লক্ষীন্দর অবাক হয়ে দেখে ধর্ষিতা হচ্ছে এক মেয়ে মানুষ না, এক নারী। আশ্চর্য এক নারী। চরাচর জুড়ে শুয়ে আছে। হাঁ করা মুখ। দুটো স্তন থেকে গড়িয়ে পড়ছে আহা কী অমৃতধারা! ছুটে যা লক্ষীন্দর। ছুটে যা। তোর এত বড় শরীর এত বড় হাতি কোন্ কাজে লাগালি রে। যা যা। যা শালা যা। ধর্ষিতা নারীর মুখটা চাঁদের তেরচা আলোয় এখান থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লক্ষীন্দর। ওটা কি ওর মায়ের মুখ না মেয়ে রামীর? না, রামীর মায়ের? সনাতনের বউটার মতোও তো লাগছে। আর ধর্ষকের মুখটাও তো চেনা চেনা। যা যা লক্ষীন্দর, যা রেগে উঠে, জ্বলে উঠে একবার অন্তত কথা বল। তোর ভেতরের পুঞ্জীভূত রাগগুলিকে, বুকের অতলে জমিয়ে রাখা দুঃখগুলো ছড়িয়ে দে। কথা লক্ষীন্দর অন্তত: এই সময়ের কথা বল। পাতিমারা চা-বাগানের গাছ গাছালি, চাঁদ তারা, মধুরা নদী, পুজোর বোনাসের জন্য জান দেওয়া সুবল সবাই অপেক্ষা করে আছে লক্ষীন্দর ... ...

মায়ের দুধের দাম
উসুল করতে পারলাম না
মাগো তুমি কেঁদে কেঁদে যেও না ... ...

চেয়ে দেখ লক্ষীন্দর আজ নত হয়েছে গাছগাছালি, যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেছে নদী। থম মেরে আছে নবমীর চাঁদ, আকাশ সমগ্র চরাচর! কথা বল লক্ষীন্দর ... ...

তাজা চা-পাতার গন্ধ ফুসফুসে ভরতে ভরতে লাল শিরীষের ফুল মাড়িয়ে এক অন্য জগৎ সংসারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার পিছন ফিরে একবার তাকাল লক্ষীন্দর।

ঝুমুর পাণ্ডে

স্বপন কথা

১. দুখীরামের কথা

ভাঙা পাল্লা-পাথরে আড়াই শো নিমক মাপতে মাপতেই ঝমঝমিয়ে আবার বৃষ্টি নামল। তবু কথা থামে না দুখীরামের। ধানক্ষেত, পদ্মবন, গহীন গাঙ আর থালার মত ঝলমলে এক আস্ত চাঁদ। চাঁদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে চাঁদপরীরা ... ... তারপর ধানক্ষেত, গহীন গাঙ দেখতে দেখতে নেমে যায় পদ্মবনে।

—শালা কী স্বপন!

—হামি জানিস রোজ দেখি।

—রোজ?

—হুঁ শালা রোজ দেখি। হামার বাপ দেখত। উওয়ার বাপও দেখত।

—সচ বলছিস দুখীরাম?

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলে লক্ষণ পাঞ্চাইতের বেটা সুকর্ণ। সচ্ না তো কী? বাপ দেখত কালিয়াদহে সেই কমলে কামিনীর হাতি গেলার স্বপন। ভারত মাস্টারের কাছে চণ্ডীকথা শুইনে শুইনে ... ...

—নিমকটা দে কাকা। ঘরে যাই।

—লে। কত দিলিস গো?

—আড়াইশো।

—আড়াইশো? আধা কেজি ন বললি?

—হামার পুরা দোকানেই এখন আড়াইশো নিমক আছে। ফেলাডে কোনও আর টাউনে

যাতে পারছি? আড়াইশো নিমকে তো চা খাতেই শেষ হবেক।

কিরতা পাতায় বাঁধা আড়াইশো লবন নিয়ে চলে গেল বিভীষণের বেটা সুকর্ণ। ওদিকে তাকাতে তাকাতে দুখীরামও একটা বিড়ি ধরিয়ে সোজা হয়ে বসল।

—দাল দে।

—কত?

—একশ'।

পরাণের বউটাকে দেখলেই দুখীরামের বুকের ভেতরটা কেমন ধড়াস ধড়াস করে। তারপর মনটা কেমন উড়ু-উড়ু করে আকাশ-পাতালে ঘোরে। কিন্তু পাত্তাই দেয় না বউটা। কেমন কোমর দুলিয়ে ফটাস ফটাস করে চলে যায়। কথাও বলে কেমন কটাস কটাস করে। এখনও ডাল নিয়ে চলে যেতেছিল। সুকর্ণর কথায় ঘুরে দাঁড়াল।

—কি?

—পরাণকে বলে কাল থানায় নিয়ে গেছল?

—হুঁ।

—ছাড়ে দিয়েছে?

—হুঁ।

—কত লিল?

—একশো।

—শালা তবু ধান্দা ছাড়াবেক নাই।' বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বলল সুকর্ণ।

—হঁ। কাল সানঝের সময় ঝিলে যায়ে দেখলি পরাণ মদ বানাচ্ছে।' বিড়িটা আটার টিনের উপর রেখে বরাণের বউটাকে ডাল দিল। এখন বিড়িটা তুলতে গিয়ে দেখে অনেকটা জ্বলে গেছে। 'জল তো এদিকেও বাড়ছে দুখীরাম। ধুপঘরের সামনেও জল। নম্বরেও বলে জল ঢুকছে। শোন সুকর্ণ হামার পরাণদাদাও স্বপন দেখত।'

—এখন রাখ তোর স্বপনের কথা। চিন্তা লাগছে ডুবে না মরি।

—কিন্তু জানিস হামার বেটা দুলারামের কোনও স্বপন নাই।

দুলারীর মেয়েটা মাথায় ছপি নিয়ে হাঁটুপানি ভেঙে এসে দোকানটার একচিলতে বারান্দায় উঠল।

—কি লিবিস?

—কুকিস।

—ক'টা?

—দুটা। জলদি দে। ভাইটা কান্দছে। প্রায় আমসির মতো কুকিস নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই প্রায়

ছুটে গেল মেয়েটা। এবার মেঘ ডাকল। বৃষ্টিটাও তেড়ে এল। পাঞ্চাইতের বেটা বাঁশের বেঞ্চি থেকে নেমে এল। হাওয়ায় কাঁপছে দুখীরামের পলিথিনের ছাদ, বাঁশের বেড়া তিনফুট বাই চারফুটের আটা কুকিস নুন বিস্কুটের দোকান। সেই ছত্রিশ বাংলার গোলা। তখন নাকি দুখীরামের বাপের জনম হয়েছিল। দাদির মুখে সেই ঘোলা জলের কাহিনী শুনে শুনে ... ...। কতজল শুধু জল, জল, জল ... ...। তেড়ে এল রাক্ষসের মতো জল ...। মানুষ গোরু মোষ সব টিলাটক্করে উঠল। কতক ভাইসে গেল। এদিকেও তো জল বাড়ছে। পাঞ্চাইতের বেটা ঠিকই তো বলে গেল। এখন জল এসে গেলে দোকান সামলাবে না ঘর? ঘরেও তো সেই ... ধেৎতেরি পদ্মবন, গবীনগাঙ, ঝলমলে চাঁদ, পরাণের বউ, দুখীরামের সব স্বপন মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেটা দুলারামের কেনে কোনও স্বপন নাই ... ...?

২. দুলারামের কথা

দশ কেলাসে পড়ার সময়ই কেলাবঘরে মাথায় না কাঁধে হাত রেখেছিলেন দাদা। দুলারামের চোখ দুটো যেন বুজে এসেছিল। কেঁপে উঠেছিল সারা শরীর। দুখীরাম, বুড়হি দাদির সব আশায় ছাই ঢেলে তখন থেকেই তো পড়াশোনায় ইতি। কত কাজ তখন দুলারামের। সামনেই ভোট। তারপর তো পাঁচবছর গড়িয়ে গেল। ওরা অবশ্য বলেছিল বসে যা দুলারাম ওই যে অনেকদূরে ইস্কুলটায়, পাশ করানো আমাদের হাতে। কিন্তু বসব বসব করেও আর বসা হয় না দুলারামের। কত রকম কাজ। কেলাব ঘরও আজকাল ওকেই সামলাতে হয় কিনা। ভোটের সময় তো আর কথাই নেই। বিনিময়ে চা-বিস্কুট, কখনও বিলাইতি মদ, শ'দেড়েক টাকায় পালতু কুত্তা হয়ে গেছে দুলারাম। কারওর মুণ্ডু কাটতেও এখন ভয় পাবে না হয়তো একসময়ের লাজুক মুখচোরা দুলারাম। বাপ দুখীরাম ভেবেছিল বেটা বাবু হবেক। নিদেনপক্ষে পিয়ন। কিন্তু কোথা? দাদার দয়ায় কত ফাইভ পাশ, প্রথম শ্রেণী পাশ, এমনকি নামসইও জানে না এমনও ছেলে পিয়ন হয়ে গেল। শালা কতদিন চামচাগিরি করবি? চকচক জুতা পরে টেপ বাজাবি? মস্তানি করবি? এক এক সময় খুব ক্ষেপে যায় দুখীরাম। তোর পরদাদা দাদিরা শালা চা বাগান ছাইড়ে ভাগতে গিয়া গোরা সেনাদের হাতে জান দিয়েছিল। আর তুই ... ...। বোনাসের লাগি গুলি খায়ে মরেছে হামার মামা আর তুই কি না ... ...। কিন্তু কোনও নড়চড় হয় না দুলারামের। তখন গান শোনে, নয়তো পান চিবোয়। সুগন্ধি পান। শিলকিঙ করতে করতে যখন টিলা থেকে পা পিছলে পড়ে হাত ভাঙল দুখীরাম, তখন ওর কাজটাতে দুলারামকে ঢোকানো অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোথায়? বেটা শুনলে তো কথা।

—হামি শিকলিঙ করব নম্বরে?' নিজের চকচকে জুতো আর নিপাট পোশাকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল দুলারাম।

—শিকলিঙ করবিক কেনে? তোখে দোসরা কাজ দিবেক। নম্বরে পানি খাওয়াবি।

—পানিওয়ালা? উ হামি হতে নাই পারব।

এই করে বাগানের রেজিস্ট্রি কাজটা হাতছাড়া হয়ে গেল দুখীরামের। বাদে ফাগুের কিছু পয়সা-কড়ি পেয়ে দোকান দিয়ে বসল। তাও সবাই বাকি খেয়ে খেয়ে ... ...।

—দুলারাম। হে দুলারাম।

গোহালঘরে টেপ বাজিয়ে 'লগান'-এর গান শুনে শুনে চকচকে জুতোকে ব্রাশ করে আরও চকচকে করতে করতেই মুখ তুলল দুলারাম—'কী হল?'

—শালা জল আসছে। মেঘ পড়ছে। আর তুই জুতা বেরাশ করছিস? শালা হাঁটুপানি থানের সামনে।

—কামের কথা বল।

—আজ দাদা আসবেক। তুই মানুষকে খবর দিস।

—দিব। দিব। যা যত সব।

—গরম দেখাচ্ছিস কেনে? পলু দাদা বলল তোখে বলতে এর লাগি .. ..

—ঠিক আছে যা।

এমনিতেই দু'দিন থেকে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। বিদ্যামতীর শাদি ঠিক করেছে ওর বাপ এক ইস্কুলমাস্টারের সঙ্গে। এতদিন দুলারামের সঙ্গে লাইন মেরে শেষে কিনা ... ... ওর বাপও তো জানত ভাল করে। শ্রীকৃষ্ণ সিনেমাহলে 'কহো না প্যার হ্যায়' দেখাল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চপ খাওয়াল। গেল পাঞ্চাইত ইলেকশনের সময় মারামারি করে টাকা পেয়ে একটা লালরঙের চুড়িদারও কিনে দিয়েছিল। আর ওর বাপ যখন বেমার হল তখন অ্যাম্বুলেন্স মেডিক্যাল কে করল? আর এই যে ইস্কুল মাস্টার উওয়ার চাকরিটা কার লাগি হইল? দাদার কাছে কত হাঁটাহাঁটি, জমিন বেচার টাকা সমঝানি। দুসরা সরকার এসে ফেলে দিয়েছিল। কী ঝামেলা। বাদে আবার দৌড়াদৌড়ি—সব তো দুলারামই করল। শুধু চা-মিষ্টির বিনিময়ে। বলেছিল একটা প্যান্ট-শার্ট দিবে। কিন্তু আর দিল কোথায়? কিন্তু শেষে কিনা এত বেইমানি! তাও দুলারামের সঙ্গে! শালা চশমখোর একটুকুন কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই। বলবিস তো মানুষকে?

—কি বলব যায়ে পলু দাদাকে?

—যা যা যাব, যা।

—জলদি আসিস। সব গোছগাছ করতে লাগবেক।

দুলারাম আবার ব্রাশ করে জুতো।

আকাশটা কালো করে আছে। কত বড় বড় মেঘের চাঙড় জমাট বেঁধে ঘোরাঘুরি করছে আকাশময়। কতদিন থেকে মেঘ মেঘ বৃষ্টি শালা রোদের নাম পর্যন্ত নেই। কাপড়-চোপড়ও শুকোচ্ছে না। দু'দিন আগের ধোয়া প্যান্ট এখনও শুকোয়নি। ভাল প্যান্ট বলতে তো ওই একটাই। যাবে কী করে? দাদা আসবেন পলুদাদা বলে পাঠাল যেতে। রাখালের ইস্তারিটা এনে ইস্ত্রি দিয়ে শুকোনো যায়, কিন্তু আগুন? এখন যত ভিজে বাঁশ-লাকড়ি নিয়ে বুড়হি দাদি

আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। এখন আগুন চাইলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে। আগে এমন ছিল না। এখন সারাদিন শুধু ক্যাটক্যাট করে। চোখেও দেখতে পায় না ভাল করে। ধুর্, যত্তোসব! আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। কাকটা নিমগাছে বসে ভিজছে কতক্ষণ থেকে। ঝড়ে ওর ঘরদোর বোধহয় সব ভেঙেছে। আবার আকাশের দিকে তাকাল দুলারাম। ধলি এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যামতীর মুখটা যেন, যেন সারা আকাশজুড়ে হাসছে না কাঁদছে! আস্তে আস্তে বিদ্যামতীর মুখটা মায়ের মুখ হয়ে গেল। দুলারামের জনমের পরেই নাকি মা'টা চলে গিয়েছিল এক ড্রাইভারের সঙ্গে। তার বাদে বাপ আবার শাদি করেছিল। ওই বউটাও নাকি হাঁটুজলে ... ... ধেৎতেরি মায়ের মুখটা কেমন ছিল কে জানে? একবার নাকি ড্রাইভারের ঘর-সংসার ফেলে মা'টা এসেছিল দুলারামকে দেখতে। কিন্তু বুড়হি এমন ঠেঙাল ... ..। বৃষ্টিটা যেন আরও জোরে তেড়ে আসছে। বাজ পড়ল কোথায়! বাপ কত স্বপনের কথা বলে—পদ্মবিল, গহীন গাঙ; কিন্তু দুলারামের কোনও স্বপন নাই। কোনও স্বপ্ন দেখেনি কোনও দিন। কে জানে কেন যে দেখে না। এমা! আমগাছটার একটা ডাল ভেঙে পড়ল গোহালের চাল ঘেঁষে। ধলিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। গাভীন গরু, একটু হলেই ... ...। আবার বাজ পড়ল। গাছ-গাছালি যেন থর থর করে কাঁপছে।

—দুলারাম। হে দুলারাম ... ...

বাঁশের ফুকনি দিয়ে ভিজে লাকড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে লাল চোখ মেলে বেরিয়ে আসছে বুড়হি ... ...

৩. বুড়হির কথা

সেই ছত্রিশ বাংলার গোলার বাদের বছরই জনম হয়েছিল দুখীরামের মা দুলারামের দাদি বুড়হি মন্দোদরীর। গুরুবাবাই নাম দিয়েছিল তাও নাকি শঙ্খ ফুঁকে। বাপের পাঁচ বেটার পর বেটি শঙ্খ ফুঁকবে না তো কী? আগে বিহার থেকে আসত গুরুবাবারা এখনও আসে কারও কারও। মন্দোদরীদের গুরুবাবা আসেন নি অনেক বছর। মন্দোদরীর যে নামকরণ করেছিল ওর নাতি নাকি এখন গুরুবাবা হয়েছে। বাবা এলে আগে মন্দোদরীকে খুব ছুটোছুটি করতে হত। এসেই বাবা শঙ্খ ফুঁকত। ওই শঙ্খ শুনলেই লোকে ভেবে দিত গুরুবাবা পদার্পণ। তারপর গোহাল ঘর নিকোনো ঝাড়পোঁছ করে তকতক করা, ঋণ করে গুরুর আটা, ঘি, সুগন্ধি চাল জোগাড় করা। ইস্কুলে পড়েছে মন্দোদরী দুই কেলাস। নামটা কোনোমতে লিখতে পারে বাঁকাচোরা করে। তখন ভরত মাস্টার। বলত মাস্টার মন্দোদরীদের পূর্বজরা চা-বাগান ছেড়ে পালাতে গিয়ে সেই ... ... রেল থেকে নেমে ইস্টিমারে ওঠার সময় গোরা সেনাদের গুলি খেয়ে কেমন ছটফট করে মরেছিল। ওদের বাগান থেকে বের করে এনেছিলেন নাকি পূজারী দেওশরণ ত্রিপাঠী। অসহযোগ আন্দোলনে পড়ে গ্রেফতার হয়ে যোরহাট জেলে চল্লিশ দিন অনশন করে শহীদ হন। দুখীরাম শুনত এ'সব গল্প-কথা, কিন্তু নাতি দুলারাম তো

কিছু শুনতেই চায় না। সব সময় কেমন একটু উড়ু উড়ু ভাব নিয়ে খিটখিটে হয়ে থাকে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল ছেলেটা। কিন্তু ওই নেতা-ফেতাদের চক্করে পড়ে ছেলেটা কী যে হয়ে গেল। কিন্তু এই মেঘ বৃষ্টি তো ছাড়ারই নাম নিচ্ছে না। বাবা ছত্রিশ বাংলার গোলা না হয়ে যায়। কতদিন থেকে বুড়ির শুযনি শাক তোলা বন্ধ। এই ঝড়বৃষ্টিতে যাবে কী করে? জঙ্গলে ঢুকে দুটো জংলি বেগুন, একমুঠো কচুশাক, দুমুঠো বাবুভাজি তুলে আনে বুড়ি। কখনও বিল থেকে কাজললতা। ছানিপড়া চোখ দিয়ে দুলারামদের কোনওমতে রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। আগে জংলি আলুও আনত। আজকাল আর মাটি খোঁড়ার শক্তি নেই বুড়ির। একটু পরিশ্রমেই আজকাল কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। সকাল থেকে দুটো রুটি করতে পারছে না। ভিজে লাকড়ি থেকে কোনোমতেই আগুন ধরছে না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে সারা ঘর। রেখেছিল বাঁশের মাচার উপর। কিন্তু জল চুঁয়ে চুঁয়ে সব ... ... মেঘবৃষ্টিকে শাপান্ত করতে করতে আবার বাঁশের ফুঁকনি দিয়ে উনুনে ফুঁ দেয় বুড়হি ... ...

৪. জল এবং শেষের কথা

দিনের বেলা প্রায় হাঁটুজল কোমরজলে দাঁড়িয়ে দুখীরামরা নেতা মন্ত্রীদের কপ্টার-বিহার দেখেছে। দেখেছে বুকজলে দাঁড়িয়ে দুলারামও। এখন পুরো এলাকাই ভাসছে। দুখীরামের দোকানঘর, ভিটেঘর, ধুপঘর সব জলের নীচে একাকার হয়ে গেছে। ভাসছে দুলারামও। পরাণের বউ, পাঞ্চাইতের বেটা সুকর্ণ, বিদ্যামতী, ইস্কুল মাস্টার। বিভীষণের বেটা সুগ্রীব, দুলালীর বেটি আরও কে কে জানি ডুবছে, ভাসছে। আহারে, কত মুণ্ডু শুধু ভাসছে আর ডুবছে, ডুবছে আর ভাসছে।

আরে! বুড়হি কোথায় গেল?

আচমকা চিল-চীৎকার দিল দুখীরাম। বাঁশের বোঙায় তুলে দিয়েছিলাম গো। ভাসতে ভাসতেই বলে দুলারাম। গলায় নাইলনের রশি নিয়ে গাভীন ধলিটাও ভাসছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। বৃষ্টিটা এখনও পড়ছে ঝমঝমিয়ে। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাজও পড়ছে ঘন ঘন।

দুখীরাম তবু ডুবতে ডুবতে, ভাসতে ভাসতে ... ...

স্বপন দেখে সেই ধানক্ষেত, পদ্মবন, গহীন গাঙ, থালার মতন ঝলমলে আস্ত চাঁদ, তারপর চাঁদপরীরা ... ...

দুলারামও আজ ভাসতে ভাসতে, ডুবতে ডুবতে এই প্রথম একটা স্বপন দেখল।

দেখল ... ...

বিজয়া দেব

রসায়ন

হেমন্তের শুরুতেই হাওয়ায় হিমেল ছোঁয়া। পুজো গেছে দিন পনেরো হল। ঋতুরাজ ব্যাগটাকে পাশে রেখে মসৃণ কালো পাথরের বেঞ্চটাতে বসে। এটা যশোবন্তপুর স্টেশন, বেঙ্গালুরুর পাশের স্টেশন। স্থানীয় উচ্চারণে ইয়স্‌বন্ত্‌পুর। রাত সাতটা দশে ট্রেন ছাড়বে। ইয়স্‌বন্ত্‌পুর টু কাচ্চেগোড়ে। হায়দ্রাবাদের পাশের স্টেশন সেকেন্দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদের পাশে কাচ্চেগোড়ে। ট্রেনটির নাম কাচ্চেগোড়ে এক্সপ্রেস। ঘড়িতে এখন ছ'টা পঁয়ত্রিশ। আকাশ জুড়ে জড়ো হচ্ছে কালো মেঘ। ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ছে হাওয়ার জোর। শুধু দিনের আলোয় অন্তিম রেশটুকু আকাশে রয়ে গেছে। বেঙ্গালুরুর আই.টি সেক্টরের কর্মসূত্রে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ঋতুরাজ। ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে হলে এখুনি ট্রেনে উঠে গুছিয়ে বসে থাকা চলে। তবু ঋতুরাজ বসে থাকে। স্টেশনটার বাড়তি একটা আকর্ষণ রয়েছে, কেমন যেন আনমনা, তেমন ব্যস্ত নয় অন্য স্টেশনের মত। ইতস্তত কিছু লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা পত্রবহুল আমগাছ প্ল্যাটফর্মের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, অজস্র সরু লম্বাটে আম ধরেছে। হেমন্তের শুরুতে আম! এটা কি প্রকৃতিজাত না কি কৃত্রিমপদ্ধতিতে আম ফলানো? কে জানে! তেড়ে বৃষ্টি নামল। ছুটে গিয়ে ঋতুরাজ কম্পার্টমেন্টে ওঠে। নিজের কামরায় নিজেকে সুবিধেমতো গুছিয়ে নেওয়ার পর চোখ পড়ে কামরার ভেতরের যাত্রাসঙ্গীদের ওপর। বছর চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশের একজন মতিচ্ছন্ন চেহারা লোক মুখোমুখি বসে আছে। তবে লোকটি হালফ্যাশনদুরস্ত—চোখে হালফ্যাশানের চশমা, মাথায় রোঁয়া ফোলানো চুল, ওপাশে দুটো ফুলের মতো ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে, সাথে তাদের মা হয়তো, দু'জন ষাটোর্দ্ধ অথবা সত্তরোর্দ্ধ পুরুষ, মহিলা, বাচ্চাদুটোর দাদু-দিদা অথবা ঠাম্মা-ঠাকুর্দার বয়সী। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে চোখ বন্ধ করে ঋতুরাজ এবং পকেটে মোবাইল ফোন বেজে ওঠে।

—কি রে দাদা, ট্রেনে উঠেছিস?

—হ্যাঁ।

—খাওয়াদাওয়া করেছিলি?

—তেমন করে হয়নি। সময় পাইনি। যাহোক, এখন খেয়ে নেব। ট্রেনের খাবার খুব খারাপ নয়, ভাবিস না।

—বাড়ি ফিরতে তোর অনেক দেরি, তাই না দাদা?

—কী করব বল্, কিচ্ছু তো করার নেই।

—সামনেই কালীপুজো। বলেকয়ে ছুটির বন্দোবস্ত করা যায় না?

—উহুঁ। ওসব কথা বলে কী লাভ বল, যা সম্ভব নয় তা নিয়ে কথা বাড়িয়ে কী লাভ। অনু!

—তুই কেমন হয়ে গেছিস দাদা, কেমন যেন কাঠ-কাঠ কথাবার্তা। আচ্ছা, একটা খবর দেবার ছিল তোকে—স্মৃতিকণার বাড়ির সবাই চলে যাচ্ছে।

—সবাই চলে যাচ্ছে? সে কি রে? এতদিনের পুরনো বাড়িঘর ছেড়ে? কোথায় যাবে ওরা?

—দেরাদুন।

—বাবলুর ওখানে?

—হ্যাঁ, বাবলু নাকি বেশ বড়সড় ফ্ল্যাট কিনেছে।

—বাহ্, খুব ভালো খবর।

—বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে ওদের। পুরনো বাড়ি তো, কেমন যেন মন খারাপ লাগছে দাদা। অবশ্য তোর তো ওসব নেই। 'মন খারাপ' বুঝিস?

স্মৃতিকণা কোথায় আছে! স্মৃতিকণার দাদা বাবলু দেরাদুনে ভালো চাকরি পেয়েছিল। পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল বাবলু। স্মৃতিকণার কথা জিজ্ঞেস করা হল অনুকে। অনু নিজের থেকেও কিচ্ছুটি বলল না। শিলচরে কত পুরনো বাড়ি বাবলুদের। মনে হয় ওদের জ্যাঠামশাই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। কিন্তু স্মৃতিকণা কোথায়? কেমন আছে সে!

মতিচ্ছন্ন-টাইপের লোকটার দিকে চোখ পড়ল ঋতুরাজের। লোকটার ডানহাতটা প্লাস্টার-ব্যাগের ভেতর ঢোকানো। এই লোকটাকে নতুন একটা নাম দেওয়া যেতে পারে। চেহারার এক অভিনব মানচিত্রের ছোঁয়া আছে। নাম দেওয়া যেতে পারে, 'গুছোনো-পাগলাটে'।

এখন গুছোনো-পাগলাটে ঠাদুর্দা-বয়সীকে প্রশ্ন করছে—'য়্যু আর ফ্রম?'

—ওড়িশা। হ্যাভ কাম টু আওয়ার ডটার, শী ইজ ইন ব্যাঙ্গলোর।' বাচ্চাটির মায়ের দিকে তর্জনী সংকেত করল ভদ্রলোক।

হিসেবটা তাহলে সঠিক ছিল। এই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাটি বাচ্চাটির গ্র্যাণ্ডপা ও গ্র্যান্মি।

গুছোনো-পাগলাটে উৎফুল্ল, 'য়্যু নো আই ওয়াজ ইন্ ওড়িশা। ইন্ নাইন্টিন নাইন্টি সিক্স আই ওয়াজ ইন কটক। য়্যু আর ইন?

—বালেশ্বর।

লাল-নীল ফ্রকপরা বাচ্চা মেয়েদুটির সাথে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছে গুছোনো পাগলাটে। বাচ্চা দুটির অনর্গল ইংরাজি কথার মাঝে তাদের মা বলছে—'দে কান্ট স্পিক ইন ওড়িয়া।'

—ডাজন্ট ম্যাটার। দে আর স্পিকিং ইন ইংলিশ... ...' যেন অভয় দিচ্ছে গুছোনো-পাগলাটে।

মা'টি বলছে, 'অ্যাকচুয়ালি দ্য অন্‌ভায়রন্‌মেন্ট অয়াজ লাইক দ্যাট, দে বরন্ ইন্ ক্যালিফোর্নিয়া—'

গুছোনো-পাগলাটে যেন ফের লাফিয়ে ওঠে, 'য়ু নো। মাই ডটার শার্লি অল্‌সো ওয়াজ বরন্ ইন কালিফোর্নিয়া। আই অয়াজ ইন্ কালিফোর্নিয়া ফ্রম টু থাউজেণ্ড ওয়ান টু টু থাউজেণ্ড থ্রি—'। এইবার সে বাচ্চা দুটোর গ্র্যাণ্ড-পা'কে প্রশ্ন করছে, 'এক্সকিউজ মি স্যার, আর য়্যু রিটায়ার্ড নাউ?'

—ইয়া। আই ওয়াজ আ আই.আই.টি টিচার ইন্ বোম্বে।

—আও। 'আই ওয়াজ আ আই.আই.টি স্টুডেন্ট ... ... নাউ আই অ্যাম আ ইন্‌জিনিয়ার—' বেশ নামীদামি একখানা বহুজাতিক কোম্পানির নাম করল গুছোনো-পাগলাটে।

তারপর কিছুটা নৈঃশব্দ। অতঃপর ঋতুরাজের দিকে ফিরল সে। 'এক্সকিউজ মি, গাই, দেয়ারস্ মাই ব্যাগ, কুড য়্যু হেল্প মি?' লোকটা ঋতুরাজের পায়ের পেছনে সিটের নিচে বাঁ-হাতের তর্জনীসংকেত করে—'এক্সকিউজ মি, ইফ য়্যু পুশ দ্য ব্যাগ টুয়ার্ডস মি ... লুক্, দেয়ারস্ আ ফ্র্যাকচার ইন মাই রাইট্ হ্যাণ্ড—'

ঘাড় অল্প কাৎ করে তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের ডগায় চিমটি দিয়ে ব্যাগটাকে টেনে এনে ফ্যাশনদুরস্ত লোকটার দিকে ঠেলে দেয়। লোকটাকে ভালো করে দেখে ঋতুরাজ। সজারুর কাঁটার মত চুল, চশমার ভেতর চোখদুটো ঝাপসা ঘোলাটে। দিব্যি নাম দেওয়া গেছে, গুছোনো-পাগলাটে।

—এক্সকিউজ মি, ডোন্ট মাইণ্ড, আয়্যাম সরি ...'

—ইটস্ ওকে।' ঋতুরাজ আশ্বস্ত করে। এইবার তার চোখ পড়ে যায় ব্যাগটার দিকে। ব্যাগটার বুকে স্টিকারের গায়ে জ্বলজ্বল করছে 'কৌশিক চ্যাটার্জি'। এই লোকটা বাঙালী! চেহারাটি কেমন যেন মঙ্গোলিয়ান ছাঁদে গড়া। ইংরাজি উচ্চারণে তার জাতিগত সত্তাকে চিনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

ঋতুরাজ বেঙ্গালুরুতে যে আই.টি সেক্টারে কাজ করছে সেখানে বেশ ক'জন বাঙালী ছেলে আছে। কিন্তু তাদের সাথে বাংলাতে কথা বলার সময় কোথায়? কাজের তাগিদে সারাক্ষণই প্রায় ইংরাজি বুকনি, নিদেনপক্ষে হিন্দি।

এবার পুজো এল, পুজো গেল, বাড়ি যাওয়া হল না। বেঙ্গালুরুতে বেঙ্গলি সোসাইটিগুলো পুজো করে, কিন্তু নগর জুড়ে পুজো পুজো গন্ধ কোথায়? কলকাতা থেকে পুরুতমশাই আসেন, আসে ঢাকী, আসে একশো আটটি পদ্মফুল। ফের ফোন বাজছে।

—কী রে খোকন, ট্রেন ছাড়ল?

—হ্যাঁ, মা।

—কখন পৌঁছাবি?

—ভোর ভোর পৌঁছে যাব।

—খাওয়া হল কিছু?

—হ্যাঁ মা, খেয়েছি।

—খোকন, কেমন হয়েছিস রে? ওজন দেখেছিলি. অনু বলছিল কম খেয়ে খেয়ে নিশ্চয়ই দাদার ওজন কমেছে।

—অনুটা বাচাল মা, ওর কথা বেশি শুনো না। না খেয়ে থাকব কী করে? তবে তোমার অনুর মতো এখানে লোকে সারাক্ষণ 'খাই খাই' করে না। কথাটা বলো ওকে। আচ্ছা মা ...

—হ্যাঁ খোকন, কিছু বলবি?

ঋতুরাজ ভাবে ... ...

—কী রে, কিছু বলছিস না যে—'

—নাহ্, কিছু নয়, আমি ঠিক আছি মা, ভেবো না ... ...' স্মৃতিকণার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করা হল না। থাক্‌গে, লাভ কী করে। জীবন যে একটা স্রোত। স্রোতের মুখে ভেসে ভেসে স্মৃতিকণা যেথায় যাবে যাক। এসি কম্পার্টমেন্টের কাঁচে ঢাকা জানালার বাইরে দৃশ্যপট অস্বচ্ছ। উল্টোদিকের জানালায় সেই অবসরপ্রাপ্ত আই আই টি শিক্ষক ও তার স্ত্রী তাস খেলায় মগ্ন। জানালার ভারী পর্দাটি টেনে রেখেছেন ওরা, ওখানে পৃথিবী পর্দার ওপারে। বাচ্চা দুটির সাথে দারুণ ভাব জমিয়ে ফেলেছে কৌশিক। কৌশিক বলছে,

—নাউ টেল মি ইয়োর ডেইলি হ্যাবিটস্। নাই স্টার্ট ফ্রম মর্নিং।

—উই আর ভেরি বিজি ইন দ্য মর্নিং, ইটস্ আওয়ার স্কুলগোয়িং টাইম।

—ইয়া, হ্যাভ টোটালি ফরগটন্ ... শার্লি মাই ডটার. অলসো গোয়িং টু স্কুল ইন্ দ্য মর্নিং, শী ইজ ভেরি আর্লি রাইজার, বাট্ ইটস্ ভেরি টেরিবল্ ফর মি। আয়াম্ নট আ আর্লি রাইজার। য়্যু নো, মাই মোস্ট ফেবারিট থিং ইজ বেড টি। ইটস্ সো রিফ্রেশিং ... ...'

লাল ফ্রক ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'হোয়েন্ আই'ল বি গ্রোন আপ, মাই হাজব্যাণ্ড উইল গিভ মি আ কাপ অফ বেড টি—'।

—হো হো হো। কৌশিক মজা পেয়েছে খুব। ইওর হাজব্যাণ্ড। হোয়াই ইওর হাজব্যাণ্ড?

—হোয়াই নট? ইন্ দ্য মর্নিং মাই ড্যাড মেক আ কাপ অফ টি ফর মাই মম্। অ্যাণ্ড মাই মম্ হ্যাভ ইট্ ইন হাফ স্লিপি আইজ্ —' মেয়েটি ভঙ্গি করে দেখাচ্ছে।

কৌশিক ঝুরঝুর ঝুরঝুর হাসছে।

কাজ-অকাজের মাঝে ঋতুরাজ একটা ছবি দেখতে পায় ইদানিং—একটা কাকচক্ষু জলের দিঘি—তাতে ফুটে আছে অজস্র নীলপদ্ম, পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা আঁকাবাঁকা পথ, দিঘির পাশে একটা গাছ, গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিকণা, তারপর কোথা থেকে আসে হালকা মেঘ, ধোঁয়াশায় ঢেকে যায় দৃশ্যপট। যখন ঋতুরাজের সদ্য যৌবন, তখন স্মৃতিকণা তাকে ভালোবাসত। কখনও মুখ ফুটে সে কিছু বলেনি। কিন্তু তার দেহেমুখে ভালোবাসা ফুটে থাকত। একদিন নবমী পুজোর রাতে স্মৃতিকণা তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, ট্যাঁই কুড় কুড় ঢাক বাজছে। ঢাকী নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে, প্যাণ্ডেল জুড়ে মানুষ। এই ভিড়ে স্মৃতিকণা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্মৃতিকণার চোখের তারায় আলোছায়ার খেলা, গোটা দেহ জুড়ে মৃত্তিকার গন্ধ। আজ স্মৃতিকণা পুরোপুরি অতীত, তবু তার দেহের মৃত্তিকার গন্ধ আজও ঋতুরাজকে আবিষ্ট করে। শিলচরে তাদের ও স্মৃতিকণাদের বাড়ির পাশে বেশ খানিকটা খোলামতো জায়গা ছিল, শরতে তা কাশফুলে সাদা হয়ে থাকত। স্মৃতিকণা একদিন কাশবনের পাশে দাঁড়িয়ে গাইছিল, 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা, গেঁথেছি শেফালি মালা/নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা ...'। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ে, সেদিনটা ছিল ষষ্ঠীপুজোর বিকেল, একটু পরেই দেবী-আবাহন হবে, প্রস্তুতি চলছিল প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে। মনে পড়ে, ঠাম্মার গানের গলাটি ভারী মিঠে ছিল। পুজোর আগে, এমনকি ষষ্ঠীপুজোর দিন অব্দি ঠাম্মা আগমনী গাইত, 'এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না। বলে বলুক লোকে মন্দ কারও কথা শুনব না'—স্মৃতিকণার মুখের আদল ছিল পানপাতার ছাঁদে গড়া, অনেকটা দুর্গাঠাকুরের মতো। ঠাম্মা যখন গাইত, 'শুনেছি নারদের মুখে/উমা আমার আছে দুখে/শিব শ্মশানে মশানে ফেরে/ঘরের ভাবনা ভাবে না' ... .. এই সময়টাতে কেন কে জানে স্মৃতিকণার জন্যে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করত। স্মৃতিকণার বাবা শিলচর শহরে একটা কো-অপারেটিভ অফিসে একটা সাধারণ মানের চাকরি করতেন। বাড়িতে ওদের আত্মীয়পরিজন নিয়ে লোকজনের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। কেন যে মনে হত স্মৃতিকণার বিয়ে হলে খুব কষ্টে থাকবে। তার চাইতে ওর বিয়ে না হওয়াটাই হবে ভালো। ঠাম্মা ঐ আগমনী গানের কতরকম মানে করত, বলত, 'ব্যাপারটা কী জানিস তো, আমাদের মেয়েদের যে বিয়ে দেওয়া হত সেটা ছিল আপদ বিদেয়। ঐ মহাদেবের মত স্বামী, যে ঘরের খবর রাখত না, নেশা করে বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াত, আর মেয়েদের কষ্টের সীমা ছিল না।' ঠাম্মা দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

এবার ষষ্ঠীপুজোর রাতে অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে প্রায় ন'টা। এ সময়টাতে বৃষ্টি এসেছিল তেড়ে। অফিসের প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছিল কখন থামবে বৃষ্টি। যানবহুল পথটি দেখতে দেখতেই স্থবির চলচ্ছবি হয়ে গেল। যানজটে আটকা পড়ল

শহর। আস্তানায় ফিরতে রাত হল অনেক।

ট্রেন ছুটছে। বড্ড দ্রুতগতিতে ছুটছে। সময়ের আগেই বুঝি পৌঁছে যাবে এ ট্রেন। ভোররাতের আবছা আঁধারে যদি পৌঁছে যায় তাহলে অচেনা পথঘাট হাতড়ে গন্তব্যে পৌঁছোতে হবে। স্মৃতিকণার বিয়ে হয়েছিল যার সাথে তাকে সে চেনে না। বিয়ের আগে দেখেনি কখনও। দেখতে চায়নি নাকি স্মৃতিকণা। বিয়ের রাতেই তাদের প্রথম দেখা। তারপর ট্রেনে চেপে সে স্বামীর হাত ধরে অচেনা পরিবেশে অচেনা সংসারে পাড়ি দিল। শ্রাবণ মাসের শেষে বিয়ে হয়েছিল স্মৃতিকণার। স্মৃতিকণাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তার বাবা অঘোরনাথ ঋতুরাজের মা'র সাথে কথা বলছিলেন। 'এর চাইতে ভাল পাত্র আর পাওয়া গেল না দিদি, স্মৃতি তো বিয়ের আগে দেখতেই চাইলে না ছেলেটাকে। ভয় হয়, সব কিছুই অচেনা তার।' অচেনার রহস্যলোকে মিলিয়ে গেল স্মৃতিকণা। ঋতুরাজের বেঙ্গালুরুর চাকরি তখন ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে ছুটিতে গিয়েছিল সে। স্মৃতিকণা যেন অনেক শব্দকে ভেঙে চুরমার করে দিল — 'আশ্রয়', 'মগ্নতা', 'গাছপালা', 'মাঠঘাট', 'মৃত্তিকা', 'কাশফুলের শুভ্রতা', 'দিঘিকালোজল' ইত্যাদি শব্দের নস্টালজিক মোহের উপর দিয়ে অবলীলায় হেঁটে চলে গেল স্মৃতিকণা। ভেঙে দিল সব পিছুটান। তারপর একদিন অনু ফোনে বলেছিল, 'জানিস দাদা, স্মৃতিকণার বর নাকি স্মৃতিকণাকে তার সাথে নিয়ে গেছে।' কী একটা জায়গার নাম বলেছিল অনু। রাজস্থানের কোথাও। স্মৃতিকণার বর আর্মিতে চাকরি করে। আর্মিম্যান কি? কে জানে।

হাতব্যাগটা খুলে ডায়েরিটা বের করে ঋতুরাজ। ঋতুরাজ ডায়েরিটা খুলতেই বিষ্ণু দে'র কবিতার কতগুলো ছত্র চোখের সামনে সুদূর নক্ষত্রের আলোর মত ঝিকঝিক করে ওঠে—

'যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমূলের লালে ... ...
শালিকের ঐকতান থেমে যায়
জামরুল বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের
বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন ... ...'

কখন এই কবিতার ছত্রগুলো লিখেছিল সে? মনেই পড়ে না। বেঙ্গালুরুর দিন রাত তো কাজের নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা থাকে। তাহলে কি শিলচরে লিখেছিল? সে কি স্মৃতিকণার পতিগৃহে যাত্রার পর লিখেছিল? কিছুই তো মনে পড়ছে না। তবে সেদিনটার কথা আজ মনে পড়ছে। অনেকদিন আগে ... ... মনে হচ্ছে যেন কতযুগ আগের স্মৃতি ... ... এমনি এক রাতে, পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঋতুরাজ তার জানালার পাশে বসেছিল, মনে হাজারো প্রশ্ন, অপরাধবোধের প্রশ্নে অন্তর্লীন টানাপোড়েন ... ... আজও ভাবে ঋতুরাজ বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সে কয়েকটা দিন পরই, চাকরি পেয়েছে সে। চাকরি, মানে গোলাকৃতি পৃথিবীর

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়াবার ছাড়পত্র। অথচ, এই একটু আগেই, মানে সেদিনই বিকেলে, রোদ তখন মরে আসছে, কনেদেখা আলোর লালিমায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ, তেমনি সময়ে স্মৃতিকণা এসেছিল তার ঘরে, সেই ঘরে, যেখানে সে রাতের আঁধারের গহীন, বিস্ফারিত অন্ধকারকে দেখছিল। স্মৃতিকণা চুপিসাড়ে এসেছিল। হাতে ছিল তার টাটকা একটি নীলপদ্ম। শুয়েছিল বিছানায় তখন ঋতুরাজ। স্মৃতিকণা কেমন অপ্রস্তুত, তবু যেন সমস্ত মনের শক্তিকে জড়ো করে নিয়ে বলে ফেলেছিল, 'কখনও নীলপদ্ম দেখেছেন?' দুচোখে সেই আবিষ্ট মায়া, দেহে সেই মৃত্তিকার গন্ধ, এক ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মত হাসি ঠোঁট ছুঁয়ে আছে। বিছানার পাশটিতে দাঁড়িয়ে এগিয়ে দিয়েছিল নীলপদ্মটি, 'আপনার জন্যে এনেছি।' সেই নীলপদ্মটি হাতে নিয়েছিল ঋতুরাজ, ফুলটির পাপড়িতে লেগে থাকা বিন্দু বিন্দু জলের করুণ স্পর্শও অনুভব করেছিল সে। বিছানায় উঠে বসেছিল যখন অন্তর্লীন আবেগের অস্থির তাড়নায় স্মৃতিকণার দেহের মৃত্তিকার গন্ধের উৎসমুখ খুঁজে নেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদও অনুভব করেছিল। প্রত্যাশাভরা স্মৃতিকণার দুটো চোখের তারায় আলোছায়ার অন্তরালে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল ক্রমশ। তারপর কোনো অদৃশ্য সুতোর টানে পিছিয়ে গিয়েছিল সে। কেজো গলায় বলে ফেলতে পেরেছিল, 'বাঃ চমৎকার তো নীলপদ্মটি। পেলে কোথায়?' স্মৃতিকণা কেমন অবোধ, অসহায় গলায় বলেছিল, 'ঐ যে দত্তজেঠুদের বাড়ির পেছনে কালোদিঘি, ওতে ফুটেছে অনেক... ...।'

স্মৃতিকণা পা-পা পিছিয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েক মুহূর্ত—তারপর, 'আসি' বলে চলে গিয়েছিল।

চোখ বন্ধ করে ঋতুরাজ। ঝড়ের গতিতে ট্রেন ছুটছে। কৌশিক বাচ্চাদুটোকে এবার বলছে—'নাউ টেল মি হ্যাভ য়্যু হ্যাবিটস্ টু রিড্ বুকস্, আই মীন আউট অফ ইওর স্কুল সিলেবাস—'

—অবভিয়াসলি। জাস্ট সী ...'। বাচ্চা মেয়ে দুটোর মায়ের হাতে ধরা বাহারি ঝোলা থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি পটার ... ...

—হ্যারি পটার? মাই ডটার শার্লি অলরেডি ফিনিশড্ ইট।

—উই অলসো ফিনিশড্ ইট। বাট ইটস্ সো ইন্টারেস্টিং দ্যাট্ উই রিড্ অ্যাণ্ড রিড্ অ্যাণ্ড রিড্ ...'

—হো হো হো ... ...' কৌশিকের হাসির হর্‌রা ... ... অতঃপর 'য়্যু নো শার্লি ডাজন্ট রিড্ আ বুক টোয়াইস্। আফ্‌টার রিডিং, স্টার্ট টেলিং অ্যাবাউট দ্য ডিটেলস্, য়্যু নো দ্য ইনস্ অ্যান্ড আউটস্ অফ্ দ্য ম্যাটার। য়্যু নো, হার এজ ইজ অন্‌লি সেভেন্ প্লাস নাউ।'

তাস খেলায় মগ্ন বাচ্চা দুটির গ্র্যান্মি ও গ্র্যাণ্ডপা'র টুকিটাকি কথা ও হাসির আওয়াজ আসছে। ওরাও বুঝি নিজেদের মধ্যে ওড়িয়ায় কথা বলে না।

কৌশিক তাকিয়ে এবার এইদিকে। ঋতুরাজের হাতে ধরা খোলা ডায়েরির পাতায় মাঝে মাঝে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। ঠোঁটের কোণে একটুকরো ঝাপসা হাসি। ঋতুরাজ এইবার সোজাসাপটা প্রশ্ন করে একেবারে সোজা বাংলায়,

—আপনার নাম কৌশিক চ্যাটার্জি?

—ইয়া। স্ট্রেঞ্জ! হাউ ডু য়্যু নো?

ঋতুরাজ এবার এয়ারব্যাগের বুকে নামাঙ্কিত স্টিকারের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে।

—ও! আই সি। ইয়া, আই বরন্ ইন কোলকাতা বাট নট্ ব্রট আপ। এক্সকিউজ মি, আর য়্যু আর পোয়েট?

ঋতুরাজ নির্বাক চোখে কৌশিককে দেখে।

কৌশিক ঋতুরাজের হাতে ধরা খোলা ডায়েরির পাতায় চোখ রেখে বলে, 'হিয়ারস্ আ পোয়েম। ডিড য়্যু রাইট ইট?'

—ও নো। এটস্ আ কোটেশান্ ফ্রম বিষ্ণু দে।

—ও, আই সি।

—ডু য়্যু নো বিষ্ণু দে?

—আ বেঙ্গলি ... পোয়েট?

—ইয়া। আ ফেমাস্ পোয়েট।

—আই সি, আয়াম্ অলসো ইন্টারেস্টেড ইন লিটারেচার, সী মাই কালেকশানস্, বুক আর ভেরি গুড কম্প্যানিয়ন, ইজন্ট ইট? এই মুহূর্তে সে যেন বেশ উচ্ছ্বসিত, উজ্জ্বল।

এয়ারব্যাগের চেনটা দুহাতে টেনে খুলল কৌশিক। তিনটে বই বের করল। ঝুম্পা লাহিড়ী, চেতন ভগত, তসলিমা নাসরিন। 'লজ্জা'র ইংরাজি সংস্করণ।

—আই লাইক তসলিমা, ভেরি স্ট্রেট ফরোয়ার্ড অ্যাণ্ড ডেয়ারিং।

এইবার কৌশিক ঋতুরাজকে দেখছে। বেশ খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছে তার ভূতবর্তমান।

—আই থিংক য়্যু আর আ ন্যাশনাল বেঙ্গলি, সেন্টিমেন্টাল, নস্টালজিক অ্যাণ্ড ভেরি মাচ ইনক্লাইনড্ উইথ দ্য বেঙ্গল ... ...

—হোয়াট ডু য়্যু মিন্ 'ন্যাশনাল বেঙ্গলি'?

—ইয়া, য়্যু নো টুডেজ্ বেঙ্গলিজ আর ডিভাইডেড্ ইনটু টু পার্টস—হো-হো হেসে নিচ্ছে কৌশিক—ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্লোবাল ... ...

তারপর প্রায় হঠাৎই কথার সুতো ছিঁড়ে ফেলল কৌশিক। 'এক্সকিউজ মি' ডোন্ট মাইণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে একটা হাই তুলে শুয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ট্রেন ছুটছে। বাইরে তমসালিপ্ত পৃথিবীর দৃশ্যপট মাঝে মাঝে অস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেই

মিলিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতিকণার চলে যাওয়া দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল ঋতুরাজ। ধীরে ট্রেনের জানালাগুলো সরে সরে যাচ্ছে, অতঃপর দ্রুততর হল তার গতি, তারপর—চোখের আড়াল হল। নীল বেনারসী শাড়ি, চন্দনে আঁকা ছোট্ট কপাল, দুর্গাঠাকুরের মতো মুখশ্রী চোখের আড়ালে চলে গেল। শ্রাবণের শেষ তখন—ফিরে আসার সময় পথের পাশে কোনো একটা বাড়িতে 'পদ্মাপুরাণ' গাইছিল মেয়েরা। জলে ভেজা ছিল চারপাশ, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল অদ্ভুত জলজ গন্ধ। সেদিনের জলে ভেজা শহরের পথঘাট সোঁদাগন্ধের সাথে—অন্তরের এক অনাস্বাদিত অনুভূতির রসায়ন ঘটাচ্ছিল। নিজেকেই যেন ঠিক চিনে ওঠা যাচ্ছিল না। কবি শক্তিপদ'র 'মনসামঙ্গল' কবিতার অক্ষরমালা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বুকের ভেতর পাড় ভাঙছিল, ভাঙছিল বাঁধ—

'... ... গাঙের গর্ভিনী সেই গন্ধ ভেসে আসে
শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাসে
এখনো বুকের দ্বিজ বংশীদাস কহে
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কালীদহে
ডহরের ঘোর লাগা গহনের টানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।'

স্মৃতিকণা কোথায় আছে? বুঝি কেউই জানে না। বুঝি, মা-ও জানে না, অনুও জানে না ... ..। কৌশিক ঘুমোচ্ছে। মুখের একপাশে আলো পড়ছে আরেক পাশে ছায়া। কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

'হাই!' কৌশিক বাঙ্কে আধশোয়া। 'এক্সকিউজ মি, ইফ্ য়্যু ডোন্ট মাইণ্ড, প্লিজ পুট আউট দ্য লাইট ... হাই পোয়েট, হোয়াট আর য়্যু থিংকিং ... প্লিজ, প্লিজ পুট আউট্ দ্য লাইট'—চোখে আলো আড়াল করছে কৌশিক বাঁ-হাতে, ডানহাতটি প্লাস্টারব্যাগে আটকানো .. ...

গাড়ির গতি কি বাড়ল? রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে হয়তো।

বিজয়া দেব

মৃগতৃষ্ণিকা

এক.

গত তিনদিন ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমার সদরের গেটটা তেমন পাকাপোক্ত নয়, বাঁশতরজার গেট। একটা অ্যালুমিনিয়ামের শেকল দিয়ে পাক খাইয়ে বেঁধে রাখি। অদ্ভুত দক্ষতায় সেই শেকলের পাক খুলে আট-নয় বছরের ছেলেটা বাড়ির ভেতর আসে। এক গ্লাস জল খেতে চায়। দেয়ালঘড়িতে সময় দেখি, ন'টা পঁয়ত্রিশ। এখুনি খেতে বসব। 'এক গ্লাস জল দেবে মা?' জল খেতে চাইলে দিতে হয়, না হলে গৃহস্থের অকল্যাণ—আমার স্ত্রী রাত্রি জল খেতে দেয়। পুঁচকে ছেলে—হিলহিলে দেহের গড়ন, প্যাঁকাটির মত হাত-পা। ছোট্ট গোল মুখ। চোখ দুটো বেশ ভাসানো।

জিজ্ঞেস করলাম—রোজ জলতেষ্টা পায় তোর? রোজ আসিস যে?

ছেলেটা আঙুল তুলে অনির্দেশ্য দিগন্ত দেখিয়ে বলে, 'রাস্তায় কাজ করি, পাথর ভাঙার কাজ।'

আমার শিশু-শ্রমিকের ব্যাপারে বিস্তর লেখাপত্র, বিস্তর ভাষণ ইত্যাদির কথা মনে আসে।

বলি, 'এত পুঁচকে তুই, রাস্তায় পাথর ভাঙার কাজ করিস, কেউ আপত্তি করেনি?'

ছেলেটা ছোট্ট মাথাটি নেড়ে বলে, 'নাঃ! কেন করবে?' বলে ঢুকঢুক জল খায়।

একমুখ হেসে বলে, 'তোমাদের জল খেতে ভারী ভালো। তাই রোজ আসি।'

ছেলেটা চলে যায়। আমি যাবার পথে তাকিয়ে থাকি। গেটের শেকলটাকে ফের পেঁচিয়ে বেঁধে রেখে সে চলে যায়।

—কী দেখছো অতো?' রাত্রি জিজ্ঞেস করে।

বলি, 'ঐটুকুনি বাচ্চা ছেলে, রাস্তায় পাথর ভাঙার কাজ করে!'

—না করে কী হয়, বলো। ঘরে ওর মা অসুস্থ, ছোট্ট একটা ভাই আছে। বাবা নেই। এক টিন পাথর ভেঙে পায় দশ টাকা। দিনে দু'টিন ভেঙে নিতে পারে। কুড়িটা টাকা দৈনিক উপার্জন করে নিতে পারে ও।

দুই.

সদরে মরচে ধরা গ্রিলের দরজাটা খুলে যখন ঢুকলাম, কেমন যেন অতি পুরনো স্মৃতিবাহী-গন্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরল। গন্ধটা পাক খেয়ে খেয়ে গোটা বাড়িটাকে বেঁধে রেখেছে। বাড়ির পাশ ঘেঁষে জবা, গাঁদা ফুলের গাছ ঘিরে প্রচুর ঝোপজঙ্গল মাথা উঁচু করে বাড়ছে। বোধ হল বহুদিন কোনো যত্নশীল হাতের ছোঁয়া গাছগুলোতে পড়েনি। কলিং বেলে হাত ছোঁয়ালাম, ট্রামগাড়ির ঘন্টির মতো বেজে উঠল। একটি মাঝবয়সী মহিলা বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বললাম, 'শঙ্খদা?'

মহিলাটি আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'আসুন।' আধো আবছায়া ঘরের পাশ ঘেঁষে একখানা বিছানা—স্পষ্টত সবকিছু ঠাহর হচ্ছিল না। মহিলাটি প্লাস্টিকের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, 'বসুন।'

আবছা আঁধার ক্রমে চোখ-সহা হয়ে এল। দেখলাম, শঙ্খ বিছানায় শুয়ে আছে। মহিলাটি জানালার পর্দা কিছুটা সরিয়ে দিতেই আলো ঘরের ভেতর হামলে পড়ল। ফর্সা হয়ে এল ঘরের ছবি—আসবাবপত্র, দেয়ালের ক্যালেণ্ডার, লেনিনের ছবি, শঙ্খদার দেহ, সেই অনুসন্ধানী চোখ।

শঙ্খদার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, হাত তুলে যেন আমায় অভিবাদন জানাল, যেন সেই সত্তরের দশকের 'লাল সালাম'। আমি শঙ্খদার হাত ধরলাম। বললাম, 'কী হয়েছে শঙ্খদা?'

শঙ্খদা দেহের অনেকখানি জোর প্রয়োগ করে ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'অনেক কিছু।'

শঙ্খদা বিয়ে করেনি। সারাজীবন বামপন্থী আন্দোলন ও রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল। বামপন্থী ভাবধারার এমন একনিষ্ঠ প্রয়োগশিল্পীর জুড়ি প্রায় মেলে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'চলাফেরা করতে পারো তো?'

শঙ্খদা নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

আমি এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারলাম না। শঙ্খদা এমনই এক মানুষ যাঁর পায়ের নিচে সরষে, সে কিনা স্থবির হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবে! শঙ্খদাকে ভাবলেই যে তাঁর কর্মকুশল চেহারাটি চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। এ কোন্ শঙ্খদা? এঁকে আমরা মেনে নেবে কী করে!

জীবন মানেই তো চলমানতা, আর 'শঙ্খদা' এই নামটি এত সচল, এতটাই চলিষ্ণু যে আজ এই ঘরের ভেতরের আবছায়া, এই নিশ্চল ছবির ফ্রেমে আঁটা ছবিটিকে আমার আছড়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে ইচ্ছে হল। যদিও ইদানিং শঙ্খদার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রায় ছিলই না। বছর পাঁচেক হতে চলল শঙ্খদার সাথে দেখাসাক্ষাৎ আমার খুব কমই হয়েছে। এমনই ব্যস্ত সময়—সময়ের পিছু পিছু ছুটতে হয় সারাক্ষণ—এই জীবনশৈলীতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠায় অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিতগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে। তার জন্যে কি নিজেকে দায়ী করব? বস্তুত আজকাল আমি রাতে শুতে যাওয়ার আগে পরের দিনের কাজের ছক গুছিয়ে রাখি। না হলে কাজের চাপ দিনের ছন্দকে এলোমেলো করে দেয়। এই ছকবন্দি সময় থেকে কখন যে শঙ্খদা গলে বেরিয়ে গেছিল টের পাইনি।

শঙ্খদা অনেক কষ্টে ফের জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানলি?'

বলি, 'রবিদা বলেছে।'

—রবি, সৈকত, শোভন এরা খুব করছে। এখন তুই এলি।' শঙ্খদা যেন খুব নিশ্চিন্ত হয়। যেন অনেকখানি ভরসার স্থল এসে আজ তাঁর শিয়রে বসেছে।

মাঝবয়সী মহিলাটি এসে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবেন?'

শঙ্খদার দেহে একধরণের আকুলতা লক্ষ্য করলাম। ফের দেহের ওপর, কণ্ঠস্বরের ওপর যেন অনেকখানি জোর প্রয়োগ করে বলল,

—ইস্! এভাবে কি জিজ্ঞেস করতে হয়? চা নিয়ে এসো।

আমি বললাম, 'ব্যস্ত হয়ো না শঙ্খদা, আমি চা খাব না। শঙ্খদা, আমি আর তেমন চা-খোর নই।'

শঙ্খদা হাসে। ঠোঁটের কোণে জড়ো হয় বহুকালের পুরনো স্মৃতিগন্ধী মমতা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অতীত সম্পর্কের মাধুর্যের রেশ।

মহিলাটি ফের জিজ্ঞেস করে, 'চা করব? খাবেন চা?'

বুঝতে পারি, মহিলাটির বড্ড তাড়াহুড়ো। কোথাও যাবে হয়তো।

বলি, 'উহুঁ, চা খাব না।'

মহিলাটি বলে, 'তাহলে দাদা, আমি একটু বাড়ি হয়ে আসি?' বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশি দূর নয়, এইটুকুনি পথ, ঐ বাঁকটা পেরিয়েই—' আপনি কি একটু বসবেন? আমি ফিরে এলেই আপনি যাবেন?'

বলি, 'ঠিক আছে, যাও।'

শঙ্খদা ধীরে ধীরে বলে, 'ওইরকমই করে। ওর পরিবার আছে। রাতে ওর ছেলে এসে ঘুমোয়। দেখাশোনা ভালই করছে ওরা।'

শঙ্খদার চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেছে কেন? কী কী অসুখ দেহে বাসা বেঁধেছে শঙ্খদার? স্পষ্টত বুঝতে পারছি, প্রশ্ন করা মানেই শঙ্খদাকে কষ্ট দেওয়া। কথা কইতে গিয়ে কী কষ্টই না হচ্ছে শঙ্খদার! নিজেই বলতে শুরু করি, 'মনে পড়ে শঙ্খদা, সত্তরে দশকের সেই দিনগুলো, যখন আমরা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী—আমি সৈকত, উৎপল, শোভন, মনোজ, রবিদা ... ওহ্, কী দিনগুলোই না গেছে! বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মার্কস্‌বাদ পড়ছি, তুমি তখন সারাক্ষণ পার্টি অফিসে থাকতে, আমাদের অঞ্চলভিত্তিক কাজের জায়গাগুলো ঠিক করে দিতে, সন্ধ্যার পর স্টাডি সার্কেলের ক্লাশ নিতে। তোমার কোনো পিছুটান ছিল না, সারাক্ষণ কাজ নিয়ে মেতে থাকতে, কোনো কোনোদিন রাতের দিকে পার্টি অফিসে ঢুকে পড়তাম। তোমার আলাদা একটা কোণ নির্দিষ্ট ছিল, সেখানে চেয়ার টেনে বসে সবুজ রেক্সিনে মোড়া ছোট ডাইরিতে কী সব লিখে রাখতে, জিজ্ঞেস করলে বলতে, সারাদিনের কাজের হিসেব লিখে রাখছি। কোনো কোনোদিন হঠাৎ কোনো কাগজের পাতায় তোমার লেখা দেখতে পেতাম। সাগ্রহে পড়তাম। সব কাগজ আবার তোমার লেখা ছাপত না। সে সময়ে কম্যুনিস্টরা খুব সহজে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

শঙ্খদা ম্লান হেসে বলে, 'হ্যাঁ, সে অনেকদিন আগের কথা। অনেকদিন হল!'

কেমন এক নির্বিকার ম্লানিমায় শঙ্খদার মুখ ছেয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে শঙ্খদা। আমি চুপ হয়ে যাই।

কাজের মহিলাটি বলে গেছে, এখন আমি উঠে চলে যেতে পারব না। জানালার বাইরে জবা, করবী এইসব ফুলগাছের শাখাপত্র থম ধরে আছে। আকাশজুড়ে জড়ো হয়ে আছে ভারী মেঘ, একটুও হাওয়া নেই। মাথার ওপর একখানা সিলিং ফ্যান ঝুলছে। কিন্তু তা চলছে না। মনে হয় শঙ্খদা এই দুর্বল দেহে ইলেকট্রিক হাওয়ার তীব্রতা সইতে পারে না। শঙ্খদা চোখ খুলল, তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে কী যেন বলল। কাছে ঝুঁকে বললাম, 'কিছু বলছো কি শঙ্খদা?' শঙ্খদা তর্জনী দিয়ে খাটের নিচে সংকেত করে, 'এখানে একটা তোরঙ্গ আছে, ওটা খুলে দেখিস তো, চাবিটাবি কিছু নেই। ভেতরে দু'তিনটে খাতাপত্তর আছে। ওগুলো নিয়ে যা, তোর কাছে রেখে দিস।'

আমি ঝুঁকে পড়ে খাটের নিচ থেকে টেনে তোরঙ্গ বের করলাম। পুরো তিন-চারটে খাতা বেরোল। সবুজ রেক্সিনে মোড়া ডাইরি। আর কিছু নেই, কয়েকটা পুরনো কাপড় তোরঙ্গের ভেতরে রাখা আছে। ধুলোমলিন খাতাগুলো মুছে ফেললাম। বের করে এনে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি নিয়ে যাব শঙ্খদা?'

শঙ্খদা একটু হেসে বলল, 'এগুলোতে প্রায় কিছুই নেই। তবু যা আছে তোর কাছেই থাক।'

তিন.

বুঝতে পারি না কেন ক'দিন থেকে মনটা হু-হু করছে। কারণে-অকারণে চট্‌জলদি বিরক্তি আসছে। জীবনটাকে মনে হচ্ছে নিরর্থক গোলকধাঁধা। আশেপাশে চক্রায়িত মানুষগুলো যেন এক-একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। মাঝে মাঝে নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠছি। অফিসের টানাবাঁধা কাজ, ঘরে এসে রুটিনমাফিক খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া, খবরের কাগজ পড়া সব, সবকিছুকেই বড্ড পানসে, বড্ড তিক্ত ঠেকছে। শঙ্খদার খাতাগুলো বুকসেল্ফে রেখেছি। স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর থেকে ডাইরিগুলো উঁকি মেরে আছে, যেন বাড়তি হয়ে আছে। বাকি বইগুলোর সাথে তেমন করে খাপ খাইয়ে সেঁটে যেতে পারেনি। ডাইরিগুলো এনেছি বেশ ক'দিন হয়ে গেল। এখনও খুলে দেখার অবসর হয়ে উঠতে পারেনি।

সেই ছোট্ট ছেলেটা রোজ ভাসে। বিরক্ত লাগে। এ এক আচ্ছা আপদ। 'জল খাব' বলে রোজ ঢুকছে। রাস্তায় পাথর ভাঙার কাজ করে, সাথে চুরি করে নিয়ে যাবার ধান্দাও হতে পারে। মুখ দেখে কি লোক চেনা যায়! বাচ্চা ক্রিমিনালও তো এ দেশে আছে। অথচ ঠিক কড়া গলায় ওকে নিষেধ করে উঠতেও পারছি না। এমনই এক সময়ে আসে যখন আমি অফিস যাব। রোজ রোজ কি একই সময়ে ওর জলতেষ্টা পায়? আজ জল খেয়ে যাবার সময় রাত্রিকে বলল, 'আমি যে রোজ এসে জল খাই তোমরা রাগ করো?'

রাত্রি বলে, 'বাহ্, খুব ভাবিস তো রে তুই! চা খাবি?'

—উহুঁ, চা খেতে সময় লাগবে ঢের। ততক্ষণে আধ টিন পাথর ভাঙা হয়ে যাবে।

রাত্রি বলে, 'ওরে বাবা! এইটুকুনি বয়সে হিসেব শিখেছিস কত!'

'আমি যাই' একমুখ হেসে ছেলেটা ছুট্রে বেরিয়ে যায়।

পেছন থেকে রাত্রি বলে, 'এ্যাই যাদু! বিকেলে আসিস!'

ও, তাহলে এই ব্যাপার! এইজন্যে ছেলেটা রোজ আসে! রাত্রির প্রশ্রয় পেয়েই এই ব্যাপার ঘটছে। আমি তো প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি।

রাত্রিকে বলি, 'হুঁ যাদু! বেশ নাম তো। তাই তো বলি, রোজ এই ছেলেটা কেন আসে। রোজই ওর জল খেতে আসা চাই?'

রাত্রি বলে, 'বলো। কেন আসে রোজ?'

—তোমার প্রশ্রয় পেয়ে আসে।

রাত্রি হাসে। বলে, 'খুব একটা মিথ্যে বলো নি। বিকেলে কাজ সেরে যাবার সময় একবার আসে। আমি তখন ওকে এটা-ওটা খেতে দিই। খুব খুশি হয়। ছেলেটার ওপর একটা টান পড়ে গেছে।

বলি, 'অতো টান পড়ে যাওয়া ভালো নয় গো। দেখো আবার কিছু তুলে-টুলে নিয়ে না যায়!'

—ছাড়ো, তোমার ওসব সন্দেহ বাতিক। কখনও কিছু ভালো করে চোখ তুলে দ্যাখো না, আবার এখন সন্দেহ করা হচ্ছে ঐ পুঁচকে ছেলেটার ওপর।

কথাটা মিথ্যে নয়। ওগুলো আসলে কথার কথা। কথার চাপান উতোর। কী-ই বা আছে আমার তেমন যে তুলে নিলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব। তেমন কোনও দামী জিনিসের ছড়াছড়ি নেই। জীবনযাপনে যেটুকু না হলে স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যায়, সেটুকুই গুছিয়ে রেখেছে রাত্রি। ঐটুকুনি ছেলে পাথরভাঙার কাজ করে, এটা চোখে দেখে আমার ভেতরে কেমন একধরণের চাপা কষ্টবোধ হয়, মনে হয় ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিই। চোখের আড়ালে কত কী-ই না ঘটে চলেছে। সে'সব নিয়ে তো ভাবতে হয় না!

চার.

অদূরে রাস্তার কাজ হবে। অনেকদিন থেকেই রাস্তার কাজ হবে শুনছি। কাজ কিন্তু হচ্ছে না। খুব বৃষ্টি হচ্ছে এ-বছর। ভারী লাগামছাড়া বর্ষণ হলে এই সামনের রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। জল নেমে গেলে হাঁ-মুখো গর্ত দাঁত ছড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। অনেকদিন পড়ে থাকে পথঘাট। ঠোক্কর খেতে খেতে খানাখন্দের ওপর দিয়ে চলে মানুষ। হেলেদুলে চলে যানবাহন। এখন এই কিছুটা রাস্তা সারাই হবে। একখানা ক্রেন, একখানা পাথর-পিচ মেশানোর মেশিন রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর হালকা নীলরঙা পলিথিনের শিট টাঙিয়ে চলছে পাথর ভাঙার কাজ। জনাকয়েক মজুর, যাদুকে দেখতে পেলাম। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙে চলেছে। রোগা হিলহিলে হাতের আন্দোলন দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ক্রমে তার জোর বাড়তে লাগল। ঝলসানো বিদ্যুতের ক্ষতচিহ্ন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল আকাশ—কড়াক্কড় শব্দে কোথাও বাজ পড়ল, যাদু চমকে উঠল। আমার পকেটে মোবাইল বেজে উঠল।

—রাতুল, রবিদা বলছি। কেমন আছিস?

—বড্ড ব্যস্ত থাকি রবিদা। ব্যস্ত থাকাকে তুমি কী বল, ভালো কি? যদি ব্যস্ত থাকাটাকে ভালো থাকা বলে তাহলে বলতে পার ভালোই আছি।

রবিদা একটুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'সেদিন শঙ্খদা তোর কথা বলছিল।'

কেন কে জানে ভিতর থেকে খুব চমকে উঠি। বলি, 'কী বলছিল শঙ্খদা?'

—কী আর বলবে! কথা বলতেই তো তাঁর কষ্ট হচ্ছে। বলল, তোকে ওর ডাইরিগুলো সব দিয়ে দিয়েছে। সামলে রাখিস রাতুল।

—সে রাখব রবিদা। কিন্তু জানো, আজ অব্দি খাতাগুলো খুলে দেখাব সময় করে উঠতে পারিনি। কেমন আছে শঙ্খদা?

—ভালো নেই রে। সেজন্যেই তো ফোনটা করছি। কাল থেকে শঙ্খদার খুব জ্বর।

—সে কি? ডাক্তার দেখেছে?

—না, দেখানো হয়নি। কাল আমি সারারাত ছিলাম। জ্বল কমানোর ওষুধ ছাড়া আর কোনও চিকিৎসা এখনও হয়নি। জ্বর এসেছে কাল সন্ধেরাতে। ডাঃ অপ্রতিম চৌধুরী শঙ্খদার চিকিৎসা করছেন। তুই কি যেতে পারবি আমার সাথে ডাঃ অপ্রতিমের চেম্বারে? বিকেলের দিকে অফিসে একটু ম্যানেজ করে চলে আসতে পারিস?

আমি একটু ভেবে নিই। এ-ক'দিন অফিসে ভীষণ চাপ। অনেক কাজ ফাইলবন্দি পড়ে আছে। এগুলোকে এ-মাসের ভেতর সাফ করে ফেলতে হবে। আজ বিকেলে রাত্রি আমার মেয়ে টিনটিনকে নিয়ে আই আই টি কোচিং-এর জন্যে একটা কোচিং ক্লাসে ভর্তি করাতে যাবে। আমাকে ছ'টায় ওখানে যেতে বলেছে।

ওপাশ থেকে রবিদা বলে, 'কী রে, অসুবিধে?'

আমি আগুপিছু ভাবনা সাফ করে দিয়ে বলি, 'যাব। ক'টায় যাব বলো?'

—সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার ভেতর চলে আসিস।

পাঁচ.

টানা বৃষ্টি পড়ছে। এমন ভারী বর্ষণ দেখলে ভয় ধরে যায়। আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কালো কালো মেঘে ফুলে উঠেছে। দিনের আলোকে যেন মুছে দিতে চাইছে দৈত্যাকার মেঘের পাহাড়। বোধহয় উপত্যকা-শহরটি এবারও বেনোজলে ভাসবে।

ডাঃ অপ্রতিমের চেম্বারে অকথ্য ভিড়। রবিদা হেথাহোথা ছোটাছুটি করে এসে বলল, 'রাতুল, এভাবে হবে না। ভিড় দেখেছিস। ডাক্তারবাবু এখনও আসেননি। ঐ যে ছিপছিপে ছেলেটি, রোগী সামলাচ্ছে, ওকে বলে দেখতে হবে।' আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বিশৃঙ্খল ভিড় বড্ড পীড়াদায়ক। বাপু নামে একটি ছেলে, আগে খুব চিনতাম, আজকাল দেখাসাক্ষাৎ ঘটে না তেমন, দাঁড়িয়ে আছে। বারবার বলছে, 'আমি সেই বেলা তিনটে থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে, আমি প্রথমেই যাব।' বাপুর পায়ের পাতা দুটো ফুলে গেছে, দিব্যি লম্বাচওড়া স্বাস্থ্যবান ছেলে, কী হল কে জানে!

প্রায় মিনিট কুড়ি গেটম্যানটির সাথে তরজার লড়াই করে রবিদা আমাকে বলল, 'আয়।' ছিপছিপে গেটম্যানটি বলে, 'যান, ভেতরে যান।'

ডাঃ অপ্রতিম চৌধুরী তাকিয়ে আছেন। রবিদাকে দেখেই বললেন, 'কে পেশেন্ট?'

রবিদা বলে, 'আপনি শঙ্খদাকে চিকিৎসা করছেন, শঙ্খ চৌধুরী। আমরা শঙ্খদার জন্যে এসেছি।' বলে রবিদা শঙ্খদার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রের ফাইল ডাক্তারবাবুর সামনে খুলে ধরে।

ডাঃ অপ্রতিম ফের গম্ভীরমুখে বলেন, 'পেশেন্ট কোথায়?'

রবিদা থতমত খেয়ে যায়। আমতা আমতা করে, 'আপনি তো জানেন, শঙ্খদা পুরোপুরি বিছানায়, ওঁকে নিয়ে আসা গেল না, ওঁর খুব জ্বর।'

—কিন্তু রোগী না দেখে আমি কী করে ওষুধ লিখে দেব?

একটু থেমে রবিদা ধীরে ধীরে বলে, 'আপনি কি একটু সময় বের করতে পারবেন? যদি একটু বাড়ি যান শঙ্খদার, আমরা আপনাকে নিয়ে যাব—'

ডাঃ অপ্রতিম সোজা চোখে রবিদার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বাইরে কত পেশেন্ট দাঁড়িয়ে, দেখেছেন?' তারপর রাগতস্বরে যেন স্বগতোক্তি করেন, 'রোগী না দেখেই চিকিৎসা করব, ভারী আশ্চর্য!' জ্বর হয়েছে, কী থেকে জ্বর হল এই কাগজপত্তর দেখে তা নির্ধারণ করতে হবে, ভারী অদ্ভুত! ফের ইনফেকশন বাঁধিয়েছেন নিশ্চিত, ওহ্! আপনাদের শঙ্খদা! দিন কুড়ি নার্সিংহোমে ছিলেন। কোনো কোনো রাতে উনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলেই যান আর কী—লড়াই করে, যুদ্ধ করে ওনাকে ফিরিয়ে আনা হল। উফ্, উনি যে কী পেশেন্ট সে শুধু আমিই জানি!'

খস্খস্ করে অপ্রতিম প্রেসক্রিপশনের প্রান্তদেশে ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বলেন, 'এটা খাওয়াবেন দুটো করে। ব্লাড ইউরিন টেস্ট দিয়েছি, ওগুলো করিয়ে কাল বিকেলেই আমাকে রিপোর্ট দেখাবেন।'

পথে বেরিয়ে রবিদা বলে, 'কাল বিকেলে ইন্দিরার পাকা দেখা, আমার ভাগনি ইন্দিরা, যেতে হবে আমাকে। তুই কি পারবি রিপোর্টগুলো দেখিয়ে যেতে?'

—আমি তো এখন কিছুই বলতে পারছি না রবিদা।

রবিদা চিন্তিত মুখে বলে, 'তাহলে? ইউরিন, ব্লাড—এগুলো নেওয়ানোর ব্যবস্থা আমি করে দেব, বুঝলি? কিন্তু রিপোর্টগুলো ক্লিনিক থেকে এনে ফের ডাক্তারকে দেখানো, এগুলো বিকেলের কাজ—ইন্দিরার বিয়ের পাকা কথা হবে বিকেলে, বুঝলি?'

আমি কী বলব! রোজ বিকেলে কাজ কামাই করলে আমার পেন্ডিং ফাইলগুলো সচল হবে কী করে! ভাবনার কথা। রবিদা বুঝি বুঝতে পারে। একটু হেসে বলে, 'ভাবিসনি, একটু কিছু ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

ছয়.

রাতে খেতে বসে রাত্রি অনুযোগ করে, 'তুমি এলে না? টিনটিনকে কোচিং ক্লাসে ভর্তি করালাম, যা ভিড়! কতক্ষণ যে দাঁড়াতে হল। ধুর, আই আই টি-র কোচিং এখানে মোটেই ভাল হয় না।'

আমি বলি, 'আমি এলে কি ভিড় কমত? না কি আই আই টি-র কোচিং ভালো হত?' রাত্রি রেগে যায়। বলে, 'না, ভিড় কমত না, আই আই টি-র কোচিংও ভাল হত না। তবে

আমার অতো দৌড়ঝাঁপ করতে হত না। সারাদিন এই খাটুনি, আর বিকেলে এতসব ঝক্কি, শরীর কি পোষায়?'

বলি, 'পোষালেই পোষায়।'

রাত্রি রেগে ওঠে। ওর রাগ দেখে আমি হাসি। আর আমার হাসি দেখে ও রাগ ভুলে হাসে। টিনটিন হঠাৎ ঘরে ঢোকে, আমরা হাসছি দেখে সে-ও হাসে। এই ক্ষণিকের সুখ আমাদের ক্ষণিকের জন্যে আপ্লুত করে।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর যখন ছোট্ট পড়ার ঘরটাতে বসি তক্ষুণি মনে পড়ে যায় শঙ্খদাকে। শঙ্খদার খুব জ্বর, আমি ও রবিদা শঙ্খদাকে ওষুধ খাইয়ে এসেছি। এখন শঙ্খদা কী করছে! পীড়িত দেহে আধো-ঘুমে আধো-জাগবণে যাবতীয় যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে চুপচাপ শুয়ে আছে। ঘুম আসে কি শঙ্খদার? যত রাত বাড়ে, প্রাকৃতিক পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের গায়ে হাত দিতে দিতে ভিন্নতর নিরালোক যাত্রাপথের কুয়াশাঘেরা অস্পষ্টতা অনুভব করে শঙ্খদা। সেখানে কেউ নেই, অতল শীতল নিস্তব্ধ সেই যাত্রাপথ। ঝেঁপে বৃষ্টি আসে। স্বচ্ছ কাঁচের জানালার বাইরে প্রেক্ষিত থিরথির কাঁপে। শঙ্খদার খাতাগুলো কি এখন খুলে দেখব? একটা সময় গেছে, শঙ্খদা যখন পার্টি অফিসের এককোণে বসে সবুজ রেক্সিনে মোড়া খাতায় লিখত, কী কৌতূহলই না হত! আর আজ যখন শঙ্খদা এই সবকিছু আমার হাতে অবলীলায় তুলে দিল তখন সেগুলো খুলে পড়বার সময় নেই আমার! আমার অতীত কি আমার বর্তমান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে? উঠে গিয়ে বুকসেল্ফের দরজা টেনে খুলি। সবুজ রেক্সিনে মোড়া খাতাগুলো বের করে আনি। বাইরে অবিরাম ঝড়জল আমার টিনের চালে অঝোরে ঝরে পড়তে থাকে।

"এদেশে এখনও বড় অভিশাপ শিশুশ্রম। ছোট্ট ছোট্ট শিশু যখন নীল আকাশ, হলুদ প্রজাপতির ওড়াওড়ি, ফড়িং-এর প্রাণবন্ত ছুটোছুটি দেখে তখন এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবী তার মনের ভেতর এক রঙিন কল্পলোকের জন্ম দেয় এবং শৈশবের এই কল্পলোকই যে সভ্যতাকে উন্নততর করে তোলে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই অভিশপ্ত দেশে ছোট্ট শিশুকে কায়িক শ্রমে সামিল হতে দেখা যায়। অতি স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে এদের নিয়োগ করা যায় বলে শিশুশ্রমিকের নিয়োজন এদেশে ব্যাপাক হারেই ঘটে থাকে। যে পথে আমাদের আন্দোলন ক্রমবিকশিত হচ্ছে এটা ধারণা করে নেওয়া যায় যে যদি আমাদের সামনে খুব বড় বাধা না আসে তাহলে সম্ভবত দু'হাজার সালের মধ্যে আমরা এ দেশের শিশুদের তাদের হারিয়ে যাওয়া কল্পলোককে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে পারব।"

৩/৭/১৯৭৪ইং

"খুব লিখতে ইচ্ছে যায়, অথচ সময় কোথায়? ব্যস্ত পৃথিবী ছুটছে, ছুটছে সময়। তাকে

ছুঁয়ে ধরতে পিছু পিছু দৌড়োতে হয়। শরীরটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কাল ডাঃ অপ্রতিমকে দেখিয়েছি। এমন দরদী, চমৎকার ডাক্তার যদি এ-দেশে ক'জন থাকে তাহলে পীড়িত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে সুস্থজীবনের মুখ দেখতে পাবে। এমন সহমর্মী মানুষ ডাক্তার হিসেবে পাশে থাকলে মনে জোর আসে। মনে হয় অনেক কাজ নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারব। এইসব মানুষ, আমার বিশ্বাস কখনো পরিবর্তিত হয় না। মানবসেবাকেই যে এঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে! ডাঃ অপ্রতিম, তোমার মতো হাজারো চিকিৎসক এ দেশে জন্ম নিক, দেশকে রোগমুক্ত করুক। যদি কখনো এই আলো হাওয়া বাতাসের প্রতিবর্তন হয়, যদি পাল্টা হাওয়ার দাপটে ওলোটপালট হয়ে যায় সবকিছু, যদি অর্থকরী ভাবনা জড়িয়ে ধরে মানবসমাজকে, যদি মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা মরে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে দারুণ অর্থমনস্ক—সেরকম দুর্ভাগা দিনেও ডাঃ অপ্রতিমের মতো মানবেরা একক যুদ্ধে সৈনিক হবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১৮/১০/১৯৮০ইং

—কী পড়ছো অত মন লাগিয়ে?' রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে। 'এগুলো কী? এমা, কী পুরনো ডাইরির পাতা। খুদে খুদে অক্ষর। এসব কার?'

টিনটিনও এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও কথা না বলে সে ডাইরিটা বন্ধ করে দেয়। আমি হা-হা করে উঠি, 'একী! এসব—কী করছিস টিনটিন!'

টিনটিন পাশের চেয়ারে বসে পড়ে বলে, 'এসব কী পড়ছ বাবা? আমার যে সব্বোনাশ হয়ে গেল!'

আঁতকে উঠে বলি, 'কী হয়েছে তোর?'

রাত্রি বলে, 'সে খবরে কি আছ? তুমি আছ তোমার 'বানানো জগৎ' নিয়ে। সবকিছু কি আমাকে একাই সামাল দিতে হবে?'

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকি। কী এমন সর্বনাশ হল খোলসা করে না বললে বুঝি কী করে! 'বানানো জগৎ' বলতে রাত্রি কী বোঝাতে চাইছে? শঙ্খদা, শঙ্খদার জীবন সম্পর্কে এই অনুভব, আর এই রাত্রি, টিনটিন এদের এই বস্তুজগতে সরব অবস্থান দুটোই কি বিপ্রতীপ স্রোতমুখী, কেন?

টিনটিন বলে, 'দ্যাখো মা, বাবা এখন ভাবতে বসেছে। কী অদ্ভুত! বাবা, আমার কথা কি তুমি শুনবে?'

—কী বলবি বলে ফ্যাল।' বিরক্ত হয়ে বলি।

—আমার সাথে পড়ছে যারা, মানে যারা আই আই টি কোচিং নেবে তারা কোথায় যাচ্ছে জান, কোটাতে।

—কোটাতে?

—হ্যাঁ, এই আই আই টি-র বেস্ট কোচিং কোটাতে হয়ে থাকে, এটা তো তুমি জানো বাবা! আমার আজকের এই অ্যাডমিশনটা কালই তুমি গিয়ে ক্যানসেল করে দাও।'

—আজকের অ্যাডমিশন ক্যানসেল করে তোকে কোটাতে পাঠিয়ে দেব, অমন হুটহাট সিদ্ধান্ত তুই নিতে পারিস, আমাকে একটু সময় দে।

রাত্রি বলে, 'অমন চমকে উঠছ কেন? অসুবিধে তো তেমন কিছু দেখছি না। এতগুলো ছেলেমেয়ে যাচ্ছে, ওদের মা-বাবাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।'

—কোটাতে পাঠিয়ে দেবে রাত্রি, টিনটিনকে?

—তোমার প্রশ্নের ভাবার্থ আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু বাস্তবজগৎ তো অসব ভাবার্থ নিয়ে চলে না!

আমি সামনের দেয়ালে ঝোলানো ভারতবর্ষের মানচিত্রে চোখ রাখি। রাজস্থানের কোটা। টিনটিন কোনোদিন কোথাও আমাদের ছেড়ে বাইরে যায়নি। অথচ ওকে দেখে মনে হচ্ছে না এরজন্যে ওর কোনো অস্বস্তি আছে। তারপর? যদি আই আই টি পড়ার সুযোগ পেয়েই যায়, তারপর ... ... দিন গড়িয়ে যাবে, তখন হয়তো এই মানচিত্রে কুলোবে না টিনটিনের। তখন দেয়ালে টাঙাতে হবে পৃথিবীর মানচিত্র।

মুখে বলি, 'তোমরা এখন ঘুমোতে যাও। রাত হয়েছে। আমাকে ভাবতে দাও।'

টিনটিন গলা জড়িয়ে বলে, 'আমার কথাটা রাখতে হবে তোমাকে বাবা, প্লিজ! নাহলে আমি কিন্তু ভীষণ, ভীষণ রকমের ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যাব, প্লিজ বাবা! আর এখন, এগুলো তুলে রাখ বুকসেল্ফে। এগুলো পড়ে পড়বে, কেমন? আমাকে কোটাতে নিয়ে গিয়ে, ওখানে সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখে, তারপর ফিরে এসে এগুলো পড়বে।' বলে টিনটিন শঙ্খদার খাতাগুলো গুছিয়ে নেয়।

আমি হঠাৎ বেমক্কা চেঁচিয়ে উঠি, 'ওগুলোতে হাত দিসনি তুই টিনটিন।'

টিনটিন চমকে উঠে আমাকে দেখে। নিজের এই হঠাৎ উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে গলা নামিয়ে বলি, 'ওগুলো রেখে দাও। ঘুমোতে যাও তোমরা।'

মা-মেয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

রাত্রি আবার ফিরে আসে। কঠিন মুখে বলে, 'অযথা রাত করো না। ঘুমোতে এসো।'

আমি ফের ডাইরি পাতা ওল্টাতে থাকি। অনেক কাজের হিসেবনিকেশ রয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক কাজের খতিয়ানও রয়েছে। দু'চারটে প্রবন্ধও রয়েছে। কিছু কিছু ডাইরিও লেখা হয়েছে। এক কোণে চোখ আটকে যায়—

৪/৯/৮১ইং, রাত এগারোটা।

"শিশুর মনের ভিতটাতে যতই পাকাপোক্ত করে তোলা যায় ততই সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। ক্ষণিক চাঞ্চল্যে খড়কুটো উড়ে যায়, কিন্তু শিকড় ছড়ানো বৃক্ষ আন্দোলিত হয় না। এ কথাটা এ-দেশের মা-বাবাকে বুঝতে হবে। এ-দেশে যত সব অসমঞ্জস, অসুন্দর, বিসদৃশ তাকে চেতনাসমৃদ্ধ চোখে দেখাতে শেখাতে হবে। সুন্দর কী, সৌন্দর্যচেতনার প্রয়োজন জীবনে কতখানি তা যদি একটা শিশু ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শেখে, একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ার কাজে সে এগিয়ে আসবেই। আজ সন্ধ্যায়, এখানে, এই ঘরে বসে মহিলাদের এই কাজে এগিয়ে যেতে বলেছি। সৌন্দর্যচেতনার সাথে পূর্ণাঙ্গ সমাজের সামঞ্জস্য কোথায় তা-ও বুঝিয়েছি।"

সাত.

সাতসকালে রবিদার ফোন আসে, 'রাতুল, শঙ্খদার ব্লাড, ইউরিন টেস্ট করানোর বন্দোবস্ত করেছি। বিকেলে রিপোর্ট দেবে। ক্লিনিক থেকে ওগুলো এনে তুই কি পারবি ডাঃ অপ্রতিমের চেম্বারে যেতে?

আমি তো-তো করি, 'চেষ্টা করব রবিদা। সত্যি বলছি, পেরে উঠব কি না জানি না।'

রবিদা বলে, 'সে কি রে! এখনও স্থিরনিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছিস না? ঠিক আছে, আমি অন্য কাউকে বলে দেখি। যাক্‌গে, তোকে কাজ নেই।

সত্যি, খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হল। কিন্তু কী আর করা, অফিসের কাজগুলোকে গুছিয়ে তুলতে হবে।

পরদিন অফিস যাবার আগে খেতে বসেছি, রাত্রি বলে, 'টিনটিনের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

একটা অসহনীয় অনুভূতি হয়। রাত্রির সাজিয়ে দেওয়া খাবার বিস্বাদ ঠেকে। মনে হয়, খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে যাই। বলি, 'তোমার কি এক্ষুণি জবাব না পেলে চলবে না?'

রাত্রি উত্তেজিত হয়ে বলে, 'আশ্চর্য! এখনও ভেবে উঠতে পারলে না?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, 'এত তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেব কেন? আমার কি আর কোনও কাজ নেই?'

রাত্রি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'না নেই। আগে সন্তানের ভবিষ্যৎ, তারপর আর সব কিছু।'

ঠিক সেই সময়েই ডোরবেল বেজে ওঠে। রাত্রি সবেগে বেরিয়ে যায়। তারপরেই তার তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে আমূল চমকে উঠি।

—তুই রোজ আসিস কেন, বল্‌তো? আবার ঠিক অফিস যাবার সময়টাতেই জলতেষ্টা পায় তোর? বুঝতে পারিস না অসুবিধাটা?

আমি খাওয়া ভুলে ছুটে বেরিয়ে আসি। ছোট্ট ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি স্থানু হয়ে যাই। ছেলেটার মুখের সেই সহজ আনন্দের হাসি নিমিষে মুছে গেছে। একটুকরো সবুজ জমি হারিয়ে ফেলার ভয়ে দিশেহারা চোখে তাকিয়ে আছে রাত্রির 'যাদু'। দু'পা এগিয়ে গিয়ে কিছু বলব? এগিয়ে দেব এক গ্লাস জল? কিন্তু কোনো কিছুই যেন সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারি না। এবং আমাকে কোনো কিছুরই সুযোগ না দিয়ে ছেলেটা ছুটে বেরিয়ে যায়।

খাওয়ার টেবিলে ফিরে আসি। মাথা নিচু করে রাত্রির হাতে গড়া রুটি-তরকারি ধীরে ধীরে মুখে পুরি, গলাধঃকরণ করি। টিনটিন এসে টেবিলে বসে একমুহূর্তও দেরি না করে প্রশ্ন করে, 'কোটার ব্যাপার কিছু ভেবেছ কি বাবা?'

আমি নিরুত্তর।

রাত্রি ফিরে এসে গজগজ করে, 'বেশ করেছি। খুব ভাল কাজ করলাম আজ। হতচ্ছাড়ার জলতেষ্টা পায় ঠিক অফিসটাইমে। অফিসের তাড়াহুড়ো, সে সময়টাতেও ওর জল খাওয়া চাই!' রাগী-হাতে রাত্রি টেবিলের বাসনকোসন সরিয়ে নিতে থাকে।

আমি বলি, 'ছিঃ রাত্রি। বাচ্চা ছেলে, তোমার জন্যেই তো ও এ-বাড়িতে আসে। আমাদের বাড়ি, তোমার স্নেহ এগুলো ওর কাছে নীল আকাশের মতো। ওটা ওর কাছ থেকে এভাবে কেড়ে নেওয়াটা কি ঠিক হল? তাহলে তোমার প্রথম থেকেই ওকে প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক হয়নি।

রাত্রি নিরুত্তর। টিনটিনের মুখ ভার। টেবিল ছেড়ে উঠে যাই।

অফিসে টেবিলে আজ কাজ কাজ আর কাজ। কেজো সময় আমার কাছ থেকে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে শঙ্খদাকে, এবং শঙ্খদার সাথে সাথে অনেক স্বপ্নকে। অনেক আকাশচুম্বী স্বপ্নসৌধ ভেঙে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু বর্তমান। সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টার সমবায়ে চব্বিশ ঘন্টার এক-একটা দিন। চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ভেঙে ভেঙে এক-একটা ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশের এক-একটা বৃত্ত। আজ আমি শঙ্খদাকে দেখতে যাব। শঙ্খদার খুব জ্বর। দেহের উত্তাপে শঙ্খদা পুড়ছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে শঙ্খদার বাড়িতে যাব বলে একটা অটোরিকশা নিয়ে এগোই। আমি আজ 'বর্তমান' নামে অক্টোপাসটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কিছুটা ছেঁটে ফেলব। আজ একটা রাত শঙ্খদার শিয়রে বসে কাটিয়ে দেব। শঙ্খদার যখন যা দরকার হাতের কাছে এগিয়ে দেব। পকেটে মোবাইলটা বেজে ওঠে। একবার ভাবি বাজুক ওটা। আজ কারও কোনো কথাই শুনব না আমি। তারপর কী ভেবে মোবাইল ফোনটা বের করে স্ক্রিনে চোখ রাখি। রাত্রির ফোন। ফোনটা ধরব কিনা সাতপাঁচ ভেবে শেষ অব্দি না ধরে পারি না।

—কোথায় আছ? শিগ্‌গির বাড়ি এসো।

—কেন?

—টিনটিন ফেরেনি।

—ফেরেনি, ফিরবে।

—বাহ্, কেমন নিশ্চিন্ত। কিন্তু তোমার মতো তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। ওর বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে দু'একজায়গায় ফোন করেছি, যায়নি কোথাও। এভাবে না বলে কোথাও তো যায় না টিনটিন, শিগ্‌গির বাড়ি এসো।

শঙ্খদার বাড়ি যাওয়া হয় না। আমার আজকের বর্তমান আমাকে অন্ধ নিয়তির মতো দুর্নিবার টানে তার কাছেই টেনে নে আমি বাড়ি ফেরার আধঘন্টা পর টিনটিন ফেরে। এই আধঘন্টা সময় মনে হয় পৃথিবীর ঘুর্ণিপাকটাকেই রাত্রি থামিয়ে দিতে পারে। দুর্ভাবনার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে টিনটিন ঘরে ঢোকে। 'কোথায় গিয়েছিলি?' রাত্রির আকুলিত প্রশ্নের জবাবে সহজ গলায় টিনটিন বলে, 'কী মুশকিল! কোথায় যাব বলো তো। কোথাও যাইনি। একটু এদিক-ওদিক ঘুরছিলাম।'

—ফোন করলাম কত! ধরলি না যে!

—এই দ্যাখো! এজন্যেই ফোনটা আমি বাড়ি রেখে গেছি। ঘরের ভেতরে ওটা বাজছিল। শুনতেই পাওনি তুমি। তোমার টেনশনের কাছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সবই কি হার মানে মা?'

আট.

আকাশে আজও ঘনকৃষ্ণ মেঘ। কোটাতে টিনটিনকে পাঠাতে হবে। অনেক টাকার দরকার। জমানো টাকা এত নেই যে খরচ করে পার পেয়ে যাব। অসুখবিসুখ হেনতেন আপদবিপদ কত কিছুই না আছে! রবিদা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। এডুকেশন লোনটোন আজকাল ব্যাঙ্কগুলো দিচ্ছে। রবিদাকে বলে দেখব? ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে রবিদার নাম্বারে ফোন করি।

—শঙ্খদা কেমন আছে রবিদা?

—জ্বরটা এখনো ছাড়েনি। ওঠানামা করছে। ফের নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করাতে হতে পারে।

—রিপোর্টগুলো ডাক্তারের কাছে কি নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, উৎপলকে পাঠিয়েছি।

উৎপল, আমাদের পুরনো সাথী। দেখাসাক্ষাৎ হলেও বন্ধুত্বের সেই জমাট বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে অনেকটাই। শঙ্খদা উৎপলেরও বড় প্রিয় ছিল।

বলি, 'রবিদা, একটা জরুরি কথা ছিল তোমার সাথে।' এডুকেশন লোনের কথাটা বলি।

রবিদা বলে, 'একদিন ব্যাঙ্কে আয়। কাগজপত্তর ফর্মালিটিসগুলো তুই ফুলফিল করতে পারিস কিনা দেখে নিই। ওগুলো ঠিকঠাক মতো হয়ে গেলে লোন পেয়ে যাবি।'

বলি, 'তাড়াতাড়ি কিছু করা যাবে কি রবিদা?'

—দেখি, তুই একদিন আয়।' তারপর রবিদা বলে, 'শঙ্খদা তোকে বিশ্বাস করে ডাইরিগুলো দিয়েছে। ওগুলো ঠিকঠাক রাখিস।'

ফোনে কথা শেষ হলে পর আমি শঙ্খদার ডাইরিগুলো বের করে নিয়ে আসি! সযত্নে আরেকবার মুছে নিই। ভেতরে খুদে খুদে অক্ষরের শৃঙ্খলা এমনিতেই নজর কেড়ে নেয়। এটা কবে লিখেছে শঙ্খদা? তারিখ সন কিছুই লেখা নেই—

"সময়ের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস, সম্পর্ক, জীবনের চাহিদা সবকিছুই যেন পাল্টে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি বছর আগে সর্বভারতীয় কনফারেন্সে বাইরে যেতে হয়েছিল। যমুনা নদীর বুকের ওপর দিয়ে ঝমাঝম শব্দে রেলগাড়ী পার হচ্ছিল, নিচে তাকিয়ে হতবাক হয়েছিলুম। এই কি যমুনা নদী? জলস্রোত বুঝি প্রায় বুজে এসেছে। সবুজ স্রোতহীন জল আবর্জনায় প্যাবিল, গরুমহিষের দল তীরে এসে ভিড় জমিয়েছে। ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ল। মা সুরেলা গলায় গাইতেন, 'ওরে নীল যমুনার জল, বল্‌রে মোরে বল্‌, কোথায় ঘনশ্যাম?' সেই নীল জলের উচ্ছ্বাস শ্রীরাধাকে 'ঘনশ্যাম' মনে করিয়ে দিত। নদীর বুকে উপচানো জলের কল্লোলধ্বনি স্মৃতিজাগানিয়া ছিল। আজ সে বিশুষ্ক, আবর্জনায় পরিপূর্ণ। ধাবমান সময় মানেই কি প্রগতি? একসময়ে এই ধারণাটি আমার কাছে ছিল খুবই ইতিবাচক। আজ ভাবি, কথাটি বুঝি সর্বার্থে প্রযোজ্য নয়। আর মানুষ? মানুষও বুঝি সময়ের হাতেই ক্রীড়নক মাত্র। পুতুলনাচের পুতুল মোরা/যেমন নাচাও, তেমনি নাচি/হাসাও হাসি, কাঁদাও কাঁদি, মারো মরি, বাঁচাও বাঁচি।'

দেহটা আজকাল যখন-তখন বিদ্রোহ করছে। পৃথিবীর মোহময় আবেশ কাটিয়ে ওঠার সময় বুঝি হয়ে এল। পুরনো দিনগুলো যখন-তখন এ-ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়ে এসে হামলে পড়ে। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি, আমার গোটা জীবনটাই কি আগাগোড়া একটা স্বপ্ন? আমার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা এক সম্পদশালী ঐশ্বর্যময় সুন্দর সমাজব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে ছিল। সেই স্বপ্নের ইমারতটি তৈরির লক্ষ্যে যে পথচলাটি ছিল তাতে যাবতীয় বাধাবিপত্তি খড়কুটোর মতোই তুচ্ছ করেছিলাম। কেননা স্বপ্নের শক্তি যে অসীম ... ...

—কী পড়ছ অতো মন লাগিয়ে? কত রাত হল সে খেয়াল আছে?

চমকে উঠলাম। রাত্রি। রাত্রিকে দেখলাম। এই ঘন রাতে, নিশ্চুপ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে রাত্রি—যেন হিটলার!

—শোনো, টিনটিন কাঁদছে।

বেয়াড়ার মতো বলি, 'কাঁদুক।'

—তার মানে?

নির্বিকার মুখে বলি, 'মানে কিছু নেই।'

রাত্রি আমাকে দেখছে। আমি রাত্রির থেকে পিছন ফিরে জানালার বাইরে চোখ রাখি।

নিকষকালো আঁধার—একটুও আলোর রেখা নেই।

রাত্রি এখন আগ্নেয়গিরি। জীবন্ত! বিস্ফোরণ ঘটার আগেই বলে ফেলি, 'এডুকেশন লোন পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টায় আছি।'

—মানে? এডুকেশন লোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করবে। ব্যাঙ্ক সেটা স্যাংশন করলে পর টিনটিন যাবে পড়তে? তাহলেই হয়েছে। আই আই টি-তে ভর্তি হওয়ার যদি সুযোগ পেয়ে যায় তখন কী করবে? তখন কোথায় লোনের জন্যে ছুটবে শুনি?

টিনটিন মেধাবী ছাত্রী। আই আই টি পড়ার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা জানি।

মুখে বলি, অতসব জেনেশুনেবুঝে তুমি কী করবে? 'যখন যেমন, তখন তেমন'—তুমি এখন যাও। ভাল লাগছে না আমার।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। পেছন ফিরে দেখি রাত্রি চলে গেছে। এখন বাইরে রাত কিছুটা ফর্সা। ঘন মেঘের আস্তরণ এদিক থেকে ওদিকে অবলীলায় সাঁতার কাটছে। কোনো কোনো জায়গায় হালকা মেঘের আড়ালে চাঁদের আলোর উদ্ভাস দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর শঙ্খদার ডাইরিগুলো নিশ্চল পড়ে আছে। এখন উঠব, ডাইরিগুলোকে বুকসেল্ফের এককোণে চালান দেব। তারপর যাব ঘুমোতে। আকাশ জুড়ে চাঁদ ও মেঘ লুকোচুরি খেলবে সারারাত। আমি ততক্ষণ অসাড়ে ঘুমোব। সারারাত ঘুমিয়ে দেহমন চাঙ্গা করে তুলতে হবে। কত কাজ! এ মাসের ভেতর অফিসে পেণ্ডিং ফাইলগুলোকে সচল করে তুলতেই হবে।

দীপেন্দু দাস

গ্রন্থি

দু' দিন থেকে ফাইলটা খুঁজছি। এখন অব্দি পাইনি। ফেরার ফ্লাইটের টিকিট হয়ে গেছে। কাল দুপুর বারোটায় ছাড়বে। দাদা আসতে পারেনি। চার দিনে শ্রাদ্ধ হয়েছে। এর থেকে বেশির অধিকারী মেয়ে নয়। নতুন অ্যাসাইনমেন্টে দাদা সিডনিতে। ওখানেই শ্রাদ্ধ-শান্তি করবে। ফ্ল্যাট আপাতত তালাবন্ধ থাকবে। সামনের শীতে দাদা কলকাতা আসতে পারে। শিলচর অব্দি আসার সময় হবে না। বাড়ির একটা ব্যবস্থা তখন হবে।

এই ফাইলের কথা বাবা নাকি দাদাকে বলেছিল গত যাত্রায়। কোথায় থাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। ফ্ল্যাট, বিমা, ইত্যাদির কিছু জরুরি কাগজপত্র আছে ওটাতে। মৃত্যুর আগমন বার্তা হয়ত বাবা টের পাচ্ছিল।

দাদার বলামতো জায়গাটায় ফাইলটা নেই। আশপাশ ভাল করে খুঁজলাম। নেই। বিছানার তোষক ওলটাতে কালো পাড় সুতির একটা শাড়ি বেরোল। মণিমাসির হবে। যাওয়ার সময় নিতে ভুলে গেছে।

ঘরে এখন আমি একা। মণিমাসি শ্রাদ্ধের পরের দিন চলে গেছে। ওকে একবার বলেছিলাম আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে। রাজি হয়নি। কি একটা আশ্রমে নাকি থাকবে। ভালই থাকবে ও বলল। খুব খারাপ লাগছিল ও যাওয়ার সময়। সেই কবে থেকে আমাদের বাড়িতে। জোর করে কিছু পয়সা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছি। আমাদের ঠিকানা দিয়েছি। আমার নতুন মোবাইল নম্বর দিয়েছি। কষ্ট হলে জানাতে বলেছি। ওকে যতটুকু জানি ও কখনোই আমায় কিছু জানাবে না।

□ □ □

রাত বারোটা নাগাদ মণিমাসির ফোন পেয়েছিলাম। বাবার শরীর হঠাৎ খারাপ করেছে। সম্ভবত স্ট্রোক। খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না কিছুদিন থেকে। তবু চলাফেরা ছাড়ে নি। সল্ট লেকে আমাকে কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কমলেশেরও সায় ছিল।

'মেয়ের বাড়িতে মৃত্যু হলে মৃতদেহ পেছনের দরজা দিয়ে বার করতে হয়। নইলে পরের জন্মে গাধা হয়।' বাবা হাসতে হাসতে বলেছিল। 'তোমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকার তো একটাই দরজা। পেছনে কোনও দরজা নেই।'

বাবা এসব বিশ্বাস করে না। আমাকে ক্ষেপাতে কথাগুলো বলেছিল। বোকার মত খুব ক্ষেপে গিয়েছিলাম আমি। বাবার সাথে একপ্রস্থ ঝগড়া করেছিলাম। বাবা মিটমিট করে হাসছিল। চিরদিন বাবা নিজের কাজ নিজে করত। কাজের লোককেও পারতপক্ষে কিছু করতে বলত না। যারা অন্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে বাবা তাদের পরজীবি বলত।

◻ ◻ ◻

টেবিলের ছোট্ট তাকে 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি'। হেমিংওয়ের এই বইটা বাবা আমাকে সরস্বতী পুজোয় কিনে দিয়েছিল। 'পড়া-ই পুজো', বাবা বলত। ছোটবেলা থেকে বাবা-ই আমার বন্ধু। দাদা মায়ের ন্যাওটা ছিল সব সময়।

—তুমি কার ছেলে?' কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, 'মার ছেলে।' পাশে দাঁড়িয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতাম, 'আমি বাবার মেয়ে।' জিজ্ঞেস করার সুযোগ দিতাম না। আসলে আমাকে তেমন পাত্তা দিত না কেউ। দাদা পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। স্কুলে ডিবেট কম্পিটিশনে ফার্স্ট হত। ক্যুইজে স্কুল রিপ্রেজেন্ট করত। আমার সবকিছু ছিল মাঝারি মানের। দেখতেও ভাল ছিলাম না। চিরদিনই কালো। কোনও অনুষ্ঠানে বাবা-মা'র সাথে যাওয়ার সময় আমার কোনও পোশাকই মায়ের পছন্দ হত না। মা একসময় বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে বলত, 'পুরো তোমার রঙ পেয়েছে।' বাবা হেসে বলত, কালে হ্যায় তো ক্যা হুয়া দিলওয়ালে হ্যায়।' খুনসুটি থেকে একদিন সত্যি ঝগড়া হয়ে গেছিল। মা দাদাকে নিয়ে চলে গেল। বাবা আমাকে নিয়ে সিনেমা হলে গেল 'হোম এলোন' দেখতে।

◻ ◻ ◻

জরুরি কাগজপত্রের সেই ফাইলটা খুঁজতে গিয়ে আমি নাস্তানাবুদ হয়ে গেছি। আলমারির লকার থেকে শুরু করে সমস্ত ড্রয়ার খুঁজেও পেলাম না। পুরনো একটা কাঠের ড্রয়ার শুধু বাকি। তালা ঝুলছে। খোলা যায় নি। মণি মাসির দেওয়া চাবির গোছাতে ওই তালার চাবি নেই।

ফ্লাইটে ওঠার আগেও মণিমাসির সাথে কথা বলেছিলাম। বাবা কোমাতে। পাড়ার

ডাক্তারবাবু এসেছেন। বাবা ঘরে। হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। আকাশ পরিষ্কার। প্লেন সময়মতো ছাড়ল। এক ঘন্টা বসে শিলচর পৌঁছে গেলাম। যতবার প্লেন এই মাটি স্পর্শ করে মিষ্টি একটা অনুভূতি হয়। এই আলো-হাওয়াতেই বেড়ে ওঠা। মিষ্টি সেই পরশ অনুভব করার অবকাশ আজ ছিল না।

প্লেন থেকে নেমে দেখি মোবাইলে নেটওয়ার্ক নেই। মণিমাসি থাকায় খানিকটা ভরসা পাই। যদিও তারও বয়স বাড়ছে দিন দিন।

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি আমি। রোজ দুধ দেয় যে গোয়ালা সে বড়জালেঙ্গা থেকে এনে দিয়েছিল। সদ্য বিধবা। কেউ নেই। কাজের লোকের খুব দরকার ছিল আমাদের। মা রান্না-বান্না করার সময় পেত না। ব্যস্ত থাকত সবসময়। অনেকগুলো সংগঠন-এর সাথে জড়িত ছিল। বাবা কলেজ থেকে এসে নিজের পড়ার ঘরে বই-এ ডুবে যেত। মাঝে মধ্যে আমাকে পড়াতে বসত। দাদার সাথে বসার দরকার হত না কখনও। ম্যাট্রিকে দাদা সারা আসামে ফার্স্ট হল। মা কিটি-পার্টির সবাইকে বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিল। দাদা সবার মাঝখানে বসে মায়ের কথামত রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা শুনিয়ে দিয়েছিল। যদিও রবীন্দ্র-নজরুল আমি ভাল আবৃত্তি করতাম, আমায় কেউ কবিতা বলতে বলে নি। মাঝে মধ্যে কষ্ট হত। অভিমান হত। ক্ষোভ বেশি সময় থাকত না। দাদা যে সবদিকেই আমার থেকে অনেক অনেক ভাল। ছোটবেলা থেকেই মেনে নিয়েছিলাম। অভিমান বেশি সময় না থাকার আরেকটা বড় কারণ বোধ হয় বাবা। আমার মন পড়তে পারত। আমার না-বলা কথা বাবা টের পেয়ে যেত। গোমড়া মুখে বসে থাকতে দেখলে কপালের চুল নাড়িয়ে দিত। মন ভাল হয়ে যেত আমার।

□ □ □

টেবিলের ওপর সংবর্ধনাপত্র হাতে ফ্রেমে বাঁধানো দাদা। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে পাওয়া।

হায়ার সেকেণ্ডারিতে সায়েন্সে টেনথ্ হয়ে দাদা পিলানিতে গেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। পাঁচ বছরের মাথায় ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টে মুম্বাই বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি। তারপর বিদেশ। তারপর থেকে, এমনকি টিভির পর্দায়ও আমার না দেখা, বিভিন্ন জগতে। সঙ্গত কারণেই দাদাকে নিয়ে খুব গর্ব ছিল মায়ের। নিজের একই ক্লাসের ইঞ্জিনিয়ার মারাঠি মেয়ে বিয়ে করল দাদা। শিলচরের সব থেকে বড় হোটেল ভাড়া করে বিয়ের পার্টি হয়েছিল। বাবা তখন চাকরির শেষ প্রান্তে। ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে কলেজে বেতন হত না নিয়মিত। সঞ্চয়ও তেমন কিছু ছিল না। এতো বিশাল আয়োজনে বাবার সায় ছিল না। দাদার সাথে ফোনে কথা বলে মা সব ঠিক করেছিল। পুরো খরচ দাদা দিয়েছিল। বিশাল অঙ্কের বেতন ছিল তার।

অভ্যাগতদের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক। মায়ের সাংবাদিক বন্ধুরা পরের দিনের লোক্যাল কাগজে ছবিসহ খবর ছেপেছিলেন। মায়েরও ছবি ছিল খবরের পাতায়।

এই অনুষ্ঠানে দু'বছরের মাথায় দাদা যখন ডিভোর্স এবং কয়েকদিনের মধ্যে জার্মানিতে দ্বিতীয় বিয়ে করল, কোনও পার্টি হল না। ততদিনে একদিন অন্তর ছেলের ফোন পাওয়াব অভ্যেস মা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। সপ্তাহ গড়িয়ে যায়, তিন মাস বা তারও বেশি ব্যবধানে মা অভ্যস্ত হতে লাগল। একসময় ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেল।

ইউনিভার্সিটি থেকে এসে খেতে বসলে মণি মাসিকে কোনও কাজের ছুতোতে আমার সামনে থেকে মা সরিয়ে দিত। স্কুল-কলেজে থাকতে যা কখনও করে নি, তাই করত। উল্টোদিকে চেয়ারে বসে কথা বলতে চাইত। কথা খুব এগোত না। মায়ের সাথে গল্পে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। আমাদের গল্পের বিষয় বা দেখার চোখ সবই আলাদা। আমারগুলো অনেকটাই বাবার আদলে গড়া।

মায়ের বাইরের ব্যস্ততা কমে এসেছিল অনেকখানি। সংগঠনগুলো থেকে আগের মত ডাক আসত না। টের পেতাম মা খুব একা হয়ে যাচ্ছে। মনে হত আমার সঙ্গ চাইছে। সেমিস্টার সিস্টেমে পড়ার খুব চাপ থাকায় মাকে খুব একটা সময় দিতে পারতাম না। ইকনমিক্সে প্রচুর ম্যাথস্ থাকায় বাবার সাহায্য লাগত। সেই মুহূর্তগুলো খুব উপভোগ করতাম আমি।

মায়ের শ্রাদ্ধের দু'দিন আগে দাদা এসে পৌঁছেছিল। মাছ স্পর্শের পরের দিন চলে যায়। প্রিয় সন্তানের হাতে অন্তিম সংস্কার হয়নি জানলে মায়ের কী মনে হত জানি না।

□ □ □

আলমারি, বুক সেল্ফ তছনছ করেও ফাইলটা পেলাম না। একটা স্যুটকেসে একটা বহু পুরনো অ্যালবাম। আমার জন্মদিনে বাবা দিয়েছিল। পুরোটা জুড়ে দাদার ছবি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পুরস্কার নেওয়ার, ডিবেট প্রতিযোগিতার। একটাতে শুধু আমরা চারজন। শেষ পাতায় বাবার হাত ধরে আমি। বরাক সেতুতে দাঁড়িয়ে বিজয়া দশমীর দিন ঠাকুরের বিসর্জন দেখছি।

এই সেতুতে পৌঁছাতেই নেটওয়ার্ক এসেছিল। শুনলাম খুব ধীর লয়ে শ্বাস বইছে। বুকের ভেতর কেমন একটা অনুভূতি হল। ব্যথা নয়, মোচড় নয়, অনেক কিছু নয়। কিন্তু কী যে সেটা নাম খুঁজে পেলাম না।

ঘরে পা রেখে দেখলাম বেশ ক'জন লোক। আবাসনের অনেকেই ছুটে এসেছেন। গোমড়া মুখে কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ বা বসার ঘরে বসে। আমায় পথ ছেড়ে দিলেন সবাই। মণিমাসি বাবার পায়ের কাছে বসে বাবাকে ছুঁয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠল মাসি। বাবার বুকে হাত ছোঁয়ালাম। কোনও স্পন্দন নেই। চোখ তুলে তাকালাম।

ডাক্তারবাবু নীরবে ইঙ্গিত করলেন, বাবা নেই।

□ □ □

আমি যে খাটে বসে আছি, এই খাটেই বাবা শুয়েছিল। ধরাধরি করে স্ট্রেচারে বাবাকে নিচে নামানো হল। রোটারি ক্লাব থেকে সৎকারে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি এসেছিল। গাড়ি আর মোটর সাইকেলে চেপে আবাসনের কয়েকজন শ্মশান যাত্রী হলেন।

সমান করে বিছানো এক প্রস্থ কাঠের ওপর উপুড় করে বাবাকে শোওয়ানো হল। একখানা ধুতি সারাটা শরীর জড়িয়ে আছে। একটা একটা করে ফালি কাঠ ঢেকে দিচ্ছে দেহখানা। হাঁটু দু'টো ভাঁজ করে তার ওপর কাঠ দেওয়া হল। অল্প পেছনে চলে গেছে বলে দশাসই একজন দু'হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে বাবাকে নিয়ে এলেন সামনের দিকে। বুক, পেট, পিঠ হয়ত সম্পূর্ণ ছড়ে গেছে। আঁৎকে উঠেছিলাম আমি। একটা শব্দও বেরিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। বিব্রত বোধ করলাম আমি। বাবা তো নেই আর। মৃতদেহতে আরও কাঠ চাপা দিতে দিতে ভদ্রলোক আপন মনে বলে উঠলেন, 'মেয়েদের মন নরম। তাই শ্মশানে মেয়েদের আসতে নেই।'

আমার শ্মশানে আসাতে কেউ আপত্তি করেনি। আবাসনের অলিখিত নিয়মে কেউ কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। তবু দু-একজনের অবাক হওয়ার অভিব্যক্তি চোখ এড়ায় নি। পিতার শেষযাত্রায় মুখাগ্নি কন্যার হাতে। এটা সে পূর্ণ সমর্থন পায় নি সেটা ভদ্রলোকের কথাতে টের পেলাম। পুরুতমশাই দক্ষিণার অঙ্ক আগেই জেনে নিয়েছিলেন। মেয়ের হাতে মুখাগ্নিতে কোনও আপত্তি করলেন না।

মহাশ্মশানের কালীমন্দিরের ছাউনির তলায় ছেড়া জামা গায়ে চিৎ হয়ে শোওয়া একটা লোক। কয়েকজন শ্মশানবন্ধু লাগোয়া চায়ের দোকানে। এক টুকরো বাঁশে কাপড় জড়িয়ে ঘি মাখানো হল। হাতের ইশারায় পুরুত ঠাকুর আমায় ডাকলেন। বাঁশের ডগায় ঘি ভেজানো কাপড় আগুনে ছোঁয়ালাম। কথামত বাবার মুখে আগুন ছোঁয়াব, এমন সময় চণ্ডাল চিৎকার দিয়ে থামিয়ে দিল। তারপর একটা বড় কাঠের টুকরো উঠিয়ে অভ্যস্ত হাতে শরীর থেকে শেষ বস্ত্রখানা সরিয়ে নিল। কাঠের আচ্ছাদনে বাবা নিরাবরণ। তারই দেহের উপাদানে তৈরি আমি তার মুখে আগুন ছোঁয়ালাম। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চুল্লি। বৈদ্যুতিক হাওয়ায় আগুনে শিখা আকাশ স্পর্শ করল। মুহূর্তে আমার বাবা উত্তপ্ত কয়লার গনগনে আঁচে হারিয়ে গেল! এই প্রথম বুকে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে কান্না পেল আমার।

□ □ □

দুই গালে দুই ফোঁটা জলের স্পর্শে চমক ভাঙল। কাঠের ড্রয়ার বাদে বাকি সব জায়গায়

খুঁজে দেখা হয়ে গেছে। ওটাই বাকি। তালা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। কাল সকালেই বেরিয়ে যাব। ফ্ল্যাটের দারোয়ান ছেলেটাকে ডাকলাম। হাতুড়ির দুই ঘা দিতেই ভেঙে গেল তালা।

কোনও ফাইল নেই। কয়েকটা ভ্যানিটি ব্যাগ, কিছু সাজার সরঞ্জাম, বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন মেটালের মালা। মায়ের নামে দুটো বাঁধানো মানপত্র। কিছু ম্যাগাজিন। এগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। খুব সুন্দর একটা ডায়েরি। গোটা গোটা অক্ষরে 'শুধু তোমার জন্য'। কে দিয়েছিল মাকে? বাবা নিশ্চয়ই নয়। এটা বাবার হাতের লেখা নয়। পাতা ওল্টানো সম্ভব ছিল না। ছোট্ট একটা ক্লিপ দিয়ে আটকানো। তার ওপর একটা তালা। মায়ের অনেক বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে কেউ হয়ত।

একটা নিষিদ্ধ কৌতূহল হল। পাশে পড়ে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগগুলো খুলতে লাগলাম একে একে। চকোলেট রঙের একটাতে চেন আঁটা ভেতরের খোপে চাবিও পেয়ে গেলাম। চাবি ঘোরাতেই খুলে গেল তালা।

যা চোখে পড়ল তার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। প্রথম পাতায় মলাটের মত শব্দ তিনটে আবার লেখা। নিচে উপহারদাতার কোনও নাম নেই। দুই থেকে দশের পাতা অব্দি বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যার প্রতিটার কেন্দ্রে দাদা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফাস্ট হওয়া, চাকরি, প্রথম বিদেশ যাত্রা, বিয়ে, পার্টি। তারপর কয়েকটা পাতা খালি। তারপর হঠাৎ আমি। মাত্র দুটো লাইন।

'রু আমাকে avoid করে। ও কি বদলা নিতে চাইছে?'

আমি আঁৎকে উঠলাম। এ কী কথা! এটা কী ভাবল মা। কীসের বদলা নেব আমি? কেন নেব? মায়ের ওপর কীসের ক্ষোভ আমার?

নিজেকে প্রশ্নগুলো করতে গিয়ে দেখি কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি পাতা ওলটালাম। আবার তিনটে পাতা খালি। তারপর যা দেখলাম অনেকক্ষণ লেগে গেল বুঝে উঠতে। মাথা ঝিম ঝিম করছিল। কোনও ভূমিকা ছাড়া লেখা। এই প্রথম বাবাকে নিয়ে।

"এতো বড় একটা ঘটনা লুকাবে আমি কল্পনা করতে পারছি না। কেন HIV টেস্ট করার দরকার হল, আমায় বলে নি কিছু। ও গুয়াহাটি গেছে একটা সেমিনারে। মণি বুক সেল্ফ ঝাড়ছিল। একটা বইয়ের ভেতর থেকে রিপোর্টটা টুপ করে ঝরে পড়ল। ওর Skin-এর সমস্যা আছে জানতাম। আগে খুব dry ছিল। ইদানিং লক্ষ্য করিনি। ও নিজের জগতে। আমি আমার। ঘরে কথা যা বলে রু-র সাথে। কাজের কথা মণিকে বলে। HIV টেস্ট করার প্রয়োজন হল কেন? রিপোর্টটা জায়গায় রেখে দিয়েছি।"

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল আমার। পাতা ওল্টালাম, দু'তিন পাতা খালি। তার পরের পৃষ্ঠায় কয়েকটা লাইন।

"কাল মাঝরাতে, মনে হল, ও বুক সেল্ফ হাতড়াচ্ছে। 'কারওর ব্যক্তিগত জীবনে কেউ

হাত দিক আমি চাই না,' কথাটা আমি-ই ওকে বলেছিলাম। রিপোর্ট নেগেটিভ। তাই কিছু জিজ্ঞেস করিনি ওকে। আজ অব্দি আমায় কিছু বলে নি।"

আর কিছু নেই ডায়েরিতে। প্রথম থেকে শেষ অব্দি পাতা ওল্টালাম। কোনও পাতায় তারিখ নেই। ঘটনাক্রম দেখে মনে হল অনেকদিনের ব্যবধানে লেখা। হঠাৎ অনুভব করলাম পা টলছে। প্রচণ্ড অবসন্ন লাগল। হাঁটু ভেঙে এল। বসে পড়লাম মাটিতে।

আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের লালিত ধারণাগুলো এক লহমায় ভেঙে যেতে লাগল। বাবা আমার এতোটাই অপরিচিত! মায়ের বাইরে অন্য নারী কি তাহলে জীবনে এসেছিল! বিবাহ-উত্তর জীবনে? এ কোন্ পিতা আমার। আর ভাবতে পারছি না। ফেলে আসা জীবনের চার ভাগের তিনভাগের সঙ্গী এই কি সে-ই বাবা! কাঁদতেও পারছি না আমি। অথচ বুক দুমড়ে একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে। ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি।

◻ ◻ ◻

কাল সারা রাত ঘুমোই নি। সত্যিই কি অন্য নারী এসেছিল বাবার জীবনে? এলেও কোন ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছালে এই পরীক্ষা করাতে হয়! বাবাকে কেমন ঘেন্না হল। এই নারী কে হতে পারে? মণি মাসি? না, ভাবতে পারছি না। মা মারা যাওয়ার পর সুকোমল ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোমার বাবা রসেবশে থাকবেন।' ও সবসময় ফাজলামো করে। এটা ওর স্বভাব।

কিন্তু এই সম্ভাবনা বাতিল করতে বাধ্য হলাম। মণি মাসি তো খুব কম বয়স থেকে আমাদের বাড়িতে। ও তো বহুভোগ্যা ছিল না। রিপোর্টের তারিখ জানি না। তবু ডায়েরির পাতার ক্রম অনুযায়ী ঘটনাটা সম্ভবত বাবার অনেক বয়সের। এই বয়সে তাহলে কেন এই টেস্ট। যত ভাবছি কোনও থই পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল ডায়েরির কথাগুলো সত্যি তো? না কি আমার সম্বন্ধে মা যা বলেছে ঠিক সেরকম মা-ও বাবার বিরুদ্ধে বদলা নিতে চাইছে? ডায়েরিটা কোনও না কোনও দিন ছেলেমেয়েদের হাতে আসবে মা জানত। আর জানতে পারব আমরা, বিশেষত বাবার সবথেকে কাছের আমি। হয়ত সেটাই মা চেয়েছিল। চেয়েছিল আমার মন থেকে বাবা চিরদিনের জন্য মুছে যাক। সত্যি হলে মা আমাকে জানাল না কেন?

নাকি আমি মায়ের প্রতি অবিচার করছি। ডায়েরির বাকি পাতাগুলো তো অসত্য নয়। হয়ত, এমনকি, আমার সম্বন্ধে লেখা দুটো লাইনও নয়। শৈশব থেকে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের অনেকদিন অব্দি মায়ের জগতের প্রান্তেই ছিলাম আমি। কষ্ট হত। বাবা থাকায় সেই কষ্ট তীব্র হয়নি কখনও। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা কোথাও ছিল মনের কোণে।

অনেক রাতে হয়ত ঘুম নেমে এসেছিল চোখে। কাকডাকা ভোরে ভেঙে গেল। এপাশ-ওপাশ করতে করতে শেষ অব্দি বিছানা ছাড়লাম। গোছগাছ এখনও হয়নি।

বাবার জরুরি কাগজপত্রের ফাইলটা পেলাম না। ডায়েরি হাতে আসার পর থেকে খোঁজার

শক্তি বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না।

□ □ □

কুম্ভীগ্রাম এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে বরাক সেতুর ওপর ট্যাক্সি থামাতে বললাম। মাঝখানটাতে যেখানে বাড়তি পিচ ফেলে ফাটল ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আর কবে শিলচর আসব কে জানে! হয়ত কখনোই নয়। শেষ সূত্রও কেটে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস আচমকা আমায় চমকে দিয়ে গেল। বরাক জলকাদা নিয়ে আপন মনে বয়ে চলেছে। স্পিড বোট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নদীর বুকে। দু-একটা ডিঙি নৌকা বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমার সামনে খানিকটা এগিয়ে বরাক বাঁক নিয়ে বাঁ পাশে হারিয়ে গেছে। উল্টোদিকে বহু দূরে চলতে চলতে মিলিয়ে গেছে মাঠ আর আকাশে।

বাবার হাত ধরে কতদিন এখানে দাঁড়িয়ে বিজয়া দশমীর বিকেলে প্রতিমা বিসর্জন দেখেছি। দুর্গা মা সপরিবারে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন নদীর গভীর জলে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছে, 'ফ্লাইট মিস করি লাইবা।'

হাতের ব্যাগ খুলে তালা বন্ধ ডায়েরিটা বের করলাম। তারপর চারপাশে তাকিয়ে চাবিসহ ছুঁড়ে ফেলে দিলাম নদীর জলে। একবার মাথা ওঠানোর চেষ্টা করেই, ডায়েরিখানা মুহূর্তে হারিয়ে গেল দ্রুত বয়ে যাওয়া আবর্তে।

দীপেন্দু দাস

হরনাথ একদিন

সাত সকালে পুত্রের কনুইয়ের গুঁতোয় ঘুম ভেঙে যায় হরনাথের। 'বাবা ওঠ, পড়তে বসব।'

ভোর ঘুমের আবেশটা বেশ চেপে বসেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে খাটের একপাশে সরে যায় হরনাথ।

—আরেকটু চাপো। আমি হোমটাস্ক করব কি করে!

—অতখানি জায়গাতে পড়া যায় না?' রাগ ধরে হরনাথের।

ঘুমের আবেশ যাতে না কাটে তাই চোখের পাতা না মেরেই আরো খানিকটা সিঁটিয়ে যায়। সিঙ্গল খাট। হাত-পা ছড়িয়ে একজনেরই কম পড়ে। লিকপিকে শরীর বলে তেমন অসুবিধে হয় না।

এক রুমের ভাড়া ঘরে দারাপুত্র নিয়ে হরর সংসার। ছেলে নিয়ে শিবানী মেঝেতেই শোয়। সকালবেলা সেই বিছানা তোষক খাটের উপর চালান হয়। একটা শোবার ঘর, কিচেন আর বাথরুম। এতেই চারঠে কড়কড়ে একশোটাকা বেরিয়ে যায়। লাইটের বিল আলাদা। দুটো ফ্যামিলিতে শেয়ার করতে হয় ল্যাট্রিন। কেউ একজন ঢুকল তো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো দুই পা চেপে।

কাল লেট নাইটে টিভির ছবিটা দেখে শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে গেছে। ঘুম লাগতে লাগতে মাঝরাত কাবার। বেতনের খানিকটা আর এরিয়ারের টাকাটা দিয়ে গতমাসে সাদা-কালো পোর্টেবলটা কেনার পর থেকে একটা নেশা হয়ে গেছে শিবানীর। সিন্যামা থাকলে ছাড়বে না ও কিছুতে। টিভি চললে হরর আবার ঘুম আসে না। বন্ধ করাও যাবে না টিভি। বাধ্য হয়ে তাই

ভালো না লাগলেও, পরদিন সকালে গা ম্যাজ ম্যাজ করবে জেনেও, সিনেমা দেখতে হয়।

কাল-ও রাতে ঘুমটা হয়নি ঠিকমত।

ছেলেটা সুর করে পড়তে শুরু করেছে। 'ব্যা-ব্যা ব্ল্যাকশিপ ...।' ঘুমের বারোটা বেজে গেছে। 'বাবা ব্ল্যাক শিপ', মনে হয় হর'র।

খটাস্ করে একটা শব্দ হল। একরাশ আলো এসে চোখে লাগে। ধুস্! বিরক্তি বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে। জানালা খুলে দিয়েছে শিবানী।

—বেলা করে মটকা মেরে পড়ে না থেকে ছেলেটাকে নিয়ে একটু বসো।

প্রতিক্রিয়ার কোনো লক্ষণ নেই। হর শুয়েই থাকে, হাতের চেটোয় চোখ আগলে। একটা আধটা ধেনোলঙ্কা এবার যোগ হয়।

—বাপ হয়েই তো খালাস। ঝক্কি তো সব আমার।

নাঃ! আর শুয়ে থাকা যাবে না। উনুনের আঁচ এবার আরো উত্তপ্ত হবে। মুঠো মুঠো শুকনো লঙ্কা এবার পড়বে উনুনে।

শিবানীর চোখে চোখ পড়ে সিঁদুর আর রাতের ঘামে সারাটা কপাল লেপ্টে আছে। চোখের কোণে পিঁচুটি। দাঁতে ব্রাশ। ঠোঁটের দু'পাশ বেয়ে থুতু গলা পেস্টের ধারা। বিরক্তি লাগে তাকিয়ে থাকতে। টানা পাঁচ বছরের প্রেম হরনাথের। সাতসকালের এই রূপটা যদি তখন চোখে পড়ত একবার! এমনটা তো কখনও ছিলনা শিবানী—মনে হয় হরনাথের।

মায়ের গলার আঁচে খোকার পড়ার আওয়াজও বেড়ে গেছে একলাফে। সেই সাথে দুলুনি।

মাথাটা ঝিম ঝিম করে। প্রেসার বেড়েছে নিশ্চয়। একটু হাইয়ের টেণ্ডেন্সি বিয়ের পর-পরই ধরা পড়েছে। গড়িয়ে নেওয়া আর হয় না। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল ছিটায় হরনাথ।

ঠিক তখুনি গলা ভেসে আসে শিবানীর—বালতি ঢেলে দিও না। কালও জল আসে নি। আজ কখন আসে কে জানে!'

জল আসে নি বলে স্নানই হয়নি কাল। আজও না এলে মুশকিলে পড়া যাবে। সারাটা দিন বাজারে, বাসে, আপিসে গুঁতোগুতি করে সারা গায়ে যা গন্ধ ছাড়ে! বিকেলে আপিস থেকে এসে আরেকবার স্নান করা ওর চিরকালের অভ্যেস। কাল একবেলা স্নানও হয়নি। আপিস থেকে ফিরে দেখে জলই আসেনি বিকেলে। এক বালতি জল রাখা ছিল। ভরসা হয়নি আর খরচ করার।

এ পাড়ায় জলের গোলমান প্রায়ই হয়। অথচ ঠিক পেছনেই অফিসার পাড়া। ওখানে নাকি জল আসে দু'বেলা।

চোখমুখ ধুয়ে ঘরে এসে ঢুকতেই রান্নাঘর থেকে শিবানী বল্ল—বাজারে যেতে হবে।'

—আজ না গেলে হয় না?' মিন মিন করে হরনাথ। পকেট প্রায় খালি। মাসের সাতটা দিন এখনো বাকি।

—খালি ভাত মুখে রুচলে, হয়।' শিবানীর তিরিক্ষে জবাব।

—অসহ্য!' মুখ দিয়ে বেরিয়েই পড়ে শব্দটা।

—অসহ্য তো সংসার করা কেন!' শিবানীর গলা চিরে যায়। 'বিয়ের পর-পরই ছেলে পেটে দিতে কে বলেছিল?' পরের কথাটাতে গলা খানিকটা নেমে যায়। খোকার পড়া থেমে গেছে। মা'র গলার আওয়াজ থামতেই সুর করে পড়া আবার শুরু হয়।

—বড় আরামে রেখেছ আমায়।' ঠকাস্ করে চায়ের কাপ টেবিলে এসে নামে। চা ছলকে থিন অ্যারারুট দুটো ভিজে যায়। এক চুমুকে গিলতে গিয়ে ছ্যাঁকা লাগে জিবে। মেজাজ ছিঁড়ে যায় হরনাথের। বাকি চা'টুকু জানালা দিয়ে ঢেলে ন্যাতানো বিসকুট দুটো খোকার হোম টাস্কের খাতায় ছুঁড়ে দেয়। তারপর শার্টটা গায়ে গলিয়ে বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

—আমার খাতায় দাগ লেগে গেল!' খোকার চিৎকার ভেসে আসে পেছন থেকে।

গলিটাতে জল জমেছে খুব। লাউ দিয়ে দিয়ে জলকাদা এড়িয়ে চলে হরনাথ। হোঁচট খায় দু-একবার। গত চার বছরে একটা পয়সারও কাজ হয়নি গলিটাতে। মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনের আগে কত গালভরা বুলি শুনেছিল। দু'পাশে পাকা নালা হবে। সারাটা রাস্তা পিচ হবে। কচু হয়েছে। এ পাড়ার ভোটে জিতে ওয়ার্ড কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। রাস্তা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে আছে।

একটা সাইকেল রিক্সা পেছন থেকে পোঁ-পোঁ করে। মর শালা! সাইডে যাওয়ার জায়গা নেই। পথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে হরনাথ। রিক্সাওয়ালা কোনো উচ্চবাচ্য না করে রিক্সা থেকে নেমে হাতে ঠেলে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

দু'পা এগোতে না এগোতেই ওপাশ থেকে একটা মারুতি প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ে; রাস্তার একপাশে গিয়ে গা বাঁচায় হরনাথ। শাঁ করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গায়ে-মুখে একরাশ কাদা ছিটিয়ে যায়। রাগে খিস্তি বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। মারুতিটা ততক্ষণে গলির বাঁকে হাওয়া।

পাশের মিষ্টির দোকান থেকে একগ্লাস জল নিয়ে মুখটা ধোয় হরনাথ। দোকানী ছেলেটা দাঁত বার করে হাসে। 'কাপড়ের কাদা শুকোতে দিন। ঝরে যাবে।' বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে হর।

গলির মোড়ে শিবমন্দিরটার সামনে বেশ ভিড় জমেছে। শিবরাত্রি-টাত্রি তো নয় এখন। কিছু একটা হবে নিশ্চয়। বাঙালীর তো পুজোর শেষ নেই। শিব মন্দিরটাতে পুজো নিয়মিত হয় টয় না। দরজা ভেজানোই থাকে সবসময়, বিশেষ তিথি ছাড়া। বেওয়ারিশ কুকুর দু-একটা বারান্দায় রাতের আড্ডা জমায়। একপাশে শিবের নামে ছেড়ে দেওয়া শম্ভু ঠ্যাং ছড়িয়ে আয়েস

করে।

বাজারের মুখে আসতে আসতে কাপড়ের কাদা প্রায় শুকিয়ে আসে। ঝরে পড়তে শুরু করে একটু-একটু করে।

শাকসব্জির যা আকাশ-ছোঁয়া দাম। আলুর কিলো ঠেকেছে আটে। পেঁয়াজ তো সেই কবে থেকে বারো ছেড়ে নামছেই না। মাছ বাজারের দিকে পা বাড়াতে আর সাহসই হয় না।

টিভিতে কালও প্রাইম মিনিস্টারের মুখটা দেখাল। বুলেট প্রুফ দেওয়ালের আড়াল থেকে কোথায় যেন লেকচার দিচ্ছিল 'দ্রব্যমূল্য রোধ করা গেছে' বলছিল বড় গলা বাজিয়ে। এদিকে দিনকে দিন আকাশ ছুঁতে চলেছে জিনিসপত্রের দাম।

হবে না! স্ক্যাম করতে করতেই তো বারোটা বাজাচ্ছে দেশটার। হরির লুট চলছে। জিনিস পত্রের দাম কন্ট্রোল করবে কে!

ফিরে আসার পথে পকেট হাতড়ে কোণায় পড়ে থাকা কয়েকটা খুচরো পয়সার উপস্থিতি অনুভব করে হর। আধকেজি আলু আর পেঁয়াজ, কয়েকটা পটল, টম্যাটো একপোয়া আর চারটে ডিম পেণ্ডুলাম হয়ে দোলে।

মাসের বাকি ক'টা দিন যে কি করে যাবে! প্রতি মাসের শেষে হাত পাততে আর ভাল্লাগে না। আর কার কাছেই বা পাতা যায় হাত? লজ্জাও তো লাগে।

ফেরার পথে চোখে পড়ে গলির মোড়ে শিবমন্দিরে ভিড় আরো বেড়েছে। পাশ কেটে বেরিয়ে আসে হরনাথ।

শিবানী দাঁড়িয়ে আছে গেটে। পড়শি দু-তিনটে বউও দাঁড়ানো সাথে। এ পাড়ার মেয়ে-বৌ গুলোর এই এক স্বভাব। পথে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার গল্প। অবশ্য ঘুপচি ঘরগুলোতে বসে গল্প করার জায়গাই বা কোথায়? পাশ ফিরতে গেলে দেয়ালে গা ঠেকে। শিবানী অবশ্য খুব একটা দাঁড়ায় না পথে।

কাছে আসতেই শিবানী বলে—'ওগো শুনছ।' মধু যেন ঝরে পড়ে গলায়। বাজারে যাবার সময় তো অত তিরিক্ষে ছিল মেজাজ!

শিবানীর অবশ্য এই মেঘ তো এই রোদ্দুর। আড়চোখে তাকায় হরনাথ। সহজে তরল হতে রাজি নয় সে।

—গণেশঠাকুর দুধ খাচ্ছেন!

—কি?' বুঝে উঠতে পারে না হর।

—আজ সকাল থেকে শিব মন্দিরে গণেশ ঠাকুর দুধ খাচ্ছেন!' কথাগুলো মগজে থিতু হয়ে বসতে খানিকটা সময় নেয়।

—এই তো মলির মা'ও খাইয়ে এসছেন একটু আগে!' শিবানী উত্তেজিত। মলির মা'র

মুখে বিজয়িনীর হাসি।

—ও তাই নাকি।' খুব একটা পাত্তা দেয় না হরনাথ। বলে বসে 'কোনো কাজ তো নেই'। আপিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাজারের থলে হাতে নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে। পেছনে পেছনে শিবানীর উত্তেজিত প্রবেশ।

—তুমি বিশ্বাস করো নি, না? মলির মা নিজে খাইয়ে এসেছে। রিন্টির মা ওরা সবাই গেছে দুধ নিয়ে শিবমন্দিরে।

শিবমন্দিরের ভিড়ের কারণটা অতক্ষণে টের পাওয়া গেল। বিস্তারিত শোনা গেল ধীরে ধীরে। আজ সকাল থেকে শিবমন্দিরে গণেশ ঠাকুর নাকি দুধ খাচ্ছেন। সকালবেলা ভুঁইঞাবাড়িতে নাকি ফোন এসেছে। মেয়ে-জামাই করেছে জয়পুর থেকে! ওখানেও নাকি গণেশ ঠাকুর সবখানে দুধ খাচ্ছেন! গণেশ ঠাকুরের মুখে দুধ ধরতেই দেখা যায় চামচের দুধ মুহূর্তে নিঃশেষ!

আপিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে। শোনার আর সময় হয় না।

জল এখনো আসেনি। না আসুক। আধবালতি জল দিয়ে নমো-নমো করে স্নান সারে শিবানী। এমনিতে তিন-চার বালতি না হলে ওর গা ভেজে না। স্নান সেরে আলমারি খুলে লালপাড় শাড়িটা বার করে গায়ে চাপায়। খোকাকে আর হরনাথকে বার বার সাবধান করে 'ছোঁবে না আমাকে।' খানিকটা দুধও পাশের বাড়ির বাঁধা দুধওয়ালার কাছ থেকে জোগাড় হয়ে যায়। ছেলেকে পিছু পিছু নিয়ে সবার ছোঁয়া এড়িয়ে শিবানী মন্দির পানে ছোটে। যাবার সময় ডেকে বলে যায়, 'তরকারি করা আছে, যাবার আগে ভাতটা ফুটিয়ে নিও। আমার আসতে দেরী হলে তালা মেরে চাবিটা পাশের ঘরে দিয়ে যেও।'

গজ-গজ করতে করতে ভাত ফোটাল হরনাথ। বালতিতে জল এক ফোঁটাও নেই! স্নান আজও হবে না। গুম মেরে বসে আছে, ঠিক এমন সময় ভস্ ভস্ করতে করতে কলে জল এল। দাড়ি দাড়ি কেটে বালতি বালতি জল ঢেলে অনেক দিন বাদে আয়েস করে স্নান সারল।

শরীরটা বড় ঝরঝরে লাগছে। একটা গানের কলি গুন গুন করতে করতে ভাত বাড়া হল। খাওয়া হল। আপিস যাওয়ার জন্য তৈরী হল। শিবানী এখনো আসে নি। দরজায় তালা দিল হরনাথ। পাশের বাড়িতে কেউ নেই। দরজায় তালা। তস্য পাশের বাড়িতে চাবিটা দিয়ে জোর হাঁটা দিল।

দশটার বাসটা মিস করলে ঝামেলা হবে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে আজ।

যাবার পথে গলির মোড়ে লাইনটা তখন আধ কিলোমিটার ছাড়িয়েছে। ভিড়ের মধ্যে শিবানীকে চোখে পড়ল না।

বাই একটা পেলেই হল। ঠিকমত খাওয়া জোটে না। অনাহারে লোক মরে এখনো। স্যামে স্যামে বারোটা বেজে গেল দেশটার। জিনিসপত্রের দাম চড়ছে তরতর করে। কোনো

মাথাব্যথা নেই কারো। সবাই মেতেছে গণেশের দুধ খাওয়া নিয়ে। দেশ বটে আমাদের!

আপিসে আজ প্রচণ্ড উত্তেজনা। কাজকর্ম মাথায় উঠল। সারা শহর জুড়ে গণেশ দুধ খাচ্ছেন। অনেক জায়গা থেকে খবর এসেছে ফোনে। বিভিন্ন জায়গাতেই খাচ্ছেন গণেশ ঠাকুর। চামচ দিয়ে ঠাকুরের মুখে দুধ ধরলেই চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নিচ্ছেন। কোথাও কোথাও শুধু গণেশ নন, শিবঠাকুর, হাতি, ইঁদুর সবাই খাচ্ছেন দুধ।

অ্যাকাউন্টেন্ট বাবু বললেন, 'মিরাক্যল।' ছোট কেরাণি বললেন, 'ভাঁওতাবাজি। বিজেপি-র প্রোপাগাণ্ডা। রাম গেল তো গণেশকে নিয়ে টানাটানি। পিয়ন রমাকান্ত বলল, 'হাজার হাজার চোখের সামনে গণেশ দুধ খাচ্ছেন। এ ভাঁওতা কি করে হয়?'

আপিসে ফাইলপত্র আজ জায়গা থেকে প্রায় নড়লই না। দাড়িওয়ালা টাইপিস্ট ছোকরা দু-একটা দরকারি কাগজপত্র নিয়ে তাঁর রুমে গেলে বিশাল ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন বড়সাব, 'কি হে কার্ল মার্কস্, তোমার বস্তুবাদ কি বলে!' যুৎসই জবাব না পেয়ে চুপসে গেল বেচারা।

বড়বাবু বাইফোকেলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে বললেন, 'বিংশ শতাব্দীর শেষে একটা প্রলয় হবে। নস্ট্রাদামুসে আছে কথাটা। বাইবেলেও আছে। আমাদের পুরাণেও আছে। গণেশের দুগ্ধপান তারই লক্ষণ।'

নাক কুঁচকে বড়বাবুর দিকে না তাকিয়ে ভাববাচ্যে ছোটবাবু বললেন, 'নস্ট্রাদামুসে আছে হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ হবে। সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে হিন্দুধর্ম, এটা তারই ইঙ্গিত।'

দুটো বাজতে বাজতে আপিস খালি হয়ে যায়। বড়সাব বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে জরুরি ফোন পেয়ে। বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন মাথাব্যথায় কাল ঘুম আসেনি বলে। ছোটবাবুর মিউক্যাস যাচ্ছে দু'দিন ধরে। পেটে হঠাৎ কামড় দিয়েছে। রমাকান্ত টিফিন আওয়ার্সের আগে বলেই ফেলল কথাটা, 'দাদা একটু দেরী হবে ফিরতে। ঠাকুরকে একটু দুধ খাওয়াব।'

আপিস থেকে যখন বেরিয়ে এল হরনাথ টাইপিস্ট ছোকরা গুম হয়ে খটাখট খটাখট টাইপ মেশিনে গায়ের ঝাল যেন ঝেড়ে চলেছে।

বাস স্ট্যাণ্ড পাওয়ার আগে একটা মন্দির পড়ে পথে। প্রায় এক কিলোমিটার লাইন। ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা, বুড়ো কেউ বাদ নেই। মহিলা-পুরুষ দুটো লাইন হয়েছে। কিছু ভলান্টিয়ার জুটেছে। লাইন মেন্টেইন হচ্ছে। ছোটখাটো মেলা মত বসে গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ফুচকা ও ঝালমুড়ি ওয়ালা চুটিয়ে ব্যবসা করছে।

কি মনে করে বাসে আর চড়ল না হরনাথ। গুটি গুটি পায়ে লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দুধ কোথায় পাওয়া যায়! সামনের মোটা মতন ভদ্রলোক সন্দেহ নিরসন করলেন। মন্দিরের ভেতর দুধ পাওয়া যাচ্ছে। এক চামচ দু'টাকা।

লাইনে চেনাজানা দু-একজন বেরিয়ে এল। পরিচিত এক ফিজিক্সের লেকচারার। ডিফেন্স দেওয়ার সুরে বললেন, 'দেখতে এলাম। ব্যাপারটা ঠিক কি?'

চপ্পল রাখার ব্যবস্থা হয়েছে ভলান্টিয়ারের দৌলতে। ভিড়ে আজ ধাক্কা খেয়েও বিরক্ত হল না হরনাথ। কেউ খেঁকিয়ে উঠল না পা মাড়িয়ে দিলে। জোরে ধাক্কা লেগে গেলে পেছনের জন সবিনয়ে স্যরি বলল।

ঘন্টা দুয়েক ভিড়ে কসরৎ করার পর ঠাকুরের সামনে আসা গেল। ধুনুচি জ্বালিয়ে পুজো হচ্ছে গণেশ বাবার। রোদ থেকে এসে ঝাপসা ঠেকে হঠাৎ সবকিছু। ধীরে ধীরে খানিকটা সয়ে আসে।

দুধে ভেসে যাচ্ছেন সাদা পাথরের গণেশ বাবা। বেশ ক'জন দশাসই লোক কোনো রকমে ঠাকুরের গায়ে হামলে পড়া আটকাচ্ছে। এক পুরুত মশাই হাঁড়িতে দুধ নিয়ে বসে আছেন। পাশে দুটো খালি হাঁড়ি পড়ে আছে। যৎসামান্য দক্ষিণামূল্যে দুধ দেওয়া হচ্ছে এক চামচ দু-টাকা।

ঠাকুরের মুখে জনে জনে ছোঁয়াচ্ছে চামচ ভরা দুধ। ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে চামচ-ভরা দুধ। বহুকন্ঠের জয়ধ্বনি উঠছে, 'জয়, গণেশবাবা কি জয়!'

এক বৃদ্ধা ঠাকুরের সামনে বসে আছেন হাতজোড় করে। অঝোর জল ঝরে যাচ্ছে তাঁর দুচোখ বেয়ে। সকাল থেকেই নাকি ঠায় বসে আছেন বৃদ্ধা। অনেক চেষ্টায়ও ওঠানো যায়নি।

বুকের মধ্যে একটা প্রবল দাপাদাপি টের পায় হরনাথ। দু'টাকার দুধ চার জোড় হাতে। ঠাকুরের মুখে ছোঁয়াতেই কে যেন চিৎকার দিল, 'খাচ্ছেন, এই তো খাচ্ছেন!' আশপাশ থেকে জয়ধ্বনি উঠল, 'জয় গণেশবাবা কি জয়!'

একটু ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার আগেই পরের জন এগিয়ে এলেন গণেশ বাবার মুখে দুধ ধরতে।

চামচটা ফিরিয়ে দিয়ে ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এল হর। ফিজিক্সের স্যারও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন। হরনাথের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলব বলুন! নিজের চোখেই তো দেখলেন সব। সায়েন্স এখনো ইনফেন্সির স্টেজে। জগতের সব রহস্য কি আর এক্সপ্লেন করা যায়!'

একটা ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরল হরনাথ। শিবানীর হাতেও ঠাকুর দুধ খেয়েছেন। প্রচণ্ড উত্তেজিত ও। সবার ভাগ্যে এমনটি হয় না। পাড়ার কারো কারো হাতে আবার ঠাকুর দুধ খাননি। 'খাবেন কি করে! বউটা যা কুচুটে। মারা যাওয়ার আগে বুড়ি শাশুড়িকে কম জ্বালিয়েছে! পাপী-তাপীর হাতে ভোগ নেবেন কেন ঠাকুর!' বুলার মা চলে যাবার পর বলে শিবানী।

খোকা ওর কৌটো ভেঙে দশটাকা দিয়ে গণেশ ঠাকুরের একটা ক্যালেণ্ডার কিনে এনেছে।

খুব খুশী শিবানী। ছেলের ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি আছে। টাকাগুলো ফালতু গচ্ছা গেল, একবারও আজ মনে হল না হরনাথের।

রাতে টিভি আর রেডিও গণেশের দুগ্ধপানে সরকারী স্বীকৃতির ছাপ দিয়ে গেল। সারা দেশজুড়ে উত্তেজনা। সবখানেই গণেশ দুধ খাচ্ছেন। বি.বি.সি-তে বলল খোদ ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও ঠাকুর দুধ খাচ্ছেন। বিজ্ঞানীদের কি একটা মন্তব্য নিউজের শেষের দিকে বলল। শিবানী আর খোকার উত্তেজিত কথাবার্তায় ওটা শোনাই গেল না ঠিকমত।

'ধুস্!' ভাবল হরনাথ। 'বিজ্ঞানীরা কি আবার বলবে! বিজ্ঞান তো এখনো ইনফেন্সির স্টেজে।'

রাতে মুগডাল আর গরম গরম পটল ভাজা দারুণ লাগল। শিবানী বলল, 'এমন একটা দিনে মুগডালই করলাম। ডিম তো এনেছ। কিন্তু আমিষ ছুঁতে মন চায় নি আজ।'

—ঠিকই করেছ।' বলল হরনাথ। খোকাও আজ ডিম আছে জেনেও খাওয়ার জন্য জিদ করল না।

অনেকদিন বাদে খাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীতে গল্প হল। টুকিটাকি কথা থেকে খিটমিট হল না। চোখের জল ঝরল না। খোকার কাচা ঘুম ভাঙল না।

ঘর ভাড়া, সকালের বাজার, লাইটের বিল, অমুকের মা, তমুকের বউ—এসব কিছু এল না আজ। তবু গল্প হল অনেক রাত।

শিবানী বলল, 'জানো, আজ না ঠাকুরের মুখে চামচ দিয়ে দুধ ধরেছি। দেখি আমার হাতে দুধ নেন না ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তোমাকে মাঝে-মাঝেই যা-তা বলে বসি রাগের মাথায়। কত পাপই যে হয়েছে! চোখ বুজে ক্ষমা চাইলাম ঠাকুরের কাছে। তারপর চোখ খুলে আবার দুধ ধরতে দেখি ধীরে ধীরে চামচের দুধ খালি।' পাশ ফিরে হরর ডান হাতটা দুই হাতের মুঠোয় চেপে বলে শিবানী, 'তুমি আমায় ক্ষমা করো গো।'

বুকের মাঝে কি একটা সুর বেজে ওঠে টের পায় হরনাথ। সবকিছু কেমন নতুন-নতুন লাগে। আদরে বুকে টেনে নেয় বৌকে। অনেকদিন পর পরম নিশ্চিন্তে নিজেকে স্বামীর বুকে ছেড়ে দেয় শিবানী। 'ছাড়ো, সকালে উঠতে হবে'—একবারও বলে না।

চুলে বিলি কেটে দেয় শিবানী। আবেশে চোখ বোজে হরনাথ।

হঠাৎ মনে হয় তার, দিনটা তো আজ বড় অন্যরকম কেটেছে। সকালের একটু গরমা-গরম ছাড়া সারাটা দিন তো আজ দারুণ গেছে! কোথাও কোনো ঝগড়া নেই। লেট আপিস নিয়ে বড়বাবুর ব্যাজার মুখ দেখা নেই। ম্যানেজারের কাছে কথা শোনা নেই। বাসের গুঁতোগুতি তে-তিরিক্ষে খোঁচা নেই। মন্দিরে লাইনে পা মাড়িয়ে দিলেও মুখঝামটা নেই। রাতে বাড়ি ফিরে বৌয়ের গোমড়া মুখ নেই। সব যেন কেমন বদলে গেল একটা দিনে।

কপালে দুটো উষ্ণ ঠোঁটের পরশ টের পায় হরনাথ। রক্তে যেন বান জাগে হঠাৎ। মৃদু ছোঁয়ায় ক'টা আঙুল বুকে বাঁ-পাশ বেয়ে ওঠে। রোমকূপে শিহরণ খেলে যায়।

গলির এবড়ো-খেবড়ো পথ, কলে জল না-আসা, জিনিসপত্রের দাম, মারুতির কাদা ছিটানো, স্ক্যাম, ওড়িশায় অনাহারে মৃত্যু, বধূহত্যা—এ'সব কিছু একবারও এখন মনে আসে না।

বৌয়ের সোহাগের উত্তাপ দেহমনে নিতে নিতে ভাবে হরনাথ—'গণেশ ঠাকুর মাঝে মাঝেই কেন দুধ খান না!'

অমিতাভ দেব চৌধুরী

মীরাবাঈ

স্বপ্নটা রাত-দুই ধরে দেখছে মধুমিতা। একা, একেবারে একা, একটা ট্যাক্সি চেপে কোথাও যাচ্ছে সে। কোথাও মানে—কোনো পাহাড় প্রদেশে। কেননা, যে রাস্তা ধরে যাচ্ছে তার একদিকে অতল খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়। চারপাশে সবুজের আস্ফালন, সবুজের উল্লাস, সবুজের সমারোহ, সবুজের উৎসব। হঠাৎ, ওমা একী, এও কী হয় নাকি জীবনে? যেন রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত আকস্মিকতায়, ট্যাক্সিটির ড্রাইভার উন্মাদ হয়ে গেল। একেবারে পাগল, বদ্ধ পাগল। স্টিয়ারিং ছেড়ে, দু'হাত তুলে, যেন শিশুর আগুন নিয়ে খেলার মতো বিপজ্জনক আনন্দে, সে, হাতের পালক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো সহজভাবে, চলন্ত গাড়িটিকে ভাসিয়ে দেয় খাদের ভেতর ওত-পেতে-থাকা রাশিরাশি, অথৈ, জমজমাট শূন্যতায়।

স্বপ্নের ঠিক এখানটায় এসে গতকালও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মধুমিতার। আজও ভাঙল। ধড়ধড়াস করছে বুক, কপাল ছেয়ে গেছে ঘামে, গলা শুকিয়ে কাঠ। অসীম ঘুমোচ্ছে। ডিমলাইটের থেকেও নেই আলোয় ধরা পড়ে তার রোমশ বুকের ওঠাপড়া, এবং এরপরই প্রায় অব্যর্থভাবে চোখ চলে যায় তার আণ্ডারওয়্যারের নিচে রোমশ পা'দুটির দিকে। বিতৃষ্ণায় চোখ সরিয়ে নেয় সে। সন্তর্পণে, অসীমকে ডিঙিয়ে, খাট থেকে নামে। টেবিলের প্লেটচাপা গেলাস থেকে ঢকঢক করে জল খায়। আচ্ছা, কেউ কী পাগল হয়ে যেতে পারে ওরকম হঠাৎ? সুস্থতা আর পাগলামির মাঝখানে কি কোনো কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া থাকে না?

দেয়ালের দিকে অমোঘভাবে দৃষ্টি চলে যায়। ঐ তো সেই মেয়েটি, খানিকটা কামময়, খানিকটা পরিহাসের হাসি হাসছে যেন তারই দিকে চেয়ে। যেন এই পরিহাসপ্রিয়তা দিয়ে জগৎকে, জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত ও। ঈষৎ ভাবুকতায় আক্রান্ত স্বপ্নোত্থিতা চমকে ওঠে।

সত্যিই কি এইভাবেই সে জীবনকে দেখত একদা? এই ফটোর প্রতিটি অণু, প্রতিটি পরমাণু মুখস্থ বলে দিতে পারে সে। তাই এই নেই-আলোয় ফটোটিকে দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না তার।

আবছা একটা গানের কলি মনের মধ্যে, জলের নিচে বঁড়শিতে মাছের ঘাই দেবার মত, জেগে ওঠে। নাকি, সে ভেতর ভেতর গেয়েই ওঠে গানটা? 'কুঞ্জবন ছাড়ি হে মাধোঁ কাঁহা যাও কোনধাম?' ইশ্, কতদিন, কতদিন হয়ে গেছে তানপুরা ছোঁয়া হয়নি। তারে তারে তার নিশ্চয়ই অবহেলার আর প্রতীক্ষার অনন্ত ধূলি।

বছরখানেক আগে, তাদের বিয়ের মাসদুই পরে, এক মধ্যরাত্রে সঙ্গমক্লান্ত অসীমকে উন্মাদিনীর মতো ঘুম থেকে জাগিয়ে মধুমিতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি করে বল তো, তুমি আমাকে না আমার ওই ফটোকে বেশি ভালোবাস?' মদের খোয়ারিতে আক্রান্ত ছিল বলেই বোধহয়, বউ-র এই আকস্মিক, উন্মত্ত আচরণকে অসীমের তেমন বিসদৃশ মনে হয়নি; যেমন সে স্পর্শ করতে পারেনি ওই প্রশ্নের নিহিত গভীরতাকেও। প্রবোধ আর ক্ষমার হাসিতে বড়রা যেভাবে ভুলিয়ে দিতে চায় ছোটদের বেয়াড়া বায়নাকে, তেমনি, হেসে মূল প্রশ্নটিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়ে, বউকে যথাবিহিত প্রবোধ, সান্ত্বনা আর ভালোবাসার কথা বলে, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল অসীম। সেই থেকেই শুরু এই গল্পের।

দুই.

ঐ তো ঘরের কোণায়, মোড়ার শান্ত সুরক্ষায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে তানপুরাটি। মধুমিতার শখ, কিন্তু আবেগ নয়। গান সে কখনোই গাইত না। গলায় সুর থাকলেও না। রিসার্চ করতে গিয়ে, কী এক হঠাৎ-জাগা টানে, একজনের কাছ থেকে মোটামুটি সস্তায় কিনে ফেলেছিল তানপুরাটা। বাবা তখনো জীবিত। তাদের ঢাকুরিয়া পাড়ার সংসারে সচ্ছলতা উপচে না পড়লেও, অভাব তখনো দাঁত খিঁচোয়নি। ছোটবোন সুমিতার কাছ থেকে চার-পাঁচদিনে বাজানোও শেখা হয়ে গিয়েছিল। এখানে, এই কলকাতা থেকে কত দূরে কেজানে, শহরের তারাপুর পাড়ায় ছিমছাম, শৌখিন ফ্ল্যাটবাড়িতে, তানপুরাটিও যেন তারই মতন প্রবাসী, একা। অসীম, মুখে কোনোদিন কিছু না বললেও, সে বেশ বোঝে, এই তানপুরা, গান গাওয়া এ'সব একেবারে পছন্দ করে না। নামকরা চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সে। হিসেব টিসেব এ'সবের বাইরে, গৃহকাতরতা—অধুনা স্ত্রী-কাতরতা, এই তার জীবনের কেন্দ্র এবং পরিধি। দু-একদিন বলেছিল, তানপুরাটাকে লক্ষ্য করে, 'ওটাকে আবার বয়ে নিয়ে এলে কেন, সুমিতার জন্য রেখে এলেই তো পারতে'—যেন তোমার জন্য তো আমি আছিই, আবার তানপুরা-টুরা কেন, বাজাও আমারে বাজাও—ভাবটা এমনই। ওই ভাবের মুখোমুখি হতে হবে বলেই, মধুমিতা কখনো মনের ইচ্ছেটা অসীমকে বলেনি। এখানে, এই একা একা, সীমাবদ্ধ, দীর্ঘ দুপুরগুলোয় যে ইচ্ছেটা কিছুদিন ধরেই তার মাথায় চারিয়ে গেছে, গান শেখার ইচ্ছে। খুবই নামকরা একটা

সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে এই ছোট্ট শিলচর শহরে। সেখানে ভর্তি হয়ে গেলে, গানের চর্চায় দিব্যি তার অলস প্রহরগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু মনের শখ মনেই আটকে রেখেছে মধুমিতা। জানে, অসীমের কাছ থেকে এসব ব্যাপারে প্রশ্রয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে না। বাঁধানো রাজস্থানী পেইন্টিংটা, তানপুরার পাশের দেয়ালে আবছা আলোয় জেগে আছে। একটি মেয়ে,তাকে ঘিরে আছে ময়ূরসহচরীরা আর দৃশ্যসহচরেরা, তার হাতে বীন কিংবা ঐ জাতীয় কোনো লৌকিক বাদ্যযন্ত্র। কে উনি? মীরাবাঈ? কোন অশ্রুত গান গাইছেন তিনি ছবিটিতে বসে? মধুমিতা একটু সময় ভাবল, মনে মনে ঝালিয়ে নিল, চোখ বন্ধ করে মনের ভেতর শুনতে চাইল সুর, তার নিজেরই ভেতরের সুর :

'রাণাজি ম্যায় তো গিরিধরকে ঘর জাঁউ
গিরিধর হামারি সাঁচো প্রীতম
দেখত রূপ লুভাউঁ ... ...'

মনে হল, তানুপুরাটিতেও যেন এই প্রথম গ্রীষ্মের বরাকপারের মন্থর হাওয়ায় নীরব কোনো সুর বেজে উঠছে।

মীরা। মীরাবাঈ। তার রিসার্চের বিষয়। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, কিন্তু অবস্থা ও পরিবেশের অদলবদলের ফলে মনে হয় যেন কতকাল আগের কথা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে এম.এ পড়েছিল মধুমিতা, বাবারই আগ্রহে। মা এসব পড়াশোনার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন। বলতেন, 'মেয়েকে আর কত ধিঙ্গি করবে, বিয়েদাও, দিয়ে ঘাড়ের বোঝা কমাও।' সেই বোঝা শেষপর্যন্ত কমালেন মামারা, বাবার আকস্মিক প্রয়াণে। অসীম ছেলে খুব ভাল। মা-বাবা কেউ নেই তার, বছর সাতেক আগে পরপর গত হয়েছেন তাঁরা। কাকা আছেন একজন, আপন নয়, তুতো। অসীম সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র ছেলে। অথচ, আশ্চর্য, অভিভাবকহীন ব্যাচেলর জীবনেও বখে যায়নি। মামারা এ বিষয়ে মা'কে বলে দুই শতাংশ নিশ্চিত হয়েই বিয়েটা দিয়েছিলেন। আর অসীমের বখে না-যাওয়ার সবচেয়ে বড় রক্তমাংসের সাক্ষী তো এ বাড়িতে বছরখানেকের নবাগতা সে নিজেই। মাঝেমধ্যে কিঞ্চিৎ মদ্যপান —এছাড়া, অসীমের আর কোনো কু অভ্যাস নেই। আর, মনে হয়, এখানেই মধুমিতা হাঁপিয়ে গেছে। এত সাজানো গোছানো জীবন অসীমের, এত শান্ত, নিস্তরঙ্গ, ছক কাটা যে মনে হয় এখানে মধুমিতার ভূমিকা কেবল সেজেগুজে বসে থাকার। তার অস্তিত্ব যেন টেবিলের ওপর বাঁধিয়ে রাখা তার ঐ ফটোটার মতন। হ্যাঁ, ঐ ফটো তার প্রতিপক্ষ। যেন সবসময় তার দিকে চেয়ে আছে, এই যে, আমার মত হতে শেখো। সেজেগুজে স্বামীর মন ভরাতে শেখো : এরকম ফটোজীবন না ছুঁতে পারলে তোমার বেঁচে থাকাটাই বৃথা।

তিন.

বিশ্ববিদ্যালয়ে, এম.এ পড়ে রিসার্চ করতে শুরু করেছিল মধুমিতা। ভক্তকবিদের নিয়ে।

তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাঈ। তখনই, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড তানপুরাটি কেনে সে। প্রচুর পড়ে ফেলেছিল তখন। তার মনে হত মীরার সবচেয়ে বড় পরিচয় : তিনি একজন নারী। সমস্ত জীবন ধরে মীরা খুঁজে বেড়িয়েছেন যাঁকে—সে কে? সে কি ঈশ্বর? গিরিধারীলাল? নাকি তাঁর আত্মপরিচয়? মীরা কি খুঁজে বেড়াননি তার নিজস্বতাকেই? নারীর পরিচয়ের সমাজনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় খুশি হতে পারেননি বলেই পূর্বাশ্রমের পুতুলপ্রেমিক ঈশ্বরকেই বানিয়ে তুলেছিলেন নিজের বিদ্রোহের মাধ্যম? তাই তাঁর ছিল কেবলই এক সন্ধান, কেবলই এক অন্তহীন পথ, তার ধুলি; আভরণ আর আবরণসর্বস্ব জীবন ছুঁড়ে দিয়ে নিজের প্রেমকে এক কঠিন সাধনার দিকে এগিয়ে দেওয়া? অর্থাৎ, মীরার ভক্তিই ছিল তাঁর বিদ্রোহ, নারী হিসেবে তাঁর নিজস্বতারই প্রতীক? আচ্ছা, এমনটা যে সে ভাবত, না কি নিজে একজন মেয়ে বলেই? কিন্তু, এই ভাবনা তো কখনও কালিকলমের মুখ দেখল না। বাবা মারা গেলেন। আর মধুমিতার সমস্ত নিশ্চিন্দিপুর একমুহূর্তেই যেন পাষাণপুরীতে পাল্টে গেল।—

ছাড় দেয়হ্ কুলকি কান ক্যায় করেগা কোঈ।
অসুঁয়ন জল সিঁচ সিঁচ প্রেম বীজ বোঈ।
মীরা প্রভু লগন লাগি যো হোঈ সো হোঈ।

গানটা গলা থেকে নয়, উঠে এল যেন ঐ রাজস্থানী পেইন্টিং থেকে। খুব আস্তে দরজাটা খুলে ব্যালকনিতে এল মধুমিতা। ওই যে রাস্তা, মাঝে হঠাৎ অকস্মাৎ চলে যাওয়া গাড়ির হেডলাইটে একটু আগের হঠাৎ-বৃষ্টির জমে যাওয়া জল চিকচিক করছে। মধুমিতার মনে ভেসে উঠল অন্যরকমের এক রাস্তার ছবি—ধুলিধূসর রুক্ষ মরুপ্রান্ত পেরিয়ে মাঠঘাট প্রান্ত ছাড়িয়ে যা কেবলই যোধপুর থেকে মেবার হয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলেছে। যা একটি মেয়ের পদরেখায় ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে যেন যুগযুগান্তের ইতিহাসের ধুলিমলিনতা আর বিস্মৃতি ভেদ করে। যা একটি মেয়ের জীবনপথ। পথ যখন কারও জীবনে ঘর হয়ে ওঠে, সেই ঘরের আহ্বানের কাছে রাজার সম্পদও তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু, সেই খাদ আর অতল অতল আহ্বান—একটু আগে দেখা স্বপ্নের ভেতর? মধুমিতা শিউরে ওঠে।

বাঁ-স্তনের ওপর তীব্র একটা ব্যথার হল্‌কা জেগে উঠেই, মিলিয়ে গেল। অসীমের ভালোবাসার চিহ্ন। অসীমের ভালোবাসা ওরকমই। তীব্র হিংস্র শ্বাসরোধী। মনে হয়, ওই ভালোবাসা যেন দু'বাহু মেলে গ্রাস করে নেবে তার সমগ্র সত্তাকে, সমগ্র অস্তিত্বকে। অসীম বলতে গেলে প্রায় বিয়ের রাত্তির থেকেই সন্তান চাইছে আর সে অসীমের অলক্ষ্যে, যে কোনও সময় ধরা পড়তে পারে জেনেও, পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে সন্তানের আগমনকে পিছিয়ে রাখতে চাইছে। অবশ্য আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না বোধহয়। নিজের পুরুষত্বে প্রবল বিশ্বাসী অসীম ইতিমধ্যেই আভাস দিয়েছে একবছরের ওপরে হয়ে গেল বিয়ের, এখনো যে সন্তানের আগমনবার্তা ঘোষিত হল না, মধুমিতাকে বোধহয় এবারে পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই হবে। আসলে, মধুমিতাও যে

সন্তান চায় না তা নয়। কিন্তু প্রথম থেকেই অসীমের সাংসারিক আড়ম্বরে সে বুঝতে পেরেছিল, অসীমের উদগ্র পিতৃত্ব তার ভেতরের পাখিটিকে একেবারে পুরোপুরি ডানহারা করে দেবে। যে কোনো মেয়েকেই আরও বেশি করে সংসারে জড়ানো এই এক উপায় পুরুষের।

বিয়ের পরপরই খটকা লেগেছিল। অত যে বন্ধুবান্ধবের কথা শুনেছিল বিয়ের সম্বন্ধ চলাকালে, শুনেছিল যে বন্ধুরা সবাই কৃতী এবং অসীমের বন্ধুপরায়ণতা আর সে সঙ্গে নিজের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখার কৃতিত্ব সারা পাড়ায় প্রায় কিংবদন্তী সমান। 'নিজের বলতে কেউ নেই, একটা ভাইবোনও না, কিছু একটা নিয়ে থাকবে তো ছেলেটা।' তা, বিয়ের পর দেখল, বন্ধুবান্ধব কেউই আসে না বাড়িতে, সেই যে বিয়ের ভোজ খেয়ে গিয়েছিল, তারপর আর প্রায় কারওরই পাত্তা নেই। এমনকি, অসীমও কখনো তাকে নিয়ে কোনো বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যায় না। না পেরে, একদিন সোজাসুজি জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিল। জবাবে হাসবে না কাঁদবে, বিস্মিত না রুষ্ট কোন্‌টা হবে বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকাটাই একমাত্র শিষ্টতা বলে মনে হয়েছিল তার। 'ছাড় তো ওদের কথা, বন্ধু না হাতি, বিয়ের পরে আবার বন্ধুত্ব কী? বিয়ের পর বন্ধুদের সঙ্গে মাখামাখি করা মানেই তো বউ পালানো।' প্রথমটা রক্ত উঠে গিয়েছিল মাথায়, অসীম কী তার স্বভাবচরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করছে, নাকি, তাকে অবিশ্বাস করছে? কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হল সে, কেননা, ততদিনে অসীমকে অনেকটাই চেনা হয়ে গেছে তার। অসীম তাকে কোনো অপমানই করছে না। শুধু তার চারপাশে এক অদৃশ্য লক্ষ্মণগণ্ডি এঁকে দিচ্ছে। মানুষটা ওরকমই। জীবনের সব সম্ভাব্যতা, সব সম্ভাবনার, সব আকস্মিকতার দ্বার বন্ধ করে একটানা, একঘেয়ে, এক অভ্যস্ততার মধ্যে জীবনকে না এনে ফেলতে পারলে সে ঠিক স্বস্তি পায় না। জীবনযাপন তার কাছে অভ্যাসযাপনেরই নামান্তর। রোমান্টিকতা তার কাছে হৃদয়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত, হৃদয় যে মিছিমিছি খরচ হতেই তৈরি থাকে সবসময়, একথা পৃথিবীর কোনো কবিই অসীমকে কখনো বোঝাতে পারবে না। তবু, অসীম যে কেন তার বিয়ের আগে তোলা ফটোটাকে এনলার্জ করে বাঁধিয়ে রাখল—তাকে তখন রহস্যকাহিনীর অংশ বলে মনে হলেও, আজ আর তেমনটা মনে হয় না। এতদিনের এই ছবি-বাঁধানোর নিজের মতো একটা ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে পেয়েও গেছে মধুমিতা।

বিয়ের রাত্তিরে, তার পাশে বসে, তার মুখ থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে ঘোমটা সরিয়ে, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল অসীম, ভরাট অনন্ত চোখে। যেন সে তখনই বুঝে নিতে চাইছে, তার সঙ্গিনী তার শ্মশানবান্ধবী হবে কি না। তারপর খুব সন্তর্পণে, বাক্স থেকে কাঁচের পুতুল বের করার মতন সাবধানে, পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে সে বের করে এনেছিল একটি ফটো, মধুমিতারই ফটো, যা তাদের পাঠাতে হয়েছিল অসীমের অনুরোধেই, বিয়ের আলাপ পাকা হবার আগে। বিয়ের আগে মধুমিতাকে, আশ্চর্য, অসীম কখনো চাক্ষুষ দেখতে চায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতন অভিনিবেশে হাতের চেটোয় ফটোটিকে নিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মধুমিতার

মুখের সঙ্গে মিলিয়ে নিল অসীম। যেন ফটোর আসলের সঙ্গে জীবন্ত নকলটিকে মিলিয়ে নিশ্চিন্ত হল যে তাকে ঠিক মালই সাপ্লাই করা হয়েছে। তারপর যাদুঘরের মমির বাতাসে-নড়ে-ওঠার মত অপ্রাকৃত গলায় আলতো উচ্চারণ করেছিল অসীম, এতদিনের মধ্যে একবারই এবং মধুমিতা জানে, অসীম আর কখনও তার সেই স্বর্ণোচ্চারণের পুনরুক্তি ঘটাবে না : 'তোমার চাইতে তোমার এই ফটো অনেক বেশি সুন্দর।'

এর কিছুদিন পরেই ওই ফটো এনলার্জড্ হল, বাঁধানো হল তাকে। যেন মৃত প্রতিচ্ছবি রক্তমাংসের জীবনের সামনে এসে দাঁড়াল অদৃশ্য এক মাপকাঠি হয়ে। যেন প্রতিচ্ছবির হাতে তুলে দেওয়া হল অদৃশ্য এক দাঁড়িপাল্লা জীবনকে যাচাই করার জন্য।

মধুমিতা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার ভাবনা একটানা বয়েই যেতে লাগল স্রোতের মতন। খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করল ব্যালকনিতে, ঘরের ভেতর এল, জল খেল, আবার বাইরে গেল। কিন্তু ঘুম আব এল না তার। বারবার মনে হল, ঘুমিয়ে পড়লে আবার যদি ঐ স্বপ্নটা তাড়া করে তাকে? ভূতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল অনেক রাত্তির অব্দি বারান্দায়, আর মনের গভীর থেকে কেবলই টুকরো টুকরো বেজেই চলল গানেব কলিরা :

বরষে বাদরিয়া শাওন কি
শাওন কি মন ভাবন কি
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
আনন্দ মঙ্গল গাবন কি ...

পরের দিন অসীম অফিস যাবার সময়, খোঁপা খোলার মতো একটানে, অতর্কিতে প্রসঙ্গটা পাড়ল মধুমিতা। 'শোনো, তোমাদের ওই কী যেন বলে, গান্ধীবাগের ওখানে একটা গানের স্কুল আছে না?' জুতোর ফিতে বাঁধছিল অসীম। মুখ না তুলেই বলল, 'হ্যাঁ, কেন? গানের স্কুল দিয়ে কী হবে?'

—আমি ভর্তি হব।

—অ্যাঁ!' বিস্ময়ে সোজা হয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মধুমিতার দিকে তাকাল অসীম।

—ভর্তি হবে? ওইসব গানটান শিখবে তুমি?

—মানে? গান কি মানুষ শেখে না? রিসার্চ তো হল না, আর হবেও না। গানটাই শিখি। একা একা ঘরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—কেন, ঘরে তো করার অনেক কিছু আছে। ডাইনিং চেয়ারগুলোর কভার তো এতদিন ধরে বলেও শেষ করছ না।

কী কথার জবাবে কী কথা! আর কিছু না বলে, একটু আগে সিগারেট-ধরানোর সময় ফেলা দেশলাই কাঠিটিকে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে অসীম উঠে দাঁড়াল। আর, বিয়ের পর এই প্রথম অফিস যাবার আগে মৌকে আদর করতে ভুল হল তার।

মধুমিতা বসে রইল দাঁতে দাঁত চেপে। রাতে ঘুম হয়নি, মাথাটা কামড়াচ্ছে। কপালে ঘামের আলপনা। দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানার ওপর বসে রইল, বসেই রইল। একটা কাক ডাকছে, দূরে। এসময়, এ-পাড়ায় ফেরিওয়ালারা তাদের উদাসী স্বরে বেলাকে আরও দীর্ঘ করে দিয়ে চলে যায়। কোথাও যেন একটা তেহাই বেজে বেজে কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। তীব্র মা'র একটা টান একটু যেন ক্রোধ প্রকাশ করে নিষাদের আক্রোশে ডুবে গেল। মধুমিতা উঠে দাঁড়াল। একটু সময় উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর, কী ভেবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিজের ফটোর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। পগ ঘুংগুরু বাঁধ মীরা নাচে রে। ছোট্ট একটা কলি মনের তোলা-জলে একটু ভেসে উঠে আবার ডুবে গেল। ফটোটা হাতে নিল, কী যেন ভাবল, ভাবল, একটা মুহূর্ত তৈরি করে নিল। আচ্ছা ধর ধর, আজ স্বপ্নে আমার গলা লক্ষ্য করে একটা দড়ি এগিয়ে এল, আমি কী করব? আমি কী পরব? ফাঁস? দড়ি বলল, 'এসো।' গলা বলল, 'না, যাব না, তুই আমার কে?' দড়ি বলল, 'আমি তোর সব, তোর মুক্তি।' গলা এগিয়ে এল দড়িটির দিকে। কাছে, আরও কাছে। সঙ্গমে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে দুটি মানুষ যেমন পরস্পরের কাছে আসে, তেমনি। ঘন হল শ্বাস। অধীর ফাঁস। সহসা, সমস্ত নিবিড়তাকে ভেঙেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে খুব কাছে কোথাও, তীব্র বেজে উঠল গান।

দুখ অবসান কষ্ট সব সহিয়া কুটিল জগত কী বাসী। আর, সেই গান শুনে যেন কেউ মরার কথা ভুলে গেল। ধ্যাৎ, কী ভাবছে সে এসব এতক্ষণ ধরে? ফটোটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। তোর আর আমার বেসিক ডিফারেন্সটা কী জানিস তো? তোর সামনে অনন্ত সম্ভাবনা ছিল, আর আমার সামনে এখন একটা দেয়াল। তোকে আমি ভুলে যেতে চাই। সম্ভাবনা নয়, সম্ভাবনাও একটা মোহ, একটা ছল। আমার চাই একটা পথ—টানা, একঘেয়ে, একলা, ধুলিধূসর, তা হোক, তবু একটা পথ। ছবি বলল, 'তুমি সাজো।' মন বলল, 'না, আমি বাজব।' ছবি বলল, 'এই তো আমি, আমি তোমার পথ।' মন বলল, 'আমার মরণসখা কই?' ছবিটাকে জোরে ছুঁড়ে দিল মধুমিতা, মেঝেয়। এমনি এমনি; অন্যমনস্কভাবে, আচ্ছন্নতায়। যেন কেউ গলায় ফাঁস পরার মুহূর্তে, হাতে-ধরা আয়নাটিকেই ফাঁসে লটকে দিল। ঝনঝন শব্দে মধুমিতার তন্দ্রা কিংবা ধন্দ ভেঙে গেল। আর প্রবল এক হিংস্রতা গ্রাস করে নিল তাকে। কী এক কোলাহল বেজে উঠল তার সর্বাঙ্গে। ফটোটা তুলে আনল মেঝে থেকে, ভাঙা কাঁচের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে শরীরের চামড়া তুলে আনার মতো তর্জনী ও বৃদ্ধার নখ জড়ো করে, আপ্রাণ চেষ্টায়, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, ফটোর খানিকটা তুলে আনল, তুলে আনল নিজেরই কোন সে বিস্মৃত অতীতের খানিকটা হাসি, খানিকটা লাস্য। কুচি কুচি করে ছিঁড়ল তা, ছেঁড়া টুকরোগুলি ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়।

তারপর বহুদিনের ধূলিপড়া তানপুরার ঢাকনি অবাক হয়ে, চমকে উঠে, বুঝল তাকে টেনে নিচ্ছে বুকে কারও জ্বরগ্রস্ত হাত। একটু পরে এই মফস্বলিপাড়ার কৌতূহলপরায়ণতা এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানালা দরজায় উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল, 'আরে দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ, ঐ

তো দেখা যাচ্ছে গো, ও বাড়ির বউটা গান গাইছে, ওমা! গান জানে? এতদিন শুনিনি তো? যা বাবা। ওরকম পাগলা মতন চুল, বন্ধ চোখ, জল পড়ছে, ক্ষেপেটেপে গেল না তো হঠাৎ?' ঋতুর এসময়, প্রহরের এই ক্ষণে, রোজই একটুখানি রোদ্দুর ঘরের মেঝেয় এসে পড়ে, দরজা দিয়ে, আজ সেই রোদ্দুরও যেন ভয়ঙ্কর কৌতূহলী পায়ে এল ঘরে, বসল, অবাক হয়ে গান শুনতে শুনতে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। মধুমিতা তখন গাইছে :

বিষ কি প্যালা রাণাজীনে ভেজা
পিবত মীরা হাসি রে
পগ ঘুংগুর বাঁধ মীরা নাচে রে

সেই গান শুনতে শুনতে রোদ্দুর কখন যেন কোমল হয়ে এল, শান্ত হয়ে এল, মৃদু হয়ে এল। আস্তে আস্তে দুপুর পেরিয়ে বিকেলের কোলে ঢলে পড়ল সে। শুধু অপেক্ষা রেখে গেল এক নবজাতা গায়িকার মনে, সিঁড়ি বেয়ে ঠকঠক শব্দে উঠে-আসা একজোড়া পায়ের সামনাসামনি হবার।

অমিতাভ দেব চৌধুরী

হাওয়াই আড্ডা

(উৎসর্গ : ইরাণী চিত্রপরিচালক মজিদ মজিদি'কে)

এক.

সকালের দিকে সবকিছু চুপচাপ। দুপুর হলেই পুরো চত্বরটা যেন নতুন করে জেগে ওঠে। ট্যাক্সিওয়ালারা প্যাসেঞ্জার নিয়ে শিলচর থেকে উঠে আসে। এসে আবার ইম্ফলের নয়তো কলকাতার নয়তো গৌহাটির প্যাসেঞ্জার নিয়ে শিলচর যাবার জন্য উসখুসে চাঞ্চল্যসমেত অপেক্ষা করে বসে থাকে। তারপর রোদ্দুরের ওমে তেতে থাকা আকাশের একটা কোণায় আকস্মিকভাবে, একেবারে হঠাৎ শব্দটা জন্ম নেয়। কেমন গুড় গুড় একটা আওয়াজ। মেঘ ডাকার মতো। কিন্তু ঠিক মেঘ নয়। অন্যরকমের কিছু। যেন ধাতব মেঘের মতো। শব্দটা আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলতে থাকে পুরোটা চত্বরকে। তারপর হঠাৎই আকাশের একটা দিক থেকে নেমে আসে সে। ধাতুর পাখি। নেমে আসে পাক খায় নেমে আসে। এই সময়টায় দীনবন্ধুর চোখে যেন পলক পড়ে না। সে দেখে, অল্প একটু গেঁড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তিন চাকার ওই পাখি। ডাকোটা' নামটা কোথা থেকে, যেন এমনি এমনিই, ঢুকে পড়েছে কখন তার মাথায়। সে জানে, ওই ডাকোটা প্লেন থেকে এক্ষুণি নেমে আসবে কয়েকজন সুন্দর সুবেশ মানুষ আর মানুষী, সঙ্গে শিশু। তারা নেমে এদিকেই আসবে। ব্যাগ-প্যাঁটরা আসবে একটু পরেই ডাকোটা থেকে তাদের পেছন পেছন। সেই ব্যাগ-প্যাঁটরা হাতে নিয়ে তারা এয়ারপোর্টের বাইরে এসে ডাকবে, 'ট্যাক্সি'। ওদিকে আরেক দল যাত্রী তখন আস্তে আস্তে গিয়ে উঠবে ওই ডাকোটারই পেটে। মস্ত বড় পিচ করা রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। মূল প্রবেশদ্বারের বেশ খানিকটা দূরে সিক্যুরিটি স্টাফের সঙ্গে গল্প করতে করতে ওই রাস্তাটা

স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে সেই পাখি রাস্তাটার ওপর। ওই তো দরজা বন্ধ হল পাখির পেটের। ওই তো এবারে শব্দ হতে শুরু হল। পাখা ঘুরতে শুরু করল। জোর শব্দ। এই পাখাকে প্রপেলার বলে। সে সিক্যুরিটি স্টাফের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। ওই তো দৌড়োতে শুরু করল পাখি। দৌড় দৌড়। কী ভয়ঙ্কর দৌড়। ওই ওই ওই তো উঠে গেল আকাশে। এখনও সোজা হয়নি। কিন্তু তাও দ্রুত মিলিয়ে গেল নিঃসীম শূন্যতায়।

দীনবন্ধুর গায়ে কাঁটা দেয়। উফ্, কবে যে নিজেও অমন একটা ডাকোটার পেটে গিয়ে ঢুকতে পারবে। কবে কবে—ভাবতে ভাবতে শরীরে রোমাঞ্চ আসে তার। এয়ারপোর্টের পাশের গেটটা থেকে সরে আসতে আসতে নিজেকে যেন স্বপ্নচারীর মতো লাগে। অশরীরীর মতো মনে হয় নিজেকে। আজ সোমবার। উধারবন্দে বাজারবার। আজকের বাজারে তার পসরার সম্বল বারোমাসি কাঁচালঙ্কা, বাড়ির পেছনের গাছ থেকে লক্ষ্মীর নিজের হাতে পেড়ে দেওয়া। আর কিছু ফুলকপি। এও তাদের বাগানেরই। বাড়িরই সব্জি সব। বাঁধাকপি আর ওলকপিও নিয়ে আসবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর মতে ওগুলো আগামী শুক্রবারের হাটে নিয়ে গেলে সেগুলোকে ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। সবকিছুরই একটা সময় আছে, সময়ের আগে কিছুই হয় না। এমনকি, সব্জিও না। লক্ষ্মী এ-কথাটা সব সময় বলে।

সোম আর শুক্র—এই দু'দিন বাসে করে গিয়ে বাজার ধরতে প্রতি সপ্তাহেই দেরী হয়ে যায় তার। মনে হয়, কেবলই মনে হয়. নাঃ, কলকাতার প্লেনটা ইম্ফল হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে চলে যাক---ওই ধাতব পাখির আসা-যাওয়ার শেষটুকু পর্যন্ত না-দেখা অবধি যেন তার নিস্তার নেই। হাটবারে হাট বসে যাওয়ার পর সে কারণেই পৌঁছতে পৌঁছতে ঘন্টা-দেড়েক দেরী হয়ে যায় তার।

আজ হাটবারে এসে নিজের নির্দিষ্ট চালায় বসতে না বসতেই চমকে উঠল দীনবন্ধু। আরে, এই লোকটা আজ কলকাতার প্লেন থেকে নেমেছে না? এরই মধ্যে বাজার করতে বেরিয়ে পড়েছে?

—কিতা বা, লংকার ভাগা কত?

—একটাকা আইজ্ঞা।

বলেই, দীনবন্ধু নিশ্চিত হয় লোকটি এখানকারই কেউ। স্পষ্ট সিলেটি বলছে যখন, কলকাতার কেউ তো নয়ই, হাঁটা-চলার, দাঁড়িয়ে পড়ার ধরণে এই বাজার তার এতো পরিচিত বলে মনে হচ্ছে যে লোকটি এখানকার না-হয়ে যায় না।

—কিতা তরণীবাবু, কইলকাত্তা তাকি আইজউ আইলানি?

—অয়। অউতো অল্প কিছু আগে। ফ্লাইট আইজ লেইট আছিল।

—লেইট আছিল? তে অতগু যে টাকা নেই বা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে—আপনারারে খাওয়াইন-উয়াইননি?

—আর কইন না যে, ভাড়া বাড়ি গিয়া তো অখন ৬২ টাকা হইছে। হি তুলনায় খাওয়া আর কিতা। নাম মাত্র বা।

আরেকজন ভ্রাম্যমান ক্রেতার সঙ্গে গল্প করতে করতে কাঁচালঙ্কা বাছবার জন্য লোকটি ঝুঁকে আসে দীনবন্ধুর পসরার দিকে। মুহূর্ত মাত্র। তবু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই দীনবন্ধু যেন লোকটির গায়ে প্লেনের ভেতরের গন্ধটা টের পেয়ে যায়। এই গন্ধটা সে প্লেনের প্যাসেঞ্জার সবারই গায়ে পায়। মনে হয় গন্ধটাকে যেন মেঘের দেশের খবর, ভেজা ভেজা রোদ্দুর, না-হওয়া বৃষ্টি, মন খারাপ করা বিকেলবেলার আলো—সবকিছু মিশিয়ে কেউ আকাশপুরেই তৈরী করে দিয়েছে। দীনবন্ধু প্রতিদিন তৃষিত হয়ে থাকে ফ্লাইট আসার সময়টায়। একে একে যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। তাদের যতদূর সম্ভব কাছে আসার চেষ্টায় উদগ্র হয়ে থাকে সে। গন্ধটা। ওই গন্ধটা যদি একটু পাওয়া যায়। গন্ধটা, দীনবন্ধু জানে, মাটির ধুলো-বালি, বাতাস, ব্যস্ততা, হইচই-র মধ্যে বেশিক্ষণ টিঁকে থাকে না। একটু পরেই যাত্রীদের শরীর থেকে মিলিয়ে যায়। এ ব্যাপারটা সে পরীক্ষা করে দেখেছে। দেখেছে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলেই ট্যাক্সির পেট্রোল কিংবা ডিজেলের গন্ধ গ্রাস করে নিচ্ছে যাত্রীদের গায়ে লেগে থাকা আকাশের গন্ধকে। পরীক্ষা করার জন্য তার চেনা-জানা দু'তিন জন ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশের সিটে প্লেনের যাত্রীরা ওঠার সময় সে বসেও থেকেছিল কয়েকদিন।

আজ রাতে কীর্তনের কোনও আসব নেই। কোনও গৃহসঞ্চার কিংবা শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ নেই আজ কোথাও। সেগুলো থাকলে, দীনবন্ধুকে কীর্তনের দলের সঙ্গে আশে-পাশে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেতে হয়। খোলটা ভালোই বাজাতে শিখেছিল সে এককালে। কীর্তনের গলাটাও বেশ ভালো তাঁর, আকাশছোঁয়া। কীর্তন গেয়ে পয়সা না পেলেও, আনন্দ পায় খুব। তুই আমারে পাগল করলি রে, অনাথের নাথ গৌরারে। না-আ- অ-থ—বলে গলাটা তুলতে তুলতে অনেকদিনই মনে হয়েছে : এই গৌরা কে? নদীয়ার নিমাই? নাকি বিকেলের আকাশের প্রসন্ন রোদ্দুর? যাকে ওই প্লেনের যাত্রীরা ছোট্ট ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে চলে আসে আকাশ থেকে?

বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতেই টের পায় ছেলে পড়ছে : 'মাই এইম ইন লাইফ ইজ টু বি এ ডক্টর।' দীনবন্ধু ঘরে ঢুকে খেঁকিয়ে : 'স্যারে লেখাইয়া দিছইন করিয়া সারা ক্লাসর হক্কলে ডাক্তার অইব নি রে?' ছেলে অম্লানবদনে বলে, 'অয়।' দীনবন্ধু বলে, 'অয়? মানে কিতা? হক্কলে ডাক্তার? এর থাকিয়া তুই তো বাবা লেখতে পারছ যে তুই বড় অইয়া প্লেইনোর প্যাসেঞ্জার অইতে চাস।'

—প্যাসেঞ্জার? প্যাসেঞ্জারে কিতা টাকা পায় নি বাবা?

—কেনে, টেকা পাওয়া-পাওয়ির কথা আয় কেনে?

—এ রাম ইটাও জান না বাবা, এইম মানে তো চাকরি। মানে যেটা করলে তুমি টাকা পাইবায়। আমি বরং লেখি দেই বড় অইয়া আমি প্লেইনঅর পাইলট অইমু। আইচ্ছা, পাইলটে

তো টেকা পায়, না বাবা?

দীনবন্ধু কিছু বলে না। ছেলে আবার পড়তে লেগে যায়। আই ওয়ান্ট টু সার্ভ মাই কানট্রি হোয়েন শি ইজ ইল। দীনবন্ধু ঘরে ঢোকে। লক্ষ্মী নেই। এবারে মোলায়েম করে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে সে, 'তোর মা কই রে দয়াল?'

দয়ালবন্ধু প্রথমে শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখায়। দীনবন্ধু আবার প্রশ্নটা করে, আরেকটু জোরে। দয়াল বলে, 'মা তো সনাতনদাদুর বাড়িত গেছইন। মিনুমাসির লগে কিতা কাম আছে তান।'

—কাম আছে? ওঃ বাঁচা গেল।' কাম মানে তো গল্প। প্রতিদিনের কিংবা দু'তিন দিনের জমানো গল্প। ওই অভিজ্ঞতা মিনুকে উগরে দিতে না পারলে লক্ষ্মীর নিস্তার নেই। দীনবন্ধু নিশ্চিন্ত হয়। ছেলে পড়ছে। এই তো সময়। এই তো সময় লক্ষ্মীর কুলুঙ্গির নীচে ভেঙে-পড়তে-থাকা দেওয়ালের ইটের কোটরে লুকিয়ে রাখা তার বটুয়া খুলে দেখে নেবে, কত টাকা জমেছে। এই টাকা তার স্বপ্নের টাকা। এই টাকা সে জমিয়ে আসছে দু'বছর ধরে। দেশভাগের পর যখন এদিকে এসে লক্ষ্মীর বাঁচানো গয়না বেচে এয়ারপোর্টের উল্টোদিকের এই জমিটা দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়র বদান্যতায় কিনতে পারল সে, যখন একটু থিতু হয়ে সব্জির কারবার শুরু করল, যখন আরেকটু থিতু হয়ে প্লেন দেখতে শুরু করল, তখন থেকে জমাতে শুরু করল এই টাকা। এই আনা আর নয়া পয়সাগুলি। একদিন অন্তত একটিবারের জন্য প্লেনে উঠতে চায় দীনবন্ধু। জীবনে একবার প্লেনে চড়তে চায় সে। ওই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই টাকা জমানো সেই লক্ষ্যপূরণের একমাত্র উপায়। তাই টাকা জমায় সে। আজও বটুয়া খুলে একআনা একআনা করে এক নয়া পয়সা, পাঁচ নয়া পয়সা করে গুনে দেখল। তার সাকুল্যে সঞ্চিত ধন মাত্রই আঠাশ টাকা। দুঃখ হল তার। প্রথমে। কিন্তু তারপর আশাও হল। আঠাশ টাকা? আর তো মাত্র কিছু টাকা। তারপরই তো বাষট্টিটা টাকা। সেই কল্পিত টিকিটের মূল্য। তারপর? তারপর? ভাবতে ভাবতে গায়ে কাঁটা দিল তার।

দুই.

প্রায় আড়াই বছর পরের কথা। ডাকোটা এখন আর চলে না। নতুন প্লেন চলে এসেছে। তার নাম ফকার ফ্রেণ্ডশিপ। ভাড়ার টাকাও বেড়ে গেছে অনেকটা। বাষট্টি নয়। এখন শিলচর টু কলকাতা ভাড়া দুশো টাকার ওপর। এরমধ্যে দীনবন্ধু আরেকটু বুড়ো হয়েছে। তার সব্জির কারবার লক্ষ্মীর হাতের গুণে আরেকটু বেড়েছে। তার ছেলে আরও বড় ক্লাসে উঠেছে। এখন সে প্রতিদিন সকালে উঠে পড়ে : 'অ্যান এইমলেস ম্যান ইজ লাইক এ শিপ উইদআউট এ রাডার।' ইতিমধ্যে কালবৈশাখীর ঝড়ে একটা প্লেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আছড়ে পড়েছে। মারা গেছে যাত্রীরা সবাই। দীনবন্ধুর স্বপ্ন কিন্তু আজও মরেনি। একদিন লক্ষ্মী ও

দয়ালের অনুপস্থিতিতে অনেকক্ষণ ধরে জমানো টাকার বটুয়াটা খুলে গুনল সে। মার বারো টাকা জমতে বাকি। তারপরেই। তারপরই কী? তারপরই সে পৃথিবীর নতুন সম্রাট হতে চলেছে।

হিসেব করে ঠিক দু'মাসের মাথায় বটুয়াটা আবার খুলল সে। দুশো বত্রিশ টাকা। সেদিনও লক্ষ্মী বাড়িতে নেই। দীনবন্ধুর ইচ্ছে হল অনেকক্ষণ ধামাইল নাচে। লক্ষ্মী আর দয়াল যখন বাড়িতে ফিরল, তারা দেখল, দীনবন্ধু চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণে স্বর্গের উৎসবের মতো জেগে আছে একটুকরো হাসির ইশারা।

দীনবন্ধু দেখছিল আকাশে সাদা মেঘ আর কালো মেঘের যুদ্ধ চলছে। আর সে, প্লেনের ভেতর থেকে সাদা মেঘের দলকে বর্শা-বল্লম যুগিয়ে চলেছে। কালো মেঘেরা আস্তে আস্তে হেরে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে যুদ্ধং দেহি ভাব ছেড়ে সন্ধিপ্রস্তাবের দিকে এগিয়ে আসছে, আস্তে আস্তে তাদের মাথা নুয়ে পড়ছে। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ জেতা খুবই অসম্ভব বুঝতে পেরে নেমে যাচ্ছে নীচে। ওই তো তাদেরই কেউ কেউ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে। আর দয়াল? ওমা, দয়াল যে অনেক নীচে। ছবির মতো একটা ঘরের দাওয়ায়। সেই দাওয়ায় বসে দয়াল বৃষ্টি শিকার করছে। তার হাতে একটা বঁড়শি। সেই বঁড়শিতে টোপ হিসেবে সে বেঁধে রেখেছে লাল টুকটুকে একটা কাঁচালঙ্কা।

তিন.

পরের দিন সকাল সকাল শিলচর চলে গেল দীনবন্ধু। আসলে এয়ারপোর্টের কাউন্টার থেকে টিকিট কিনতে লজ্জা লাগছিল তার। এতদিনের চেনা-জানা চক্রবর্তীবাবু তার নামে টিকিট কাটতে গিয়ে যদি পাঁচকথা জিজ্ঞেস করে বসেন? যদি সেই পাঁচকথা পাঁচকানে চলে যায়? যদি ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন? নাঃ, তার চেয়ে অচেনা-অজানা শিলচর এয়ারলাইন্স অফিস থেকে টিকিট কিনে আনলেই ভালো।

সন্ধেয় কীর্তনের দলের একটা জমায়েত ছিল পাঁচুর চায়ের দোকানে। জমায়েত মানে আড্ডা আর কী। সাথে সারা মাসের আয়-ব্যয়ের একটা হিসেব-নিকেশও করা হয় এরকম মাসিক জমায়েতে। সেই জমায়েতে কথাটা সবাইকে না-জানিয়ে পারল না দীনবন্ধু। সবাই প্রথমে হতভম্ব, তারপর অবাক, তারপর হাসি-খুশি, তারপর ফেটে পড়ল। খাওয়াও খাওয়াও দীনুদা, এই খবর মিষ্টিমুখ না করাইলে খুড়ার তো আরও গচ্চা যাইব। বরং এক কাম করো, খুড়ায় বরং তুমরা কেউর বাড়িত লুট দিলাউক্কা। লুটর প্রসাদ কলা-বাতাসা। ইতাউ তো মিষ্টিমুখ, না-কিতা? সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল। একটু পরে উদাসীন ও মিতবাক হরিশ উঠে বলল, খুড়া যাইতায় তো? গিয়া কই উঠবায়? কই থাকবায়, ঠিক করছ নি?

আরে! এসব কথা তো দীনবন্ধুর মাথায় কখনও আসেনি? অদম্য হরিশ থামল না। আবার

বলল, আর ফিরা? ফিরবায় কিলা: খুড়ার তোমার ফিরার টিকেট করা অই গেছেনি বা?

দীনবন্ধুর মাথায় প্লেন ভেঙে পড়ল। সত্যিই তো! একথাটা তো এত বছরের মধ্যে একটি ক্ষণের জন্যও তার মাথায় আসেনি। আসলে, সে তো সবকিছুকেই ওড়ার নিরিখে দেখেছে—যাওয়া কিংবা আসার, মানে ফেরার নিরিখে তো কিছুই দেখেনি। সে কেবল উড়তে চেয়েছিল। অন্য কোনও কিছু কথা কখনও ভাবেনি। স্বপ্নেরও যে একটা বাস্তব ভিত্তি থাকতে হয়—কিংবা স্বপ্ন সফল হলে তাও যে একটা বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই সফল হয়—এসব কথা সে কখনও ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি। অসহায় লাগল তার নিজেকে। আর তাকে নিরুত্তর দেখে হরিশই বলল, যাও বা। কী লাখান মানুষবা তুমি খুড়া? খুড়ি আর পুলা অগুরে ফালাইয়া কই উড়ি যাইতায় চাও? ইতা অইতো না। যাও। কালকেউ টিকেট অগু ক্যান্সেল করাই গিয়া। বিশদিন পরর টিকেট তো। অখন ক্যান্সেল করাইলে পুরা টাকাউ প্রায় ফিরত পাইলাইবায়।

চার.

পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেশ একটু দেরী হল তার। আসলে আগের রাতে ঘুম প্রায় হয়ই নি। কেবল ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছিল সে। শেষরাতের দিকে নির্ঘুম চোখে ঘুমের আশীর্বাদ নেমে এসেছিল। আর তারই জের কাটতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল।

উঠেই দেখল লক্ষ্মী রেগে আগুন হয়ে আছে। একটু একটু করে বুঝতে পারল সে। শুভানুধ্যায়ী হরিশ শুধু তাকে বুঝিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, লক্ষ্মীর কানেও সাতসকালে এসে সব খবর সাপ্লাই করে গেছে। নাহলে এই খবর দিব্যি তার একার বয়ে নিয়ে চলা স্বপ্নের মতো হয়ে থাকত।

কিন্তু হরিশ মারফৎ তার স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে লক্ষ্মী এখন নিজেকেই বঞ্চিতা বলে ভাবছে। সে দীনবন্ধুকে শাসিয়েই চলছে, কীভাবে দীনবন্ধু নিজের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে লক্ষ্মীর এবং দয়ালের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলল। কীভাবে ওই কটা টাকা পেলে লক্ষ্মীর শাড়ি, দয়ালের বাইরে যাওয়ার জামা-প্যান্ট, রান্নাঘরে খাবারের বেড়াল-তাড়ানো আলমারি ইত্যাদি ইত্যাদি এমনকি তার নাকছাবিও হয়ে যেত। কীভাবে তাদের জীবন ওই ক'টা টাকায় আরেকটু মসৃণ হত তারই ফিরিস্তি শোনাতে লাগল লক্ষ্মী তাকে। আর শুধু কি তাই? যে টিকিট সে কেটেছিল তা তো তাকে পৌঁছে দিত অকূলে; মানে, না-ফেরার গন্তব্যে। কিংবা অন্য কোনও লক্ষ্মীর কূলে। এমন আত্মসর্বস্ব পুরুষকে এখন থেকে কী করে আর বিশ্বাস করবে লক্ষ্মী?

পাঁচ.

সে দিনই হল না অবশ্য। তবে তিনদিনের মধ্যেই সব জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এল দীনবন্ধু। সঙ্গে কিনে আনল নাটাই আর মাঞ্জা-দেওয়া সুতো সহ একটা ঘুড়ি। বলল, ওটা তার নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস। পরের দিন থেকে দয়ালকে নিয়ে বিকেলবেলা পেছনের মাঠে চলে আসতে লাগল দীনবন্ধু। না, প্লেন দেখার শখ তার কখনও হয়নি। ছেলেকে ঘুড়ি ওড়ানো শেখাতে শেখাতে হাবিজাবি কতকিছু বলে যেত সে। সবই পুরনো কথা। সবই ওপার বাংলার জীবনবৃত্তান্ত। বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। ছেলেও কিছু শুনে, আর বেশিরভাগটাই না-শুনে ক্লান্ত হত। শেষ সূর্য ঘরে ফেরার সময়কে জাগিয়ে তুলত আকাশের গায়ে। আর মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতো দিয়ে কী করে প্যাঁচ খেলিয়ে অন্যদের ঘুড়িকে কাটতে হয়—এর শিক্ষা পরবর্তী দিনের জন্য মুলতুবি রেখে বাপ-ছেলে ফিরে আসত ঘরে।

এরপর আর বেশিদিন বাঁচেনি দীনবন্ধু। জীবনীশক্তিই কেমন যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল লোকটার। ওই এক ঘুড়ি ওড়ানো—এছাড়া আর কোনও কিছু সে খুব মন দিয়ে করত বলে মনে হয় না। কীর্তন-টির্তন গাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল সে।

সে মারা যাওয়ার পর, শ্রাদ্ধ-শান্তির পাট চুকে গেলে, একদিন দয়াল খাটের তলা থেকে দীনবন্ধুর যত্ন করে রাখা, তালা দেওয়া, 'সুখে থাকো' আঁকা টিনের বাক্স বের করল। এই বাক্স জীবদ্দশায় কাউকেই ধরতে দেয়নি দীনবন্ধু। তালা ভেঙে খানদু'য়েক ধুতি, হাতে লেখা মনসার পুঁথি, কবেকার ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া চিঠিপত্র খুঁজে পেল দয়াল। বাক্সের সব জিনিস মাটিতে নামিয়ে, সেগুলো উল্টে-পাল্টে হঠাৎ একটা জিনিস একটু অন্য রকমের বলে মনে হল তার। অত পুরনোর মধ্যে হঠাৎ যেন একটুখানি নতুন। হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে চমকে উঠল দয়াল। এ তো সেই টিকিট, সেই প্লেনের টিকিট। যা ক্যান্সেল করিয়ে এসেছে বলে সবাইকে জানিয়েছিল দীনবন্ধু।

দয়ালের মনটা এই প্রথম বাপের জন্যে কেমন যেন হায়-হায় করে উঠল।

ছয়.

সেই মাঞ্জা দেওয়া সুতো-হারানো নাটাই মুখ লুকিয়ে পড়েছিল বাঁশের মাচানের এক কোণায়। দয়াল খুঁজেপেতে এনে তার কলি ফেরাল। মা'র কাছে আব্দার করে এক টাকাও যোগাড় করল। কিনে আনল ঘুড়ি। আর ঘুড়ির সুতো।

দয়াল জানে, আজ যখন বিকেলে ঘুড়ি ওড়াতে পেছনের মাঠে যাবে সে, তখন মাথার উপর আস্ত একটা আকাশ ঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে তারহাতের নাটাইয়ের সুতোয় নেচে উঠবে!

তার বাবা তাকে কিছু দিয়ে যায়নি। শুধু মাথার ওপারের অতবড় একটা আকাশের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে। এই অধিকার একটা ঘুড়ি দিয়েই অর্জন করে নেওয়া যায়।

সুব্রত কুমার রায়

শিকার-কাহিনী

'হাউ মন্বন্তরোর বছ্ছর .. ...'

গাছটা আবার কথা বলতে শুরু করেছে।

দড়ি পাকানো পেশী, খড়ি-ওঠা খরখরে চামড়া, কোটরে ঢোকা দু'টো অন্ধ চোখ আর জটাঝুরি ভর্তি মাথাটা নিয়ে তরাইকান্দির সমবয়েসী বটগাছটা এতদিন পর আবার গল্প বলতে শুরু করেছে।

রোজ বিকেলে যেমন বসেন তেমনই সেদিন বসেছিলেন তারা। দুপুর যখন ভাতঘুমের পর বিকেলের দিকে গড়াতে থাকে তখনই গার্ডেন চেয়ার পেতে দেওয়া হয় তরাইকান্দির মুরুব্বি তরণীকান্তের জন্য। তরণীকান্ত আসার আগেই সবাই একে একে আসতে থাকেন। কুড়িবয়সের ছেলে-ছোকরা থেকে যার বয়সের গাছপাথর নেই, ভূশণ্ডি কাক থেকে আউয়া কাউয়া সবাই একে একে ভিড় জমায় এই আড্ডায়।

শিকারের গল্প তুলেছিলেন পাঁচুগোপাল।

পাঁচুর মতো শিকারী নাকি তরাইকান্দিতে আর দু'টি আসেনি।

হারুবাবুর বাড়ির সামনে বাঁধা যে সম্বর হরিণটা দেখা যায় সেটি সে-ই ধরে এনেছিল। যদিও পাঁচুগোপালের শিকারের কাহিনীর মতোই হরিণটাও বুড়িয়ে গেছে।

মার্বেল ছেড়ে গুল্‌তি ধরতে না ধরতেই পাঁচুর কথা ছড়িয়ে গিয়েছিল সমস্ত তরাইকান্দিতে। সেই গুলাইল দিয়ে অনেক বগুড়া আর ডাউক মারার গল্প এখনও লোকের মুখে মুখে ঘোরে। গুলাইলটা (যাকে তরাইকান্দির সবাই বলত পাঁচুগোপালের গাণ্ডীব) এই সেদিনও পাঁচুগোপাল দারুণ আগ্রহ নিয়ে পর্যটকদের দেখাতেন। হাঁড়িকাঠের মতো দেখতে সপ্‌রি গাছের ডালটার

গায়ে বাঁধা রাবারের বেল্টটা টেনে নিজের অতীতে মাঝে মাঝে ফিরে যেতেন পাঁচুগোপাল। অদ্ভুত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন তারা, পাঁচু, শুক্কুর, মন্টা এবং হরি।

ঘাড়মুড়া, চেরাগী, চাঁন্দখিরা, পিয়ালীবাগ—যেখানেই যেতেন মুদরা, পরগুমা বা হরিণের অভাব হত না।

ছয়বোরের দু'নলা বন্দুকটা হাত বদল হতে হতে অবশেষে পাঁচুগোপালের হাতে কীভাবে পৌঁছেছিল তা এক রহস্য বিশেষ। আজও মাঝে মাঝে বন্দুকের নলে নাক লাগিয়ে রহস্যের ধোঁয়ায় আর কার্তুজের গন্ধের আঁধারে পাঁচুগোপাল পুরো ইতিহাসটা দেখতে পান।

পুলটা বাঁধার পর থেকেই সব ঘটতে শুরু হয়েছিল। তরাইকান্দি যেন রাতারাতি বদলে গিয়েছিল তারপরই।

মাথায় ছাতার মতো দেখতে সোলার টুপি, পায়ে অদ্ভুত চামড়ার জুতো (পাঁচুগোপাল যার নাম পরে জেনেছিলেন হান্টার বুট), গায়ে খাকী শার্ট, সাপের ছালের কোমরবন্ধ আঁটা হাফপ্যান্ট আর মুখে বিচিত্র সব গল্প নিয়ে যেদিন হরিপদ (আদর করে যাকে নাকি সাহেবরা ডাকত হ্যারী) ফিরে এসেছিল পুষ্করায় ধরা তার গ্রামের বাড়িতে, সেদিন সবাই বলেছিল, 'হরি মরতো আইয়ে'।

তা হরির যে মরার কথা তা আর না বললেও চলত।

হরির বংশে বাতি দেবার লোকও থাকত না, যদি না হরি, তার মা আর হরির ছোট বোন বেণু বাড়ি ছেড়ে দেশত্যাগী হত।

হরির জ্যাঠামশাই মরে যে পুষ্করা হবেন তা যেন তরাইকান্দির সবারই জানা ছিল। শ্যামাপদ দাস মারা যাবার কিছুদিন আগেও লাঠি ঠুকে ঠুকে ঝড়ের রাতে আমবাগান থেকে আম কুড়িয়ে আনতে ছুটতেন। বুড়োর হাঁপানির টান উঠলে সেই ঘড় ঘড় শব্দে পাঁচবাড়ির মানুষও ঘুম থেকে জেগে উঠত। আর বুড়ো সেই হাপরের মত শব্দ নিয়েই ছুটতেন বাইর-বাড়ির দিকে, তারপর ফটফটে জোছনা রাতে বাঁশঝাড়ের পাশে শেয়ালের জ্বলজ্বলে চোখ দেখেই মুখ ঝামটে উঠতেন, 'মুখপোড়ার মুখপোড়া, আমি আরও হুনিয়ার কিগুয়ে ঝাড় থাকি বাঁশ কাটিয়া নের গিয়া।'

যদিও শেষ পর্যন্ত সেই ঝাড় থেকে বাঁশ কেটেই বাঁশঝাড়ের পাশেই কাঠের উপর শুইয়ে আগুনের মাঝে তাকে খোঁচাতে হয়েছিল। কিন্তু দাহকার্য শেষ করার আগেই, কোনও কারণ ছাড়া, পুবকোণের আমগাছ থেকে বিশাল ফলন্ত আমের ডালটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ায় ছুটে পালিয়েছিল সব।

শ্যামাপদ দাশের রক্ত জল করা সেই বাড়িটার এক একটি মাটির কণায় যেন মিশে ছিল তার আত্মা। আর তাই হয়তো শ্রাদ্ধের পরদিন থেকেই সেই মাটির ঢিল ছুঁড়েই শুরু হয়েছিল পুষ্করার উৎপাত।

হরিপদরা সেই মাটি আঁকড়ে বেশিদিন থাকতে পারেনি। অমাবস্যার রাতে জ্যাঠামশাই-এর ঘর থেকে হাঁপানির শব্দে তাদের ভিটেমাটিও কাঁপত। তিনপুরুষ পুরনো জন্মমাটিতে বেঁচে থাকতে যে ষোলোআনা অধিকার ছিল শ্যামপদ দাশের সেই অধিকার মৃত্যুর পরও তার থেকে গিয়েছিল পুরো ষোলো আনাই।

ছোটভাই রমাপদ বড় ভাই বেঁচে থাকতে শুধু আশ্রিতের মর্যাদাই পেয়েছিলেন। এই নিয়ে শতাব্দীর শুরুতে দুই ভাই-র যে জবরদস্ত লাঠালাঠি হয়েছিল তা থেকেই তরাইকান্দিতে নাকি ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই কথাটির উৎপত্তি। তা সব উৎপত্তির যেমন একটি শেষ থাকে তেমনই সব শেষেরও একটি উৎপত্তি থাকে, সেই শেষের শুরু এমনই এক রাতে হয়েছিল, যখন মানুষ আর প্রেতের খুব একটা তফাৎ থাকে না।

বামাপদ সেদিন আর বাজার থেকে ঘরে ফেরেন নি। পরদিন কাকভোরে বিচ্‌রা-বাগানের পাশেই মুখে ফেনা আর চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাওয়া বামাপদ দাশের লাশ আবিষ্কার করেছিল কন্টাই।

শরীরে গিঁট মেরে দেওয়া সেই লাশ মাটি থেকে ওঠাতে গিয়ে বামাপদের হাতে এক ছিবড়ে ঘাসও উঠে এসেছিল তাদের তিনপুরুষের মাটি থেকে।

চারপুরুষ থেকে পাঁচপুরুষে এসে ঠেকার আগেই পুষ্করা-ধরা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল হরিপদ, তার মা আর বেণু। সে অনেক অনেকদিন আগের কথা। তারপর সেই বাড়ির ভিটায় মায়াধরা বৃষ্টি পড়ে পড়ে শ্যাওলা আর দুর্বাচারা হয়েছে, দরজার কব্জা খুলে গিয়ে পাল্লা ঝুলে পড়েছে আর সেই ঝুলে পড়া পাল্লার ফাঁক গলে কুকুর, ননীপাগলা, দোষী বাতাস সব আশ্রয় নিয়েছে আর তারপর তরাইকান্দির ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা—পুল তৈরী হয়েছে, আর তারপর জন্ম হয়েছে তরাইকান্দির প্রথম বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, বক্তা আর খাটাশ গালাগালের জন্য জনপ্রিয় বটতলার আড্ডার চূড়ামণি তরণীকান্ত পালের আর তারপর একে একে দেশভাগ, মন্বন্তর, দিনু ঠাকুরের ফুটবল, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী, ভগবান টকিজ, চোদ্দ নম্বর বা নাগাপট্টি চোলাই, ফরেন লিকারের দোকান, চোরাচালান, রায়ট, ভাষা-আন্দোলন, গালামাল আর তারপর বা তার আগে পরে মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে হরিপদ দু'নলা বন্দুক নিয়ে চলে এসেছে পুষ্করায় ধরা তাদের চারপুরুষের ভিটেবাড়িতে।

কুখ্যাত পেদাই ডাকাতও দল বেঁধে গিয়েছিল সেই বন্দুক দেখতে।

পেদাই ডাকাতের অস্ত্র বলতে এতদিন ছিল, বর্শা-বল্লম, রাম-দা' বা আলকাতরা নিয়ে রং করা সুপুরির ছইয়ের বেল্ট বাঁধা কৃষ্ণকচুর বন্দুক, মুখে সুপুরির খোলের মুখোশ, পায়ে খোলের জুতো।

পেদাইও সেদিন বিচিত্র সেই অস্ত্র দেখে থ বনে গিয়েছিল। বন্দুকের কেরামতি দেখার পর হরিপদ দাশের বিচিত্র কেচ্ছা শুনে নাকি পেদাইয়ের মাথার ঠিক থাকেনি আর। সেই থেকে

ডাকাতি ছেড়ে সে পীর বনে গিয়েছিল। পাঁচুগোপাল প্রথমে যাননি।

ছোটবেলার বন্ধু হরির মার্বেলের টিপ নিয়ে হাসাহাসি করত গ্রামের লোক, বলত—মার্বেল নায় হরিরে জাম্বুরা ঠুকতে দেও। তা সেই বাতাবিলেবু ঠোকার ছেলে হরির শিকার-কাহিনী পাঁচুগোপালের উঠোন পেরিয়ে যেদিন ঘরের দাওয়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন পাঁচুগোপাল হরিকে পুষ্করায় ধরবে এই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সেদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছিল হরি। তার আগে কালা-মোল্লা এসে বাড়ি বান্দ্ দিয়েছে, হাতি ঘুরিয়েছে বাড়ির চারসীমানায়, বিষ্ণুপুজো দিয়েছে আরও কতো কী যে করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

তা হাতি ঘোরাতে গিয়ে নাকি এক কাণ্ডই হয়েছিল সে দিন! শুঁড়ে সিঁদুর মাখা সেই হাতি ঘুরতে ঘুরতে নাকি থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই বাঁশঝাড়ের কাছেই। মাহুতের ঠেলাঠেলি, লাঠির খোঁচা সত্ত্বেও নড়তে চাইছিল না এক পা-ও। গুনগুন করে উঠেছিল ভিড়, পুষ্করার ছায়া পেরোতে চাইছে না হাতি।

তরণীকান্তই হরির কানে মন্ত্রটা দিয়েছিলেন আর তারপরই একছুটে ঘর থেকে দু'নলা বন্দুকটা নিয়ে এসে তাক করে দাঁড়িয়েছিল হাতির দিকে। আর দাঁড়ায়নি হাতি, হাঁটতে শুরু করেছিল পুষ্করার ছায়া মাড়িয়েই।

ভোজন শুরু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল জামাই।

পাঁচুগোপাল এসে দেখেছিলেন জামাইয়ের পাতে খিচুড়ি, লাবড়া, পায়েস বালতি-বালতি-ভাগেরা ডেকচি থেকে পড়ছে আর দ্রুত চলে যাচ্ছে জামাইয়ের রাক্ষস-পেটে।

জামাইকে গিয়ে ধরেছিল ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি সবাই।

তরাইকান্দির এই নবম আশ্চর্যের জন্য বিয়েবাড়ি, শ্রাদ্ধবাড়ি বা যে কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতেই যেন একটি আসন থেকে যায়। জামাই খেলেই যেন মন্বন্তরের সব বুভুক্ষু মানুষের খিদে মেটে।

জামাইয়ের খিদে সেদিনও মিটত না, যদি না তরণীকান্ত খাটাশ ভাষায় ধমকে উঠতেন, 'আর উঠ, কত খাইতে—অতো খাচ্ আগোছ্ কতখান্।' জামাই-এর মলত্যাগ তরাইকান্দির কেউ যেমন দেখেনি তেমনি পাচুগোপালও দেখেন নি। হরিপদকে কুমায়ুনে জিম করবেটের সাথে বাঘ মারতে বা আফ্রিকার পিগমী আর টারজানের সাথে ভিক্টোরিয়া ফলস্ পেরোতে। এক তরণীকান্ত ছাড়া তরাইকান্দির কেউই রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম শুনলেও ফলস্ টারজান বা করবেটের নাম শোনেনি।

সব শুনতে পারেনি, সব শুনতে পারেনি সেদিন পাঁচুগোপাল, কিন্তু যা শুনেছিল আর যা দেখেছিল তাতেই তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল। চক্ষুও যে চড়কগাছ হতে পারে তরাইকান্দিব

অনেকে তা সেদিনই প্রথম চাক্ষুষ দেখেছিল। হরিপদ নয়, হরিপদের গল্পও নয়, হরিপদের বন্দুক দেখার পরই পাঁচুগোপাল বুঝতে পেরেছিলেন—বন্দুকের নলই সমস্ত শক্তির উৎস। এবং শক্তিই ভক্তিব উৎস, এই কথা তিনি আরও কিছুদিন পর বুঝতে পারলেন, যখন দেখলেন শিকারী শব্দটির সাথে ধীরে ধীরে হরিপদ সমার্থক হয়ে যাচ্ছে।

কাঁধে বন্দুক নিয়ে মৃত বাঘের উপর পা তুলে দাঁড়ানো শিকারীর উর্দি গায়ে হরিপদের ছবি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেন 'পাখিমারা পাঁচু'—একচক্ষু বন্ধ করে গুলতি হাতে তাক করছেন পাঁচুগোপাল আর পেছন থেকে তরণীকান্তের বজ্রহিম কণ্ঠ —'কিতা দেখিত্‌রে পাঁচু।' পাঁচু ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, 'আইজ্ঞা পাখি', সামান্য বিরক্তিতে আবার তরণীকান্তর গলা, 'কানার কানা বাবা করিয়া দেখিয়া ক এখন কিতা দেখিত্‌রে?' পাঁচুগোপাল ভয়ার্ত উত্তর দেয়, 'আইজ্ঞা এখন পাখির মাথা', পাঁচুর উত্তর শেষ না হতেই তরণীকান্তের ধমক, 'তোমার মুণ্ডু, হাগাড়ালি—আবার দেখ্ চৌখ মেলিয়া' এবার পাঁচুগোপাল দেখতে পান, পাখি নয়, পাখির মাথাও নয়, হরিপদ তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। পাঁচুগোপাল সেইসঙ্গে খিল খিল করে হাসতে থাকা পোয়ামারা পুলটিকেও দেখতে পান।

পুলটির সাথে শুধু পাঁচুগোপালের নয়, সমগ্র তরাইকান্দির ইহিতাস জড়িয়ে আছে আর সেই ইতিহাসই এখন বলতে শুরু করেছে তরাইকান্দির সমবয়েসী বটগাছটা।

মন্বন্তরের বছরই সেই বিখ্যাত বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন যুবক উঠতি নেতা তরণীকান্ত পাল।

চোঙ্‌মুখে আজকের মতই তরাইকান্দির গলিতে মাঠেঘাটে ঘোযণাটি ছড়িয়ে দিয়েছে তরাইকান্দি জাতীয় কংগ্রেসের ছেলে ছোকরারা। লিখিত ঘোষণাটি তারা লিখিত ভাষায়ই শুনিয়েছিল : 'আগামী দুইরা বৈশাখ রবিবার যমুনা ভাণ্ডারের সম্মুখস্থ প্রাংগানে এক বি-রা-ট জনসভার আয়োজন করা হয়েছে ... ...। আপনারা দলে দলে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, তরাইকান্দি জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ।' সেদিন লোক হয়েছিল কাতারে কাতারে। মানুযের মাথা, তারও পরে মানুষের মাথা, তারপর ছাতা, তারপর তকী, তারপর মাথা, গাছের উপরে মাথা, টিনের চালে মাথা, মনে হচ্ছিল হাজার হাজার পাতিলে চুন দিয়ে মুখচোখ আঁকা কাকতাড়ুয়া কেউ বসিয়ে দিয়েছে বাঁশের কঞ্চির মাথায়। তরাইকান্দির প্রতিবাদহীন বোবা মানুসগুলো (যাদের বাঙালীর জাতীয় প্রতীক আমের সাথে তুলনা করে বলা হয় আমজনতা) যে কাকতাড়ুয়াই তা বুঝতে অর্ধশতাব্দী কেটে গিয়েছিল তরণীকান্তের।

যে বক্তৃতা শুরু হয়েছিল—কবিগুরু বলেছিলেন, পুল জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক (কেউ কেউ জানত, তরণীকান্ত কবিগুরু, নেতাজী, মহাত্মাদের নামে নিজের কথা হেলায় চালিয়ে দিতেন) এবং শেষ হয়েছিল, পুল হবে পুল থাকবে—সেই পুলবিষয়ক বক্তৃতার তোড়ে বেদান্ততীর্থ বেদান্তবাগীশ কাব্যতীর্থ শ্রী বিজয়মোহন পঞ্চশাস্ত্রীর সামান্য প্রতিরোধের

বাঁধও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

জলমার এপার আর ওপার থেকে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছিল পুল।

হাতির পিঠে কাঠের বিশাল পাটাতন, পাথরের চাঁই, লোহার বিরাট আকৃতির মুগুর—নাট বল্টু, আর হাজার হাজার বাঁশের গড়। দক্ষযজ্ঞে লেগে পড়েছিল হাজার হাজার মানুষ, যেন বানরসেনার সেতুবন্ধন। জলমার পাড়ে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে দেখত সভ্যতার সেই প্রথম দর্প।

তা দর্পচূর্ণ হতেও বেশী সময় লাগেনি তরণীকান্তের। পুল শেষ হবার মুখেই বার বার ভেঙে পড়ছিল আর জলমার জল গুমরে গুমরে বলছিল মানুষ চাই, মানুষের রক্ত চাই।

পুল রক্ত চাইছে—এই কথাটি রটে যাওয়ার সাথে সাথে রাতারাতি যেন গায়েব হয়ে গিয়েছিল সব পোলাপানেরা। সেইসব দিনে খুঁচিধবাব ভয়ে ছেলেমেয়েরা ঘর থেকে বের হত না, মাঠে-উঠোনে একাদোক্কা, বন্দী খেলা বন্ধ ছিল, কোলের শিশু জোরে কাঁদলে মা গলা টিপে মেরে ফেলত তাকে। তাজা রক্তে যদিও সেই বছরের শেষে মরিয়া তরণীকান্ত ধুয়ে দিতে পেরেছিলেন পুলটিকে আর সেই কাহিনী বটগাছ ছাড়া তরাইকান্দির কোনে কাকপক্ষীও জানে না।

সেদিনও শুধু শরীরের টানে গিয়েছিলেন স্নেহলতার কাছে।

তরাইকান্দির ব্রাহ্মণবাড়িব শেষ বংশধর স্নেহ আর হাম হামি করা ভেঙে ভেঙে পড়া চোদ্দপুরুষ—পুরনো বাড়িতে গেলেই যেন নিজেকে খুঁজে পেতেন তরণীকান্ত। মনে হত এই বাড়ির ইট কাঠ পাথর গুপ্তধন সব তার জন্য বেঁচে আছে। তার পায়ের লাথিতে আর 'পুঙ্গির পুত' গালির চোটে মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ত চুনসুরকির পলেস্তারা আর তারপর যখন স্নেহের শবীরের কাদা ছানতেন তরণীকান্ত তখন এক অদ্ভুত মানসিক তৃপ্তি পেতেন। সময়ের বিচিত্র পরিহাসে আজ তিনি জাঁদরেল ব্রাহ্মণবাড়ির নিয়ন্তা, স্নেহলতার রক্ষক।

সেদিন বিছানায় স্নেহের শরীর নিয়ে খেলতে খেলতে চোখ পড়েছিল মেঝেতে বসে আপনমনে খেলতে থাকা উদোম গা নিলয়ের দিকে। খুঁতহীন নিলয়ের শরীরটা দেখেই তরণীকান্তের শিকারী চোখ ঝলসে উঠেছিল।

স্নেহ বাধা দেয়নি, বাধা দেওয়ার কারণও ছিল না। রোজকার মত আজও নিলয় তার রক্তমাংসের গোপন পিতার সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিল।

সেই রাতে চাঁদ লুকিয়েছিল মেঘের আড়ালে। মধ্যরাতে সেই চরাচরব্যাপী অন্ধকারে তরাইকান্দির স্বপ্নের পুলের পাশে যাকে বলি দেওয়া হবে সেই ছেলের চোখ শেষবারের মতো দেখে তরণীকান্তের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। নির্বোধ সেই চোখে ভেতর দু'পুরুষ পুরনো এক অশরীরী ছায়া মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। আগুনের আবছা আলোয় সেই নিষ্পাপ মুখ আর এক ভৌতিক চোখ দেখে তারপর দিন থেকে মধ্যরাতে

চিৎকার করে, অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ঘর কাঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন তরণীকান্ত। আর সেই কান্নার ধ্বনি শুনেই রোজ মধ্যরাতে তরাইকান্দির পোয়ামারা পুলও জেগে ওঠে এক শিশুর ফোঁপানো কান্নায়। সেই কান্নার শব্দকে তোয়াক্কা না করেই তরাইকান্দির শহর হয়ে ওঠা আর তরণীকান্তের তরণীকান্ত পাল আর পাখিমারা পাঁচুর বন্দুক-পাঁচু হয়ে ওঠা।

তো, শিকারের গল্পই তুলেছিলেন পাঁচুগোপাল আর সেই গল্পের শেষটাই এখন বলছে বটগাছ, যে গল্প যমুনা ভাণ্ডারের সম্মুখস্থ সেই বিখ্যাত প্রাঙ্গণে বটগাছটির ঠিক নীচে বসেই আজ নিশিরাতে ভূতের মত শুনছেন তরণীকান্ত আর পাঁচুগোপাল, কারণ যে যার সময়ের শেষে একে একে ফিরে গেছে নিজেদের পরলোকে, শুধু পুষ্করা হয়ে যাওয়া দুটো মানুষ তাদের জীবনের অসমাপ্ত গল্পের টানে বসে আছে, বসে বসে শুনছে যে গল্প তারা শেষ করে যেতে পারেনি সেই গল্প।

হরিপদ আসার পর শিকারের ভূত চেপেছিল সবার। শুক্কুর হারাণ, মন্টা, পাঁচুগোপাল আর বন্দুক কাঁধে বিশ্ববিখ্যাত শিকারী হরিপদ প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন শহর গ্রাম ছেড়ে। ততদিনে শহর তরাইকান্দির আক্রমণে গ্রাম জঙ্গলের পিঠ এসে ঠেকেছে দেওয়ালে।

পাঁচুগোপাল শুধু মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁয়ে দেখত, পোড়া কার্তুজের গন্ধ নিত, আর চোখ বুজে হরিপদের বন্দুক তার চওড়া কাঁধে দেখতে পেত।

সেদিন হরিপদই জোর করে নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

পাঁচুগোপাল প্রথমে একা যেতে চায়নি, ভয় করছিল। পরে বাসে যেতে যেতে যখন সে ভাবছিল, কিসের ভয়, কাকে ভয়, তখন বুঝতে পেরেছিল ভয় নিজেকেই, কারণ পাঁচুগোপাল জানত মাঝে মাঝে শিকার শিকারীকেও শিকার করে।

কুঁচির-তল হরিপদ এর আগে কোনদিন যায়নি, সুতরাং সেখানেই যাওয়া স্থির হল। পাঁচুগোপালের মাথায়ই যেন নামটা শয়তানের মত খেলে গিয়েছিল। নৌকোয় যাওয়ার সময় চরায় একটি পরবর্তী সিংগাল, তার কিছু দূরে বিপদ আঁচ করে দাঁড়িয়ে থাকা ডেলি আর বাচ্চা হরিণটা দেখে নিশানা লাগিয়েছিল হরিপদ। হরিপদের হাতে গুড়ি ফস্কায় না, কিন্তু সেদিন ফস্কেছিল আর পাঁচুগোপালের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেনে গিয়েছিল, আজকেই সেই দিন।

সেই মধ্যাহ্নে কুঁচিরতলের জলার পাড়ে ভয় আর রোদ যেন থম মেরে ছিল। ঐ জায়গায় এই সময়ে অদ্ভুত রকমের গা ছমছম করে।

অনেক আগে একদিন পাঁচুগোপাল আর শুক্কুর এসেছিল মাছ ধরতে। আসার সময় শখ করে বাঁটুদা'র দোকান থেকে নতুন স্প্রোকেট, হুইল বঁড়শি আর টোপ বানাবার জন্য খৈল, টোস্ট এসব নিয়ে এসেছিল। সেদিন কোনো মাছ ধরতে পারেনি সে আর শুক্কুর, শুধু যে পাড়টায় বসেছিল তার কয়েক হাত দূরে দেড় মানুষ সমান জলে হঠাৎ ডহরের আবর্তে এমন কিছু দেখেছিল তারা যে গায়ে কাঁপুনি দিয়ে তিনদিনের জ্বরে পড়েছিল পাঁচুগোপাল আর

শুক্কুর।

একই জায়গায় এসে বসেছে তারা আজ, যেখানে নদীর একটা ডাল এদিকে বেরিয়ে এসে প্রাকৃতিক লেজের মতো হয়ে গেছে নীচু জলা জায়গাটা। নদীর জল বাড়লে বা কমলে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এর জল। জলাটায় এসময়ই প্রচুর মাছ, মেছো পাখি আর বক আসে।

কতক্ষণ জলার পাড়ে বসেছিল পাঁচুগোপালের খেয়াল নেই। এর মাঝে দু'দুটো স্যাণ্ডুইচ খাওয়ার পরও খিদে আবার চিড়চিড় করে উঠেছে, কিন্তু আশ্চর্য, এতক্ষণ পাখি কেন, কোনও পাখির ডাকও তারা শুনতে পায়নি। আর তখনই হঠাৎ যেন পথ ভুল করে একটি করালী বক এসে বসেছিল ঘাসের দলটার উপর।

হরিপদ নির্ভুল টিপ লাগিয়েছিল।

বকটা একটা বিচিত্র চিৎকারে সেই নৈঃশব্দ ভেঙে জলার উপর ভেসে থাকা ঘাসের দলের পাশেই জলে সামান্য রঙ গুলে দিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। জলের নামার আগে কোনো বাধা দেয়নি পাঁচুগোপাল। হরিপদ তার হাতে বন্দুকটা ধরিয়ে বুক কেটে কেটে এগিয়ে গিয়েছিল ঘাসের দলটার কাছে।

হরিপদ নাক চাপা দিয়ে ঠিক ক'টা ডুব দিয়েছিল খেয়াল নেই। শুধু ডুব দেওয়া আর ভেসে ওঠার মাঝের বিরতির সময়টুকুতে এক অদ্ভুত উৎকণ্ঠায় বার বার তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল।

মৃত বক আর হরিপদের মাঝে অনেকক্ষণ এই খেলা চলছিল।

জলার পুবকোণ থেকে সেই হিসহিসে শব্দটা কানে যাওয়ার পরই পাঁচুগোপাল দেখেছিল ডহরটা হরিপদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

হাতের মুঠিতে ধরে রাখা স্বপ্নের বন্দুকটাই যেন চেপে দিয়েছিল পাঁচুগোপালের গলার স্বর আব তার ঠিক পরেই তার কানে পৌঁছেছিল সেই ভয়ার্ত চিৎকার—'আমার বাঁচারে পাঁচু।'

ঘাসের দল আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছিল হরিপদের পা, অনেকক্ষণ জলের নীচে ঝটপটানোতে তোলপাড় হচ্ছিল জলার জল। পাঁচু নড়েনি, চিৎকার করেনি, শুধু শিকারীর চোখ নিয়ে দেখছিল। তারপর পাঁচুগোপালের দিকে বিস্ফারিত নীল চোখে তাকিয়ে থাকা পুরো নীল হয়ে যাওয়া হরিপদের মৃতদেহ ভেসে ওঠার সাথে সাথে ছুটে গিয়েছিল সামান্য দূরে ঘাস কাটছিল যে বাগানের কুলিরা তাদের কাছে।

একটি বাতজাগা কুকুরের বিকৃত কান্না শব্দে যেন জেগে ওঠে তরণীকান্ত আর পাঁচুগোপালের ছায়ামূর্তি।

গল্প শেষের সেই প্রগাঢ় নৈঃশব্দের মাঝে তাদের পায়ের নীচের মাটি থর থর করে কাঁপে।

একটা গুম্ গুম্ ধ্বনি যেন পোয়ামারার পুল দাপিয়ে তরাইকান্দিতে ঢুকে পড়ে আর তারপরই স্টেশন রোডকে নাড়িয়ে সবুজ দানবের মত শত শত কনভয় ইঞ্জিনের গর্জন তুলে চলে যাবার সময় অতর্কিতে তরাইকান্দির সমবয়েসী বটগাছটি বিদ্যুৎ আর টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ভেঙে পড়ে দুইটি অশরীরী মানুষের উপর।

সৌমিত্র বৈশ্য

নীল

'এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, ...'

সুকুমার রায় প্রথম কবে পড়েছিল অনামিকা, এখন আর মনে নেই। শৈশবে সবাই যেমন পড়ে, স্কুলের ফাংশানে আবৃত্তি করতে, তেমনই হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরও সেই মুগ্ধতা গেল না। সুকুমার রায়ের এক অদ্ভুত ফ্যান্টাসির জগৎ আবিষ্কার করে সে। বস্তুত, ফ্যান্টাসি ভালোবাসে অনামিকা; যার ভিতর দিয়ে সে আবিষ্কার করে নিজেকে। অথবা বলা যাক, নিজেকে নির্মাণ করে নেয়। চারপাশে এত সব কথা, শব্দ, সম্পর্ক, আকাঙ্ক্ষা সব সে মুড়ে নেয় ফ্যান্টাসির মোড়কে। তার কাছে রূঢ় বাস্তবও ফ্যান্টাসি হয়ে ওঠে। আজকাল ভারচুয়্যাল শব্দটা খুব চালু হয়েছে। সাহিত্য যে বাস্তবতা নির্মাণ করে, সেও তো এক ভারচ্যুয়াল বাস্তবতা।

অনামিকা নিজেও তো এক ভারচ্যুয়াল বাস্তবতা। জীবন অনিত্য—-এই ভেবে সে কখনও পরলোকের কথা ভাবে না। তথাপি, যে-কাল নিরবধি, তার প্রেক্ষিতে এই খণ্ড-কাল, সামান্য এক-জীবন তো একটি পল মাত্র। তবু আমরা জীবনের পলায়মান সকল মুহূর্তকে চিরন্তন ভাবি। কিন্তু সত্যিই কি তা চিরন্তন? বার্লিনের দেওয়াল বা সোভিয়েত—ছিল কী চিরন্তন? তবু এই রণরক্তসফলতার সাথে হেঁটে যায় জীবনের অগাধ বিশ্বাস। কেন যায়? নাকি স্থির হয়ে রয়ে যায় একটি বিন্দুতে?

এইসব ভাবনার ভেলায় ভেসে ভেসে, কতদূর চলে যায় অনামিকা। আর অকস্মাৎ সে পরিগ্রহ করে বাস্তবরূপ। সে বিবাহিত। আটত্রিশ বসন্ত তার ছুঁয়ে গেছে রূপ। সে জননী। বড় ছেলে এআইট্রিপর-ই পাশ করে গেছে ভিন রাজ্যে। আর কনিষ্ঠ পুত্র এবার সপ্তম শ্রেণী।

স্বামী একটি ওষুধ কোম্পানির বড় সাহেব। অতঃপর অনেক অবসর তার চারপাশে জমে ওঠে। আর তখনই তার ভিতরে জেগে উঠতে থাকে, টুকরো টুকরো হরেক সত্তা। তারা নড়তে থাকে। ডানা ঝাপটায়। প্রবল আবেশে জুড়ে যেতে চায় তার জীবনের সাথে, তার আবেগ, তার কল্পনা, তার আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির প্রতিটি পরতকে ছিন্নভিন্ন করে।

ক.

এই দুপুর বেলাটা আমার খুব বিচ্ছিরি লাগত আগে। এখন আমার সারাদিনের উদগ্রীব অপেক্ষা থাকে কখন সব কাজ সেরে, বসব এসে কম্প্যুটারের সামনে। এখন আমার বন্ধু তালিকায় ২১৩টি প্রোফাইল। অ্যালবামে নিজের ছবি দিইনি। পরিবর্তে নেট থেকে তুলে নেওয়া একটি নিসর্গের ছবি। একটি নদীর তীরে বাঁধা, এক নিঃসঙ্গ তরী। নামটাও নিজের নয়। এখানে আমার নাম অর্পিতা। বাকি সব এক। ঠিকানাটা কলকাতার। কেউ জানতে চায়, আমি কলকাতায় কোথায় থাকি। পিনকোড দেখে কেউ অনুমান করতে চায় বাড়িটা কোথায়। নিজের সম্পর্কে লিখেছিলাম : হারিয়ে যেতে চাই অজানার হাত ধরে। সঙ্গে ছিল কয়েক পঙ্‌ক্তি এলিয়ট—

Between the idea
    And the reality
Between the motion
    And the act
Falls the shadow

দেখতে দেখতে অনেক বন্ধু জুটে গেল অর্পিতার। কলেজ পড়ুয়া কিশোর থেকে অনতিপঞ্চাশ যুবা, যুবাই তো বলব এদের। কথাবার্তায় কেতাদুরস্ত। নারীমনে নিজেকে শালগ্রাম শিলার মত প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য সদা-উন্মুখ। অর্পিতার হোম পেজ-এ প্রতিদিন বাড়তে লাগল বন্ধুত্বের আহ্বান। এদের সবাই পুরুষ। কেউ বন্ধুত্বের আমন্ত্রণে লিখে দিত—‘আমিও হারাতে চাই। সঙ্গী হবে, অর্পিতা?’ কারও প্রোফাইল নামটাই পৌরুষের কামনার সুতীব্র আর্তি। প্রবল ধর্ষকামে নিষ্পিষ্ট করে দিতে চায় নারীর মনোলোক। সেই প্রোফাইলের অন্তরালে আছে যে-পুরুষটি, সে, তার অস্তিত্বকে ওই একটি ভারচ্যুয়াল নামের মধ্যে, নামচিহ্নের মধ্যে, পুং-লিঙ্গবাচক পরাক্রমে ধ্বজার মত উত্তেজিত করে; একটু গোপন করে না প্রোথিত হবার পিচ্ছিল বাসনা। আর কেউ বন্ধুত্বের শাদা ও শুদ্ধতার আহ্বানে জিনে নিতে চায় এ নারীর কোমলতা, যে বাস্তব, অস্তিত্বময়। যদিও দু'জনের মাঝে ভূগোলের যোজন-দূরত্ব, রয়েছে অদৃশ্য স্পর্শাতীত আড়াল। কেউ নিছক গল্প করতে চায়, সময় কাটাতে চায়। কখনও তারা মেতে ওঠে তুমুল তর্কে।

আমি দেখি, অনামিকা বসে আছে কম্প্যুটার খুলে। নন্দীগ্রাম নিয়ে অজস্র স্ক্র্যাপ এসেছে।

এর মধ্যে অনেকগুলো স্ক্র্যাপের অনুরোধ প্রোফাইলের ছবিটা কালো করে দেবার। যেহেতু, অর্পিতা কলকাতার ভৌগোলিক স্থিতিটা বেছে নিয়েছিল তার আবাসস্থল হিসেবে, তাই এই প্রস্তাব। অনামিকার নিজস্ব একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল। হয়তো মনের ভেতর হাতড়ালে এখনও সেই বিশ্বাসের সুতোটি খুঁজে পাবে। কলেজ জীবনে বা বিয়ের আগ পর্যন্ত, অনামিকা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের অনুসারী ক্রিয়াকাণ্ডে। অনামিকার বিশ্বাস এসে ঢুকে পড়ে অর্পিতার ভাবনায়। সে কালো করে নেয় প্রোফাইলের ছবি। ধীরে ধীরে অনামিকার ভাবনা, অনুভূতি সঞ্চারিত হয়ে যায় অর্পিতার প্রোফাইলে। অনেকগুলো স্ক্র্যাপ পাঠায়। এরমধ্যে একজন, যার নাম অ্যাডভেঞ্চার লাভার, কট্টর বামফ্রন্ট সমর্থক। লোকটা বোধহয় সারাদিন বসে থাকে নেট চালিয়ে। ওকে বিদ্রুপ করে স্ক্র্যাপ পাঠায়। অর্পিতার ভেতরে একটা তীব্র ক্রোধ বুনো মোষের মত শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে। চটজলদি জবাব পাঠায় অ্যাডভেঞ্চারকে। পশ্চিমবাংলার বাইরে বসে, অনামিকা কেন জড়িয়ে পড়ছে মানসিকভাবে একটি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে? জানতাম, অনামিকার রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। স্ট্যালিন তাকে বুঝিয়েছেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা হচ্ছে কম্প্রোমাইজিং ফোর্স বিটুইন লেবার এণ্ড ক্যাপিটাল। আর সোস্যাল ডেমোক্রেটদের জনবিচ্ছিন্ন না করতে পারলে ক্যাপিটালিজমের উৎখাত অসম্ভব। অর্পিতা, বয়স এখন বত্রিশ, একটি মাত্র সপ্তম-বর্ষীয় বালকের জননী, স্বামী মাল্টিন্যাশনালের ছোটকর্তা সে সল্টলেকের কোথাও ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে, মনখারাপ হলে সামান্য পানীয় সহযোগে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবিঠাকুরের গান শোনে—এইভাবে সাজানো একটি অস্তিত্বের ভিতরে কেন ঢুকে যায় অনামিকা? অর্পিতার কী স্বাধীন কোনও ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই?

যত দিন যায়, ঐ অ্যাডভেঞ্চার লাভার আর সৌরভ নামের একটি সদ্য তরুণ, অর্পিতাকে নিয়ে যায় এক নিষিদ্ধ ভ্রমণের দেশে। তখন ওরা ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারের চারদেয়ালের ভিতরে ঢুকে যায়। ওর মনে হয়, একটি গোপন চিলেকোঠায় ঢুকে পড়েছে। যেখানে কেউ জানে না ওরা কী করছে। কেউ শোনে না ওদের আলাপচারিতা। টের পায় না ওদের প্রণয়, ব্রীড়া আর অবরুদ্ধ নীলাভ দহন।

খ.

এবার আমরা অনামিকার জীবন-চরিতে প্রবেশ করব।

অনামিকা চক্রবর্তী, বিয়ের আগে ভট্টাচার্য, বিয়ে করেছে বাবার বাছাই করা পাত্রকে। দেখতে অসামান্য সুন্দরী না হলেও, তার কথাবার্তায়, আচরণে, প্রাণের এমন সজীব তরঙ্গ টের পাওয়া যেত যে এরপর তার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যেত না। তার মন, তার চেতনা যেন জীবন ও জগতের সকল অধ্যায়কে বুঝে নিতে চাইত প্রবল আগ্রহে। অর্থনীতির ছাত্রী হয়েও সাহিত্য, চিত্রকলা, দর্শন—সবই ছিল তার জীবন-পিপাসার জল। ছেলেমেয়েদের

মেলামেশা তখনও এমন অবাধ ছিল না। তবু, চলার পথে কোনও পুরুষ-মন আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রতি। একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণবাড়ির মেয়ে, স্কুল-শিক্ষক বাবার প্রবল প্রতাপ, নিরুপায় ভীরুতায় প্রত্যাখ্যান করিয়েছে সকল প্রণয়-প্রস্তাব। অবরুদ্ধ করে দিয়েছে মনের অর্গল। একটি পুকুর ছিল তার মনের ভিতর। কেউ ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গ উঠেছে তাতে, আর মিলিয়ে গেছে নীরবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে, কিছুদিন ক্লাস করেও পড়া হল না। বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনে অচল হয়ে পড়ল শিক্ষায়তন। সে ফিরে গেল ঘরে। তবু তার মনে হত, এ-জীবন অপচয়ের নয়। চাকরিও একটা পেয়ে গেল সে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংস্কার যাকে বলে সুসময়, তাই যেন প্রজাপতির ডানা মেরে উড়ে এল তার বাড়িতে। পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে ওকে' মা আপত্তি করেছিলেন। শ্রীবাস, ওর বর, বেসরকারি চাকরিতে রত। বাবা সব আপত্তি নাকচ করে দিলেন প্রবল প্রতাপে। তার নিজেরও সাধ ছিল, সরকারী চাকুরে বর পাবার, তখন পর্যন্ত তার যে ক'জন বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে, তাদের সবার বর সরকারী চাকুরে। বিয়ের কয়েক বছর পর, শ্রীবাসের আর্থিক বৈভব, তার সেই হতমান গ্লানিও মুছে দিয়েছিল আর আজ সে এককালের ডি-ক্লাসড্ হবার সংগ্রামের বিপরীত এক সহজ বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে গা। তখন শ্রীবাসের নির্দেশে ছাড়তে হল চাকরি।

বিয়ের পর অনামিকা টের পায়, সে এসে প্রবেশ করেছে শতাব্দী প্রাচীন এক গুহায়। সেখানে এখনও চলছে উনিশ শতক। এ-বাড়ির বৌ চুড়িদার পরে না। হাতকাটা ব্লাউজ পরে না। ম্যাক্সি পরার কথা ভাবলে পাপ হয়। যে পাপ-পুণ্য নিয়ে সেও ভাবত না এককালে, এ-বাড়িতে সব কাজের, আচরণের ঔচিত্য বিচার হয় পাপপুণ্যের নিক্তিতে। এ-বাড়িতে শালগ্রাম শিলা স্থাপিত। স্বামীর বন্ধুদের সাথে কথা বলা, আড্ডা দেওয়া নিষিদ্ধ কর্ম। প্রথম দিকে এসব বুঝত না অনামিকা। একদিন শাশুড়ি নিজেই নিষেধ করলেন। সেদিন নিজেকে খুব নিঃস্ব মনে হয়েছিল ওর। শ্রীবাসকে বলায়, সেও খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মেনে নিয়েছিল এই নিষেধ। কেঁদে ফেলেছিল অনামিকা। আর অনামিকার অশ্রুমোচনের আবেগে উচ্ছ্রিত হয়ে, প্রোথিত হয় উদ্ধত প্রতাপে। সে-রাত থেকেই ক্রমে নিরাভরণ হতে থাকে অনামিকার অন্তঃকরণ। বিয়ের ছ'মাস পরেও তার ঋতুর ধারাবাহিকতা শাশুড়িকে চিন্তিত, ক্ষুব্ধ করে তোলে। এরপর দাম্পত্য রমণকালেও সে দেখত, শাশুড়ি বসে আছে শয্যাপ্রান্তে। সে হয়ে পড়ত শীতল। শ্রীবাসের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সে বাধ্য করেছিল গর্ভসঞ্চারে।

সেই থেকে অনামিকার মনের সব ইচ্ছের মুকুলগুলো ঝরে গেল। শ্রীবাস আরও বেশি কাজের মুখরতায় পাল তুলে, একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির কর্তা হয়ে উঠল। দিনরাত কোম্পানির বাণিজ্য সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করার চেষ্টায়, তার যাবতীয় সময়, উদ্যম খরচ হয়ে যেতে লাগল। ফলে, অনামিকা কিছুতেই যেন তাকে নাগালের মধ্যে পেত না। অথবা মা'কে পেত, সে একটি ক্লান্ত, হাইতোলা ঘুমকাতর শরীর। ঝরে পড়া হলুদ পাতার মত তারা পড়ে রইল সংসার নামক একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে।

হু-হু করা সন্ধ্যার বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় অনামিকার মন গন্তব্যহীন পথে।

গ.

জানি না সে এইখানে
শুয়ে আছে কি না।

বস্তুত অনামিকার অপূর্ণতা থেকে, তার অন্দরের অবরোধ ভেঙে, সংস্কারের জটিলতার গ্রন্থিমোচন করতে করতে ক্রমে জেগে উঠল অর্পিতা। এক ভারচ্যুয়াল মানবী, তার স্ক্র্যাপ বুকে অজস্র বয়ান, অজস্র কামনা, অজস্র আবেগ, অজস্র অপূর্ণতা।

অ্যাডভেঞ্চার : হাই, কাম টু মাই ক্যাসল্! (২২ আগস্ট : টু মিনিটস্ এগো)

সৌরভ : অর্পি, তোমার জন্য আগ্নেয়গিরি হয়ে আছি। (২২ আগস্ট, ওয়ান আওয়ার এগো)।

বর্ণ টু লিভ : ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইজ নেসেসারি ফর রিভোলিউশন। (২২ আগস্ট, এইট্টিন আওয়ার এগো)।

আসলে সে তো অক্ষর গড়া এক মানবী। মানুষ যাকে মেনে নিয়েছে। সবাই তাকে বিশ্বাস করতে চায়। ছুঁতে চায়। ভালোবাসতে চায়। কখনও তাকে ঠোকরায়। প্রবল ধর্ষকাম উন্মাদনায় তাকে একটি তপ্ত মাংসপিণ্ডের আকার দিতে চায়। এতো এক পক্ষের উল্লাস, পৌরুষের শ্লাঘা। কখনও অর্পিতার মন বমনেচ্ছু হয়। হতমান বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মণিটরের দিকে। সেখান থেকে অক্ষরের অজস্র কিলবিলে হাত, শরীরময় ঘুরে বেড়ায়, বিবস্ত্র করে তাকে। শোয়ায়। উপগত হয়। সারমেয়-সদৃশ মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে ও তৎসম্পর্কিত মতামত যাচ্ঞা করে।

দ্রুত হাতে মুছে ফেলে এই সব অপৌরুষের বয়ান। তার ভালো লাগে দীপেনেরও প্রিয় কবি উৎপলকুমার বসু জেনে। উৎপল কুমারের কবিতা থেকে তারা চলে যায় শক্তির কাব্যভাষার স্বেচ্ছাচারে। নারীবাদ ও নারীমুক্তি যে একটি অরাজনৈতিক এজেণ্ডা হতে পারে না, এ নিয়ে তারা লিপ্ত হত তুমুল তর্কে। কখনও নেট সার্ভার মন্থর হয়ে গেলে সে ধৈর্যহারা হয়। ফের কী-বোর্ডে আঙুল তার ঝড় তোলে। সে বলে যায়, তসলিমার ভ্রান্তিটা এখানেই যে তিনি তাঁর যাবতীয় সদিচ্ছা, সততা, অনুভূতির গূঢ়তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীদের স্বার্থ রচনা করছেন। তবু যারা তসলিমা বিতাড়নের হোতা, তাদের বিরোধিতা করাটা জরুরি। কারণ, তা না হলে মৌলবাদী শক্তি (হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে) নারীমুক্তি আন্দোলনকে পদানত করে ফেলবে।

এমন সময় তার সন্তান এসে তাকে ডাকে। খিদে পেয়েছে তার। নেট-চর্চায় মশগুল সে বলে ঠাম্মাকে খাবার দিতে বলতে। ঠাম্মা এসে উঁকি দিয়ে দেখেন, বৌমা কম্প্যুটার চালিয়ে

কী সব টাইপ করছে। বৌমা যে টাইপিস্ট হয়েছে এ'কথাটি হিমশীতল ব্যঙ্গ হিসেবে ছুঁড়ে দেন চেনাপরিচিত ও আত্মীয় মহলে। স্বভাবতই, কেউ কেউ সবিস্ময়ে আগ্রহ বোধ করে, সে সত্যিই কী টাইপ করে জানতে। নেট-চর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা-সম্পন্না এক আত্মীয় তাকে অনাগত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে যান। তার নেট-চর্চা আত্মীয় মহলে রসালো মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ নেট-এর জানালা ছিল তার মুক্তির আকাশ। মনের সব ক্রোধ, অভিমান, অবদমন, অপূর্ণতা-—সব এখানে এলে খসে পড়ত পালকের মত। এখানে সে 'প্রাউড টু বি কম্যুনিস্ট' নামের সমিতির সদস্য হয়ে, পুঁজির বিশ্বায়িত বিকাশে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় নাগরিক বিষাদ যে আসলে এই নিরক্ত সমাজের গভীর গভীরতর অসুখের, বিবর্ণতার সালতামামি। একদিকে এই ধূসর বিষাদ, অন্যদিকে অসুখী জীবনের প্রতি মমতা, নিরাময়হীনতার মর্মন্তুদ আর্তি ও কাতরতা। এক ভাস্কর-প্রেমিক পাঠককে সে জানিয়েছিল যে মণীন্দ্র গুপ্ত ভাস্করের কবিতা নিয়ে অসামান্য আলোচনা করেছেন।

দুপুর হলেই নেট-এর জানালা, তাকে নিশিডাকের মত টানত। 'সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা' সে চলে যেত বহুদূর; যেখানে তার শরীর, তার রক্ত-মাংস, মন, বোধ ও চেতনা মিলেমিশে একাকার অবয়ব নিয়ে তার প্রতীক্ষায় ছিল কতকাল। তবু সংসার তাকে ঘিরে ধরে অর্গল তুলে দেয়। সমাজ রসালো ফলের ন্যায় তাকে চঞ্চু বিদ্ধ করে। বাস্তব অবাস্তবের ঘোর ভেঙে, নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে তার মন ভেসে যায়, সাড়া দেয় নীল ইশারায়।

কাম টু মাই ক্যাসল্—ক্যাসল্ .. ক্যাসল্ ...। দুর্গ। একটা উঁচু পাহাড়ের মত স্থান, তার উপর একটি প্রাচীন দুর্গ, চারদিকে প্রদোষের আবছায়া। দুর্গ পাহারা দিচ্ছে শিরস্ত্রাণ পরা প্রহরী। তাদের সঙ্গে শিকলে বাঁধা হাউণ্ড কুকুর। সমস্তটা দুর্গ যেন প্রবল প্রতাপের, ক্ষমতার, দম্ভের, পেশি ও অর্থের সম্মিলিত আস্ফালনের, উত্থানের প্রতীক। দৃশ্যটি সে আরেকটু স্পষ্ট করে দেখতে চায়। বড় বড় পাথরের, গ্রানাইটের চাঁই কুঁদে, বোধহয় তৈরি এ-দুর্গ। এখানে প্রহরীদের চোখে কোনো ভাষা নেই। নির্লিপ্ত, হিম-পড়া চাউনি। সেই চাউনি মনে পড়িয়ে দেয় বাবার চোখ। ভেতরে দীপাধারে জ্বলছে মোমের আলো। দীর্ঘ একটি বারান্দা, সুড়ঙ্গের মত।

'এলা'—বলে ডাক দিয়ে সে তুলে নেয় তার হাতখানা নিজের হাতে। তারা এসে দাঁড়াল একটি গালিচা বিছানো প্রশস্ত কক্ষে। আবলুশ কাঠের কারুকার্যময় আসবাব, কৌচ সেখানে। দেওয়ালে ঝুলছে নানা মৃত হিংস্র পশুর চামড়া ও মাথা। আর আছে ট্যাক্সিডার্মি করা চেনা-অচেনা মাংশসী পাখির অবয়ব। একটি দেওয়াল জুড়ে শুধু বিকট-দর্শন পীড়নের শস্ত্র। এই কক্ষে কোনও ছবি নেই, বই নেই। আগন্তুককে সন্ত্রস্ত, ভীত করে তোলাই যেন কক্ষটির জান্তব উদ্দেশ্য। এখানে কেউ দু'দণ্ড স্বস্তি পাবে না। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কোথায় দেখেছে সে এই দুর্গ, এই কক্ষ?

সে তার দুই হাতে বালার মত, শেকল বাঁধা হাতকড়া বেঁধে দেয়। এখন তাকে এই বন্দীত্ব মেনে নিতে হবে। পীড়ন তাকে নিতে হবে ধীরলয়ে। তার মসৃণ, আলো-পিছলে পড়া চামড়ায় নিতে হবে দংশন, তারপর চামড়ার প্রতিটি কোষ বেয়ে, প্রহত যাতনা মিশে যাবে রক্তকণিকায়। দংষ্ট্রার পশুবোধ বরং নির্মম ব্যাধের মত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, যতক্ষণ না ধ্বস্ত হচ্ছে তার সম্পূর্ণ প্রতিরোধ। সে তাকে মুহূর্তে সভ্যতার নিষেধের মোড়ক থেকে, সকল আবরণ থেকে উন্মোচিত করে, প্রচণ্ড আবেগে কাঁপা কাঁপা হাতে রচনা করতে থাকে একটি উন্মাদ পাশবিক যৌনাচার।

দুর্গের অন্তরালে তাকে সম্পূর্ণ পরাভূত হতে হয়। তার লুপ্ত বোধ যেই প্রত্যাগত হয়, অনুভব করে, একটি লুণ্ঠিত জীবনের পদমূলে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন লাজুক সম্ভ্রম, আত্মার মোড়ক, ইচ্ছার রঙীন রিবন; সেই রিবনের দ্বারা বাঁধা ছিল শৈশবে (তার স্মৃতি অনুসারে) প্রথম উপহার পাওয়া একটি খেলনা জলতরঙ্গ। একটি কাঠের দণ্ড ঘষে ঘষে সে নানা সুর তুলত। একটি চৈনিক কলম ছিল, সোনালি মুখের কলমটির ভেতরে ছিল ড্রপার, যা টিপে কালি ভরতে হত। একটি পুঁতি বসানো ব্যাগ; যা ছিল তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের আধার। একটি ক্যালিডোস্কোপ। যার ভিতরে চোখ রাখলে নানা রকম বর্ণবিন্যাস দেখা যেত। সবশেষে তার প্রাপ্তির তালিকায় ছিল একটি ডায়েরি। যে-ডায়েরিটি নানা সংকেতে তার মনের কথা আগলে রাখত। তখন তার নবম-দশম শ্রেণী। ঐখানে, ঐ ডায়েরির পাতায় বুকভরা অক্ষরে তার মন খুলে যেত। ডায়েরিটির নাম ছিল জাদু-ঘর। বাদামী রঙের শক্ত মলাট ছিল একটি দরজার মত। দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ মাত্র টের পেত তার হয়ে ওঠা; প্রজাপতির মত সেই হয়ে ওঠা, নিজস্ব ভুবনে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে, দাদা সেই ডায়েরি পড়ছে। তারপর তার চোখের সামনে প্রচণ্ড ক্রোধে, টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল ডায়েরিটা, ছেঁড়া অক্ষরগুলো তার পায়ের কাছে পড়ে ছিল। বড় হবার পর, সেই প্রথম তার চোখ থেকে বেদনার অশ্রু নির্গত হয়। আর দাদা শিহরিত হচ্ছিল এই ভেবে, তার ভিতরে এতসব গোপন অভিলাষ দানা বাঁধছিল, স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে, যা কেউ টের পায়নি। বাবা জানতে পারেননি। মাকে বলা হয়েছিল, তাকে চোখে-চোখে রাখতে। যেন সে ডায়েরি না লেখে, পড়ার ক্ষতি করে। যেন অক্ষরে মুক্তি না দিলে, তার সেই অভিলাষ—গোপন, স্বাধীন, স্বতন্ত্র—আর জন্ম নেবে না। আজ তার মনে পড়ে সেই গাছটির কথা, যার বল্কলে খুঁচিয়ে দিলে, পরদিন দেখা যেত, সেই ক্ষতস্থানে শক্ত আঠালো রস জমাট বেঁধে আছে।

১.

আখ্যানের এই বর্তমান অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে আমার। কোনও আখ্যান যতই তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে, কথককেও পৌঁছাতে হয় একটি মীমাংসার দিকে। সেই মীমাংসাসূত্র রচিত হতে থাকে অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক উপাদানের উপর ভিত্তি

করে। প্রায় দুই দশকেরও আগে, একজন আমাকে বলেছিলেন—আজকের কথাসাহিত্য পাঠ করে চিনতে পারি না, সাহিত্যের এই চরিত্রগুলো কোন দেশকালের অন্তর্গত। তখনও সোভিয়েত অটুট। আজকের তথ্য-প্রযুক্তি হাতের মুঠোয় আনেনি গোটা পৃথিবীকে, আজকের মত। এখন তো বরাক-ব্রহ্মপুত্রের সাথেও বারাক ওবামার স্বার্থ জুড়ে যাচ্ছে। আবার, উত্তর কাছাড় বা কার্বি আংলং-এর সাথে দিসপুরের দূরত্ব বেড়ে যায়, রচিত হয় অনতিক্রম্য মানসিক বিভাজন। সেই মানুষটি আমাকে খুব আশাহত এবং আন্তরিক কণ্ঠে বলতে থাকেন—আজকের এই সব কথাসাহিত্যের উচ্চভাব, মহৎ আদর্শের প্রতিফলন নেই। এমন সাহিত্য আজ রচিত হচ্ছে না, যা পড়ে মানুষ প্রাণিত হতে পারে। জীবনে জীবন যোগ করতে পারে, শাশ্বত সৌন্দর্যের বোধে নিজেকে আলোকময় করতে পারে। তার বদলে শুধু রচিত হচ্ছে, ব্যক্তির ক্ষুদ্র দুঃখ-বেদনার সাতকাহন, যার সাথে বৃহত্তর সমাজ-বাস্তবের যোগসূত্র নেই। আমার মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ। জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে যে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। একে একে আরও অনেক কিছু মনে পড়ে যায় ... ... যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক, তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল যতই আঁট হয়—হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া ওঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন। সাহিত্যই মানবহৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ।

সময়ের এতটা ব্যবধান অতিক্রম করে, সেদিনের সেই কথাগুলো, তাৎক্ষণিক রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে যাওয়া—ফের আজ এই আখ্যান-ভাবনার আনাচে-কানাচে ডানা মেলে উড়ছিল। উড়ন্ত পাখিকে খাঁচায় পোরার মত, ভাবনাকে, স্মৃতিকে অক্ষরবদ্ধ করা যায়। অতঃপর, আখ্যানের এই স্পেসটুকু জুড়ে, লিখে ফেলি উড়ন্ত পাখিটিকে। তারপরই মনে হয়, শিল্প কী তবে জীবনের সু-উচ্চ মিনার। যার চূড়া ঘিরে উড়ে যাবে পারাবত-দল। কখনও নিজের ব্যক্তিজীবন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, নিজেরই দগ্ধ-পোড়া মনকে লিখে দিয়েছি। আর রচনা করে গেছি বাস্তবের সাথে কল্পিত আমির অলীক ব্যবধান। কেউ পাঠ করে বুঝতে পারেনি, আমার গুপ্ত-দহন-রোগ। আখ্যানের অন্তরালে। আমি রয়ে গেছি এক সামাজিক সারস। আমি তবু নিজেকে খানিকটা মুক্তি দিতে পেরেছি, স্বস্তি লাভ করেছি অক্ষরের আশ্রয়ে। ওই অক্ষরমালাই কি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, যাকে তিনিই রচনা করে গেছে আমৃত্যু, আজীবন। কোন সত্য জীবনকে ঘুণপোকার মত কুরে খায়। কোনও স্থিরসত্যে আমরা উপনীত হতে কি পারি শেষ পর্যন্ত। অনেকগুলো সমান্তরাল জীবনে কী আমরা বাঁচি না। শুধু দায়হীন জীবনরেখাগুলোই একদিন মিথ্যে বলে মুছে যায়।

অর্পিতাকেও অনামিকা সৃষ্টি করেছিল ছলনার জালে। হাঁফিয়ে ওঠা এক বেঁচে থাকার করুণাধারা সে খুঁজেছিল অর্পিতার সত্তার ভিতর দিয়ে। ক্রমেই টের পায়, এই দায়হীন শব্দমালা,

স্ক্র্যাপবুকে লিখিত আবেগ, প্রতিবাদ, কাম—সবই নিরক্ত, অসাড় ঠেকতে লাগল। তার হাতে আসে একটি মোবাইল। আর আচমকাই রঞ্জনের সাথে তার পড়ে থাকা, স্থবির গার্হস্থ্য সময় সজীব, সচল হয়ে ওঠে। সেই জলতরঙ্গে সুর ওঠে। পারস্পরিক বিশ্বাস জন্মায়, খুঁজে পায় সম্পর্কের আধার। রঞ্জন অনামিকার হাতে ভাইফোঁটা নিল। নিজের দাদার প্রতি আজও একটা অন্ধক্রোধ, ভারী পাথরের অভিমান হয়ে পড়ে রয়েছিল বলেই বোধহয়, (এটা আমার অনুমান) রঞ্জনকে নিজের ছোটবাই ভেবে সুখ পেত। তাকে প্রশ্রয় দিত, সব ছেলেমানুষি আবদারকে উস্কে দিত। প্রয়োজনে দায় বহনেও পরাঙ্মুখ ছিল না রঞ্জন।

ওদিকে শ্রীবাসের স্বামীত্ব ভদ্রতার আড়ালে গোপনে ক্ষুব্ধ, সন্দেহপ্রবণ থাকলেও, ভাইফোঁটার সামাজিক আবহে আশ্বস্ত হয়। শ্রীবাস নিশ্চিন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওষুধের বাজার দখলের লড়াইয়ে। যে-ওষুদ আরোগ্য দেয়, আয়ু দেয়, তার বিপণনে কত বিষাক্ত, রক্তাক্ত রণকৌশল জুড়ে থাকে। তার বহুজাতিক কোম্পানিটির কত ওষুধ নিবিদ্ধ হয়ে আছে উন্নত বিশ্বে। আর সেই ওষুধই কিনা সে বিপণন করছে এখানে। শ্রীবাস জানে, এই পেশায় ভাবালুতার ঠাঁই নেই। তুমি কোম্পানির বিশ্বস্ত শিকারী কুকুর হও। কোম্পানি তোমাকে মাংস-অণ্ডর নিয়মিত যোগান দিয়ে যাবে। ওষুধের ডিলাররা, ফার্মেসির মালিকরা, যেখানে ডাক্তারবাবু বসেন, জানে এই ডাক্তারবাবু শুধু তার কোম্পানির ওষুধই লেখেন। এর পেছনে আছে জটিল লেনদেন। স্টকিস্ট বোম্বে গিয়ে শাহরুখের সাথে ডিনার করল। ডাক্তারবাবু পুজোর চারদিন মরিশাস। সপরিবারে। এটা টোপ। ক্রমে আরও মরিশাস, আরও ডিনার উইথ শাহরুখ। ওষুধের দাম চড়তে থাকে। তবু বাজার দখলে থাকে।

কিন্তু সেই ঘটনার পর, শ্রীবাস কি পারবে আর আগের মত নিশ্চিন্ত থাকতে? বাজারের জটিলতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে নাকি সে? শ্রীবাস জানে, অর্থই তার প্রতাপের উৎস। তার সুখের আধার। অনামিকা তার দুই পুত্রের জননী। আরামে থাকতে হলে, যা যা চাই, সব তার আছে। অতএব সে সুখতৃপ্ত। এর বেশি কী-ই বা মানুষের চাওয়ার আছে?

আমি ভাবছি, সেই ঘটনার পর, অনামিকার আর্ত হাহাকার কি আজীবন গুঞ্জিত হবে তার কানে? পারবে অনামিকায় লিপ্ত হতে? কারণ, কতকটা দিন, সে কিছুই বলতে পারবে না অনামিকাকে। শুধু দগ্ধ হবে গোপনে। কপালকুণ্ডলা পড়া থাকলে বলত—'আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল। আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।' রঞ্জন একসময় তার কোম্পানিতে ছিল। রসায়নে স্নাতকোত্তর প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি নেওয়া রঞ্জন দু'বছর কাজ করার পর চলে যায়, শিক্ষকতার পেশায়। অথচ, বিপণনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল। আগ্রাসী মনোভঙ্গি ছিল। খাটুনি নিতে পারত। ডাক্তারদের সাথে স্বাভাবিক ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়ে তুলতে পারত, নিজস্ব পেশাগত সম্ভ্রম বজায় রেখেও।

অনামিকার চরিত্রে কোনও দিনই দ্বিচারিতা নেই। আজীবন সে তার মায়ের সূত্রে প্রাপ্ত

জিন-বাহিত সরলতায় বিশ্বাসী। যে-সরলতাকে কেউ নির্বুদ্ধিতা বলে ভাবত। সুতরাং, এটা নিশ্চিত যে অনামিকা সমস্তই জানাবে শ্রীবাসকে। এখন তার মনের মধ্যে চলছে প্রচণ্ড তোলপাড়। রঞ্জন ফোন করেছে। সে কথা বলেনি। সেদিনের পর সে আর অর্পিতাকে খোলেনি। ডুবে গেছে, ফিরে গেছে নিজের অপূর্ণতায়।

একদিকে ভাঙন, অন্যদিকে পরস্পরকে আঁকড়ে জুড়ে থাকা—দু'য়ের মাঝামাঝি কিছু কি নেই?

অনামিকা, রঞ্জন ও শ্রীবাস—এদের জীবনে আজ আর শাশ্বত সুন্দর বলে কোনও ধারণা অবশিষ্ট নেই। আছে জৈবিক চাহিদার অনুযায়ী কিছু আবেগ। তাদের এই গড়পড়তা জীবন নিয়ে বলার মত কিছু নেই। অর্থাৎ তাদের কন্টেন্টে নতুনত্ব, অভিনবত্ব নেই কিছুমাত্র। এই আখ্যানের কাছে, তারা কথনভঙ্গির প্রতিস্পর্ধী, চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। আমি টের পাই, তাদের বেঁচে থাকাটা, জীবনের কন্টেন্ট একেবারেই মৃতকল্প, বিবর্ণ। একইসঙ্গে তারা জীবিত ও মৃত। তাই, কীভাবে তাদের কথা বলা হবে, সেটাই শিল্পের দায়।

খ.

সমস্ত দিন অসুখের আনাচে-কানাচে ঘোরাই শ্রীবাসের পেশা। যত বেশি অসুখ, তত বেশি সাফল্য তার দুয়ারে। তাকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয় একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার কোম্পানির বাজারের ওঠানামার দিকে। নজর রাখতে হয় অধস্তন, বিক্রয় প্রতিনিধিদের কাজকর্মের উপর; তাদের ব্যর্থতার দায় বর্তায় তার উপর। প্রায়ই তাকে দূর-দূরান্তে যেতে হয়। পরপর অনেকদিন থাকতে হয় বাড়ি ছেড়ে। সে জানে কোম্পানি তার দক্ষতায় প্রসন্ন। কোম্পানি একটি নিরেট দানবিক কাঠামো. এবং প্রসন্ন রাখা সহজ নয়।

সমস্ত দিনের ব্যস্ত, রণক্লান্ত যাপনের পর, রাতের খাবার অন্তে দু'পাত্র তরল পানীয় তার সব জড়তা হরণ করে। সে তখন ইন্টারনেটে কোম্পানির মুখ্য কার্যালয়ে নানা রকম প্রতিবেদন পাঠায়। সমস্ত ঘর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটি ঘরে মৃদু আলো জ্বেলে মাউস আর কীবোর্ডে কাজ করে চলেছে। মনিটরের আলোয়, তার মুখমণ্ডলে সাফল্য ও তৃপ্তির ছায়া উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাজ সারা হবার পর, সে ইতিউতি ভ্রমণ করে ইন্টারনেটের জগতে। মূলত, ওষুধ সংক্রান্ত ও ডাক্তারি বিদ্যার খবরাখবরই তার অনুসন্ধানের বিষয়। প্রয়োজনে তথ্যগুলো ডাউনলোড করে নেয়। আর কখনও সে দেখে, মনোরঞ্জনের জন্য, ভিডিও ছবির টুকরো সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট। ইচ্ছে মত বিষয় লিখে, খোঁজার নির্দেশ দিলে, লহমায় হাজির হাজার ছবির টুকরো মালা। উত্তেজক, প্রাপ্তবয়স্ক উপাদানও প্রচুর।

বাইরে জোর বৃষ্টি এল। আরেক পাত্র পানীয় তুলে নিয়েছে ঠোঁটে। বেশ একটা ঝিমঝিম ভাব ঘনাচ্ছে মাথার ভিতর, বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে, সে এই ওয়েবসাইটে উত্তেজনার খোরাক

সন্ধান করছে। পেয়েও গেল অনেকগুলো। পছন্দ হল না। ফের খুঁজতে লাগল। এবারের গুলো পছন্দ হচ্ছে। অধিকাংশগুলো গোপন ক্যামেরায় তোলা। ফলে, বাস্তব বলেই প্রতীত হচ্ছে। দেখতে দেখতে একটা ভিডিও ক্লিপিং-এ আটকে গেল চোখ। ক্লিপিংটা মোবাইল ক্যামেরায় তোলা। না—ইল্যুশন অ্যাণ্ড রিয়েলিটি—অ্যান আফটারনুন উইথ অর্পিতা।

কোনও একটি স্থানে ক্যামেরাটি স্থিত হয়ে আছে। ঘরটি জুড়ে আলো-অন্ধকারের আবছায়া। অর্পিতা নামের মেয়েটি এসে ঢোকে সেই ঘরে। তার মুখ তখনও স্পষ্ট দেখা যায় না। তারপর, ক্যামেরায় নীল শার্ট পরা ছেলেটিকে দেখা যায় পেছন থেকে এগিয়ে যেতে। সে হাত ধরে অর্পিতার। বসায় একটি সোফায়। শ্রীবাসের কানে হেডফোন। সে ভল্যুম বাড়িয়েও তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পায় না। একসময় ছেলেটি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটি ত্রস্ত উঠে দাঁড়ায়। চলে যেতে চায়। ফের তাকে মিনতির ভঙ্গিতে দু'হাতে ধরে আটকায়। এবার তাকে ক্যামেরার আরও কাছে এনে বসায়। সমস্ত দৃশ্যটি শ্রীবাসকে তাড়িত করে। টের পায় ধমনীর রক্তস্রোতে বহমান চাঞ্চল্য। এবার ছেলেটি ফের ছবির ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে দু'কাপ চা কিংবা কফি নিয়ে। তারা পেয়ালায় চুমুক দেয়। এরপর আবার সে আলিঙ্গন করে মেয়েটিকে। সে বাধা দেয় না। দু'হাত ধরে তাকে দাঁড় করায় নীলশার্ট। এবার তারা ক্যামেরার আরও সামনে। মেয়েটির সমস্ত প্রতিরোধ যেন ধ্বস্ত হয়ে গেছে। ক্রমেই সে আত্মসমর্পণ করছে নির্বিচার লুণ্ঠনের কাছে। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে দু'টি শরীর ঝপ্ করে লুটিয়ে পড়তে চায় সোফার প্রান্তে। আর মেয়েটি চকিতে, সমস্ত লুপ্ত চেতনাকে সংহত করে ঠেলে দেয় উন্মুক্ত পুরুষ শরীরটিকে। দ্রুত হাতে জড়ো করে নেয় পোশাক, আর আবৃত করতে থাকে নিজেকে। মেয়েটি ক্যামেরার উপস্থিতি বিষয়ে অসচেতন। দেখা যায় তার মুখ। মেঝেতে বসে আছে পুরুষটি। আর শ্রীবাসের হৃদপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে বুনো ঘোড়ার মত। কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অতিরিক্ত পানের ফল? এ কাকে দেখল সে? সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে এক গভীর সুড়ঙ্গে। উজাড় হয়ে যাচ্ছে তার দুনিয়া। উপড়ে নিয়েছে হৃদপিণ্ড। সে বসে থাকে সর্বস্বান্ত, অসহায়ের মত। জ্বলে উঠছে তার বুক। আরেকটু তরল আগুন ঢেলে নেয় কণ্ঠে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে মেয়েটি। আর আর্ত হাহাকার করে বলে—কেন এমন করলে রঞ্জন? আমি তো তোমার কাছে আসি দু'দণ্ড শান্তির আশায়।

এই হাহাকার, এই আর্তি, এই কান্নার রোল—তার বুকের ভিতর ঘূর্ণি তুলে আছড়ে পড়ছে। সে ভাবে, এ কী দেখলাম আমি? নাকি ভুল দেখলাম? কারণ, এরপর দৃশ্য বদলে যায়। আসে বার্লিনের ভাঙা প্রাচীর। লেনিন মূর্তির উৎপাটন। ধ্বংস হচ্ছে টুইন টাওয়ার। বোমার আঘাতে জ্বলছে বাগদাদ। আর শ্রীবাসের কানে অবিরত গুঞ্জিত হচ্ছে হাহাকার—'কেন এমন করলে? কেন এমন করলে? ... ...'

এরপর থেকে, এই দৃশ্য তার স্মৃতিতে অনামিকাকে করে তোলে এক ভারচ্যুয়াল মানবী। সে স্খলিত পায়ে এগিয়ে যায় শোবার ঘরের দিকে। কম্প্যুটারের দৃশ্যটি তখন স্থির হয়ে

আছে। থেমে গেছে বাইরের হাহাকার। নীলাভ নৈশবাতির আলোয়, সিলিং ফ্যানের বাতাসে ফুলে উঠছে মশারি। দেখা যায়, ঘুমন্ত অনামিকাকে। পায়ে পায়ে শ্রীবাস এগোতে থাকে অনন্ত ভারচ্যুয়াল জীবনের দিকে। হয়তো ভুল দেখেছে। ভুল শুনেছে। সবটাই কামনার অবদমিত বিকার।

আমরা জানি, একদিন এর মধ্যেই অনামিকা তাকে দেবে সেই চরম স্বীকারোক্তি। অস্তিত্ব অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বে সে এখন দুলছে। হয়তো সাহিত্যের মধ্যেই অনামিকা খুঁজবে তার আত্মমুক্তি। সময় তাদের দাঁড় করাবে এনে অন্য এক ভূখণ্ডে। তা নিয়ে আমাদের কোনও দায় নেই। অক্ষরের ভিতরেই আমরা তাদের মুক্তি দিলাম।

তপ্ত, গলন্ত লাভার মত একটি রাত গড়াতে থাকে। দেয় দুটি বহ্নিমান শরীর। শেষ শ্রাবণের প্রবল হাওয়ায় মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মত ফুলে উঠছে মশারিটা।

আমার মনে পড়ে যায়. 'হাওয়ার রাত' নামে কোনও কবিতা। এই আখ্যান এর কথামানব, কথামানবী, পরিণতি, অপরিণতি, ক্রোধ, বিষাদ. অবিশ্বাস, হাহাকার,—তাব সব অসঙ্গতি নিয়ে কবিতার কাছে, সুরের কাছে নিরুপায় আশ্রয় খোঁজে।

সৌমিত্র বৈশ্য

ঈশ্বরের সন্ধানে

আমরা যখন ঈশ্বরের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন চারদিক কালো হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় গাছের ডাল-পাতা থেকে হো-হো-হো (সা-নি-সা এইরকম সুর) আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটু আগেও আকাশে যেন চাঁদ ছিল। আর যেন ঝিকমিকে তারাগুলিকে কেউ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে উঠোনে—এমন একটা আকাশ ছিল।

এখন সে সব কিছুই নেই। এখন চারদিক কালো। থেকে থেকে আকাশ চিরে দেখা দিচ্ছে বজ্রের চমক। ঘূর্ণি বাতাসে আমাদের পোশাকগুলো বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। সাথে ধূলিকণা। আমরা হাতের তালুতে চোখ-মুখ ঢেকে, ডালপালার মতো কাঁপতে কাঁপতে এগোতে লাগলাম।

'ঈশ্বর তুমি কোথায়? আমরা তোমাকে খুঁজছি'—এরকম বলা যায় কি না, আমরা ভাবছিলাম। তারপর মনে হল—না, এটা বেশ নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের পছন্দ না-ও হতে পারে। ঈশ্বরের পছন্দ নয়, এমন কিছুই আমরা করব না (বা ভাবব না?) আমাদের মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে ঈশ্বরের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। আর ঠিক তখনই, অমোঘ ভাবে যেন, আমাদের মনে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গুন গুন করে বেজে উঠল—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।'

এবার আমরা বেশ খুশিই হলাম। এই গানটা ঈশ্বরের খুব পছন্দ হবে। এরপরই হঠাৎ মনে হল, এই মুহূর্তের সাথে মিলিয়ে গানটার কি লাগসই প্রয়োগ হল? 'অভিসার' শব্দটাই মনের মধ্যে অস্বস্তির মতো বিঁধে রইল। এ কি তবে প্রেমের গান? এ গান তো 'গীতবিতান'-এ প্রকৃতি পর্যায়ে সংকলিত। আমরা তবে, প্রেম না পূজা—কোন্‌টা দিতে চাই। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম—আমাদের মনে দ্বিধা জন্ম নিচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা কী করে ঈশ্বরের মুখোমুখি

হব? ক্রমে আমাদের সুরও নিবে এল। গতি শ্লথ, পদক্ষেপ অনিয়মিত।

এরকম আমরা কতসময় হেঁটেছিলাম, জানি না। একসময় আমরা অগুণতি গাছপালায় ঘেরা সেই বাড়িটি দেখলাম, আমরা সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আমাদের হৃদপিণ্ডে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। আমাদের পা-গুলো হারানো ছন্দ ফিরে পেল। হাওয়ায় আমাদের চুল উড়ছে। আমরা হাসতে হাসতে একটা গান ধরলাম—'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।'

জানালার কাঁচ দিয়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমরা সেই আলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। অবশেষে আমরা ঈশ্বরের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম, ঈশ্বরের বাড়ির নাম 'প্রতীক্ষা'।

দরজা বন্ধ। দেয়ালে কোনো নেমপ্লেট নেই; কিন্তু আমরা জানি, এ-বাড়িতেই ঈশ্বর থাকেন। দরজার এক পাশে ডোরবেল। তাতে আঙুল ছোঁয়ালাম। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরছে। লাল আলো জ্বলা ডোরবেল-এ আবার আঙুল ছোঁয়ালাম। এখন ঘড়ির মিনিটের কাঁটাও সরছে। আমাদের অধৈর্য আঙুল আবার ডোরবেল ছুঁতেই, দেয়ালে লাল আলোর অক্ষর ফুটে উঠল—'এখন বাড়িতে কেউ নেই।' এটা আসলে একটা ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড। এতক্ষণ আমরা এটা লক্ষ্যই করিনি।

তার মানে ঈশ্বর এখন বাড়িতে নেই। বাতাসের হো-হো-হো সুরটা আরও তীব্র হয়ে ফিরে আসছে। আকাশ চিরে আবার দেখা দিচ্ছে বজ্রের চমক। ফিরে আসার সময় আমরা ভাবছিলাম, তাহলে ঈশ্বর এখন কোথায়? আমরা যখন ঈশ্বরের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম, তখন আমাদের বিশ্বাস ছিল, যে ঈশ্বরকে বাড়িতেই পাব। ঠিক হল, আমরা আবার আগামীকাল আসব। আমরা একটু দ্রুত হাঁটছিলাম। শহরমুখো রাজপথে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। ঈশ্বরের দেখা না পাওয়া, আমাদের মনে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা জাগিয়ে তুলল। কারণ, দেখা হওয়াটা আমাদের জন্য খুবই জরুরি ছিল। জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে ফিরতে ফিরতে আমরা ভাবছিলাম শব্দ, রঙ ও সুরের কথা, আমরা ভাবছিলাম শব্দের বিশুদ্ধতম বিন্যাস, নির্ভার রঙের সমাহার কিংবা সুরের মায়াবী বিস্তার—এ সবের মাধ্যমে আমরা শেষ অবধি কোথায় পৌঁছতে পারি। জীবনের সব উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা কাটিয়ে কুয়াশার আবরণে মোড়া একটা শান্ত হ্রদের মতো হয়ে উঠতে পারি কিনা—এ প্রশ্ন ঘুণপোকার মতো আমাদের মনে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। আর সেই সব গর্ত দিয়ে কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল অজস্র পোকা। এই পোকাগুলোর গায়ে থিকথিকে পুঁজ ও রক্ত লেগে আছে। বেশ্যাল বিলোল কটাক্ষের মতো সন্ধ্যা নেমেছে শহর জুড়ে। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছে এ-শহরের যাবতীয় বিবর্ণতা।

আমরা ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কে গিয়ে একটা গাছের নীচে শানবাঁধানো বেদীতে বসি। অদূরে দ্বীপের মতো শহীদ বেদী। পাশের রাস্তা দিয়ে একটু এগোলেই ঝলমলে সব বিপণি, প্রেক্ষাগৃহের স্বপ্নপুরী। স্বপ্নের তারকারা সেই স্বপ্নপুরীতে দিনে চারবার নির্ধারিত

সময়ে আমাদের সামনে হৃদয়ের অর্গল খুলে দাঁড়ায়। আমরা তাদের সাথে হাসি, কাঁদি, রাগি, উত্তেজনায় সিটি মারি, কখনো ভিলেনের উদ্দেশ্যে মুখ খারাপ করি। তারপর তিনঘন্টার আশ্চর্য ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে নায়িকার কণ্ঠলগ্ন হয়ে শুয়ে পড়ি।

আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে নিজেদের পাল্টাতে চাই এবার। শব্দ, রঙ ও সুরের বিশুদ্ধ বিন্যাসে ভরে নিতে চাই আমাদের এ-জীবন। সকল মলিনতা, বিবর্ণতা থেকে বহু দূরে শান্ত হ্রদের মতো অচঞ্চল, আনন্দময় হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। আমার সঙ্গী ও আমি এসব নিয়েই আলোচনা করছিলাম। আমার সঙ্গী বলল, এ-শহরের জীবন বড্ড একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। এখানে প্রতিটা লোকই একই রকম ফাঁপা শব্দে কথা বলে।

আমি বললাম, ওদের কথাগুলো যেন সাবানের বুদ্বুদের মতো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে হাওয়াতেই মিলিয়ে যায়। আমি তো শুধুই ওদের ঠোঁট-নড়া দেখি। এমন বোবা শহর আর আছে কিনা আমি জানি না।

সঙ্গী বলল, এ-শহরের বাড়িগুলো দেখলেই আমার কবরখানার কথা মনে পড়ে যায়। আর লোকগুলো যেন অশরীরী আত্মার মতো শিল্পসুখের অতৃপ্তিতে ঘুরে মরছে। আর নারীগুলো যেন বিছানায় পাতা বোধহীন সাদা চাদরের মতো।

—আমি তখন চেয়ে থাকি দূরের বড়াইল পাহাড়ের দিকে।

—আমি চেয়ে থাকি মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারের দিকে।

এমন সময় পার্কের অন্ধকারতম প্রান্ত থেকে আদিম রিপুতাড়িত আবেগে কম্পিত নর-নারীর শরীরী আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। আমার সঙ্গী বলে ওরা হচ্ছে রাতের অশরীরী কুহেলি। এই রাতটুকুই, এই মুহূর্তটুকুই ওরা বেঁচে উঠবে শরীরের বাস্তব সংসর্গে। আর দিনভর পড়ে পড়ে ঘুমোবে। তখন ওদের দিকে তাকানো যায় না। চোখে পিঁচুটি, দাঁতে লালছোপ, মুখে বসন্তের দাগ।

—এরা তো আমাদেরই ঘর থেকে আসে। কী কদর্য এক মাংসলতায় থলথলে হয়ে পড়ল নারী ও পুরুষের সম্পর্কের গিঁট। আমাদের কৈশোর ও যৌবন যে গ্রাস করে নিল এক অন্তহীন শরীরী বুভুক্ষা। দু'দণ্ড শান্তির ঠাঁই আর কোথাও নেই।

আমার সঙ্গী চিৎ হয়ে সিমেন্টের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে। অসীম ক্লান্তিতে তার কণ্ঠস্বর মৃদু হয়ে আসে। একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে আমি চিৎ হই। শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখি, রাতের আকাশে অসংখ্য তারা। এখন আর আকাশে কোথাও মেঘ নেই। হালকা হাওয়ার প্রবাহে আমি ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগলাম।

"হ্যালো, হ্যালো, মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর ..."।

এরকম আওয়াজে আমার চেতনা ফিরে আসে। চোখ খুলতেই দেখি পার্ক জুড়ে অজস্র লাল পতাকা হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। একটু পরেই পিলপিল করে মানুষ আসতে থাকে মিছিল করে। তাদের মুখে শ্রমিক ঐক্য ও সংগ্রামের শ্লোগান। যদিও এরা ঠিক মজুর

শ্রেণীর লোক নয়। মজুর শ্রেণীর লোক যে-ক'জন ছিল, তারা সবাই পার্কের নানা কোণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। একসময় পার্কের একটা প্রান্ত ভরে উঠল স্কুটার ও মোটরসাইকেলে। ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে লোক মিছিল করে আসছে তো আসছেই। কেউ কেউ আসছে গান করতে করতে। শহীদ বেদীর পাশে খুব লম্বা একটা বাঁশের ডগায় রক্ত পতাকা উড়ছে। তাতে কাস্তে, হাতুড়ি, তারা আঁকা। গতকাল রাতেই আমি শুয়ে শুয়ে আকাশ ভরা তারা দেখেছিলাম, আর আজ আকাশের তারা, এ-মাটির কাস্তে ও হাতুড়ির মাথায় বাঁধা পড়ে গেছে। এর মধ্যে যেন একটি শিল্পের দ্যোতনা লুকিয়ে আছে। একটু পরেই বিশাল একটা মাইকে গাঁক-গাঁক করে কথা বলতে শুরু করল। চারিদিকে এতো লালের সমরোহ, দেখতে আমাদের ভালোই লাগছিল। অন্তত চারপাশের বিবর্ণতায় অভ্যস্ত চোখের পক্ষে বড্ড আরামদায়ক। একটা বাদামওয়ালা আমাদের চারদিকে ঘুরঘুর করছিল। দু'টাকার চিনেবাদাম কিনে, আমরা বসে বসে চিবোচ্ছি, আর মাইকের কথা শুনছি কিম্বা শুনছি না। শ্রমিক শ্রেণী, সংগ্রাম, শ্রমিক ঐক্য, শ্রেণী সংগ্রাম, বুর্জোয়া, সর্বহারা ইত্যাদি শব্দ আমাদের কানে বাজছিল। এত এত সুখী মানুষগুলো যে কেন তীব্র আক্রোশ বুকে পুরে রেখেছে, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। যে দু'চারজন রিক্সাওয়ালা, দিনমজুর শ্রেণীর লোক এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে উবু হয়ে বসেছিল, ওরা বরং কী রকম জবুথুবু ছিল। আমাদের কাছাকাছি দু'জন দাঁড়িয়ে দামী ফিল্টার সিগারেট টানছিল। ওরা একে অন্যকে কমরেড বলে সম্বোধন করে কথা বলছিল এবং অধিকাংশ কথাই হচ্ছিল নিজেদের কোম্পানির ওষুধ বিক্রির সমস্যা নিয়ে। একসময় ওরা চলে যায়। এরপর আরও তিনজন সেখানে এসে দাঁড়ায়। ওরা নিজেদের স্কুল ও কোনো এক মন্ত্রীর ব্যভিচার নিয়ে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একসময় ওরাও চলে যায়। এরপর আরও চারজন আসে। ওরা ওদের অফিসের অব্যবস্থা নিয়ে আলাপ করতে থাকে। একটু পরে ওরাও চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে একটি ভিখারী এসে সে জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে। ভিখারীটিব নোংরা পোশাক থেকে বোঁটকা গন্ধ ভেসে আসছিল।

একটু পরেই আমরা অনুপমদাকে দেখতে পাই। অনুপমদাও আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। অনুপমদা কলেজে ছাত্র রাজনীতি করত, এখন পার্টির সর্বসময়ের কর্মী। কতকাল পর অনুপমদা'র সাথে দেখা। সে আমাদের এখানে দেখে খুব উৎফুল্ল হয়। সে আমাদের বলে যে সে আমাদের এখানে দেখবে আশাই করেনি। আমরাও বলি যে এবাবে তার সাথে আমাদের দেখা হয়ে যাবে, তা আমরাও ভাবিনি। অনুপমদার সাথে একসময় আমাদের অন্তরের সম্পর্ক ছিল। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সে ছিল নিবিষ্ট পাঠক।

দু'চার কথার পর, পেশাদার মনোবিদের মতোই, অনুপমদা আমাদের মনের কথা টের পেয়ে যায়। আমরাও ধরা-পড়ে-যাওয়া আসামীর মতো ওর কাছে কোনো কথাই গোপন রাখি না, আমরা ওকে বলি, জীবন আমাদের কাছে বিবর্ণ ধূসর উদ্দেশ্যহীন, একঘেয়ে দৈনন্দিনতায় আমরা ক্লান্ত। আমরা চাই শান্ত হ্রদের মতো স্থিতধী জীবন। আমরা সেটাই

খুঁজতে বেরিয়েছি।

অনুপমদা সস্নেহে আমাদের করতল স্পর্শ করে বলে, 'আমিও তোমাদের মতো সে' জীবনই খুঁজছি। একা একা না খুঁজে, এসো, আমরা একসাথে খুঁজি।' আমরা সম্মোহিতের মতো অনুপমদার মুখের দিকে তাকাই। সে আমাদের বলে, তোমরা আসলে এই সমাজ-ব্যবস্থার শিকার। এই সমাজকে না পাল্টালে, জীবনে যে আনন্দময় বৈচিত্র্য তোমরা খুঁজছ, তা পাবে না। আমরা অনুপমদার কথার প্রতিধ্বনি করে বললাম, আমরা তাহলে এই সমাজকে পাল্টাব। আমরা আনন্দের মধ্যে বাঁচতে চাই। অনুপমদা বলে, তা'হলে তোমরা আমার সাথে এসো। আমরা ওকে অনুসরণ করি।

আমরা যখন অনুপমদার ডেরায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন চারিদিক বিকেলের রোদে সোনালী হয়ে এসেছে। শহরের একেবারে উপকণ্ঠে এই ডেরাটা। ভেতরে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, আসলে এটা একটা খামার বাড়ি। টিলা, জলাশয়, ধানক্ষেত, গোয়াল, পোল্ট্রি, বাঁশ, বেত, তাঁত—কী নেই। সৈন্যদের ব্যারাকেরই মতো একধারা লম্বা লম্বা ঘর, বিশাল হেঁসেল। অনুপমদাই বুঝিয়ে বলল যে এটা ওদের যৌথ খামার। এখানে যারা থাকে, তারা সমাজ বদলের প্রস্তুতি নিতেই এখানে জড়ো হয়েছে। এতসব লোকের স্বনির্ভরতার যোগান দিতে এই যৌথ খামারের আয়োজন। কঠোর অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলে এখানকার জীবনযাত্রা। এখানে সবাই কাজ করছে। অথচ আমরা কিছু না করে খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি—কীরকম যেন অস্বস্তি লাগত। অনুপমদা হেসে বলল—' পাবে, তোমরাও কাজ পাবে। ক'দিন সবুর করো।'

সবাই তো কাজে চলে যায়। আমরা আর কার কাজ ভাঙতে যাব। আমরা তাই চলে যেতাম নারীবর্জিত রান্নাঘরে। সেখানে হরিপদ আর শিবপদ'র সাথে আমাদের খুব ভাব জমে গেল। হরিপদ একসময় কবিতা পড়ত খুব। এখন আর পড়ে না। শিবপদ সিনেমা দেখত খুব। এখন আর দেখে না। অপসংস্কৃতি কীভাবে তরুণ সমাজকে অনৈতিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কীভাবে তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে বন্ধ্যাত্ব এনে দিচ্ছে—এ'সব খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিল হরিপদ। এমন সময় রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেণুপদ এসে রান্নাঘরে ঢোকে। তার সর্বাঙ্গ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। এই রোদের মধ্যে সারা খামার বাড়িটা ঝাঁট দিয়ে, আগাছা সাফ করে, এখন সে যাবে বাথরুম, পায়খানা সাফ করতে। এই কাজটা তার একদম পছন্দ নয়। কিন্তু পার্টির নির্দেশে এ'কাজটা তাকে করতেই হচ্ছে। এক গ্লাস জল খেয়ে, গ্লাসটা খট্‌ করে টেবিলের উপর রেখে সে চলে যায়। আমরা প্রশ্ন করি, যে কাজটা ওর পছন্দ নয়, সেটাই ওকে দিয়ে করানো হচ্ছে কেন? শিবপদ বলে, এভাবেই ওর অহংবোধটা যাবে। ব্যক্তির মর্জির চেয়ে পার্টির নির্দেশ বড়। হরিপদ বলে, ব্যক্তির চেয়ে পার্টি বড়। আমরা প্রশ্ন করি, এরপর যদি বেণুপদ বিরক্ত হয়ে চলে যায়? হরিপদ ও শিবপদ হাসে। হাসতে হাসতে বলে, যাবে না। অনেকগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই সে এখানে ঠাঁই পেয়েছে। আমার অবাক লাগে। কীসের পরীক্ষা? আমরা তো কোনো পরীক্ষা না দিয়েই দিব্যি এখানে

ঢুকে পড়েছি। হরিপদ বলে, পার্টি নিশ্চয় কিছু একটা বুঝে তবেই তোমাদের এখানে এনেছে। আমরা বললাম, আমরা তো কোনোদিন পার্টি করিনি। আর আমাদের তো এখানে নিয়ে এসেছে অনুপমদা। হরিপদ কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে, অনুপমদা আর পার্টি কি আলাদা? আমি সাথে সাথে জিজ্ঞেস করি, তাহলে বেণুপদ কেন পার্টির নির্দেশ মতো কাজ করতে অনিচ্ছুক? শিবপদ বলে, পার্টি আর ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি, পার্টির সাথে ব্যক্তি—এভাবেই দ্বন্দ্ব চলছে অহর্নিশ। হরিপদ বলে, এই যে আমি গরম কড়াইয়ে ঠাণ্ডা জল ঢালছি, এর মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে। গরম ও ঠাণ্ডার দ্বন্দ্ব। তবে দ্বন্দ্বটাই শেষ কথা নয়। এরপর ঐক্যও আছে।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। শহর থেকে অনেকটা দূরে এই খামার বাড়িতে আমাদেব সময় কাটত ধীর, মন্থর লয়ে। টিলার উপর বসে দেখতাম ডুবন্ত সূর্যের অপরূপ আভা। দেখতাম কী মন্থর ছন্দে তার রঙ বদলায় প্রকৃতি। চারদিকের নির্ভার নৈঃশব্দ আমাদের মনে জাগিয়ে তুলত বিচিত্র এক সুরের আভাস।

একদিন অনুপমদা এসে বলল, আজ একটা কাজ করতে হবে। শুনে আমরা ভীষণ উৎফুল্ল হই। অনুপমদা বলে, শহরে ছাত্র-যুবাদের একটা সমাবেশ হবে। ছেলেরা কাজ পাচ্ছে না. ঘরে ঘরে সবাই বেকার বসে আছে। সরকার কাজ দিতে পারছে না। নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। মানুষের কাজ মেশিন দিয়ে করাচ্ছে। মাদকের নেশা করিয়ে, অপসংস্কৃতির ঢল নামিয়ে যুব সমাজকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে এই সমাজব্যবস্থা। এ সবের বিরুদ্ধে সমাবেশ হবে। এই সমাবেশে ছাত্র-যুবাদের যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে লিফলেট লিখতে হবে।

কাজটা যতো সহজ মনে হচ্ছিল, ততো সহজ তা ছিল না। আমরা কিছুতেই সমাজের কদর্যতাকে অক্ষরের বিন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে পারছিলাম না। এরকম অভিজ্ঞতা আগে আমাদের হয়নি। আমরা বিশ্বাস করতাম, শব্দের নির্ভার বিন্যাসে। কিন্তু অনুপমদা আমাদের বোঝাল, যতোদিন সমাজের অসাম্য দূর হবে না, ততোদিন শব্দকেও ভার বইতে হবে, সাম্য প্রতিষ্ঠার দায় নিতে হবে। তা না হলে শব্দ হবে ফাঁপা, অন্তঃসারহীন। বহু চেষ্টার পর আমাদের রচিত লিফলেটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল।

সমাবেশের আয়োজন চলছে। অনুপমদা ভোরে উঠে শহর চলে যায়। ফেরে অনেক রাতে। হরিপদ আমাদের বলে, আন্দোলন হলে সংগঠন বাড়ে। কিন্তু যখন কোনো আন্দোলন থাকে না, তখন সংগঠন টিকিয়ে রাখা ভীষণ কঠিন। স্থবিরতা এসে যায় সংগঠনের হাড়ে। এর মধ্যে খবর আসে সমাবেশে শান্তিদা আসবেন। শান্তিময় সেন একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করে, দশ হাজার টাকার চাকরি অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছেন। শিবপদ আমাদের বোঝায় কত বড় মন থাকলে, আজকের দিনে কেউ এরকম একটা চাকরি ছেড়ে দিতে পারে! হরিপদ'র স্বেদ-চকচকে মুখে শান্তিদার গল্প শুনতে শুনতে দুপুর গড়িয়ে যায়। আমরা শান্তিদাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠি।

সমাবেশের আগের সন্ধেবেলা, শান্তিদা এসে পৌঁছান। কথাবার্তায় ভীষণ সপ্রতিভ, আন্তরিক। দু'মিনিটেই আমাদের ভালো লেগে যায় শান্তিদাকে। সেদিন মাঝরাত অবধি শান্তি আমাদের সাথে দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে গল্প করলেন। আমি ছবি আঁকতে পারি শুনে ভ্যান গখের গল্প বললেন। 'লাস্ট ফর লাইফ' পড়েছি কি না জানতে চাইলেন। তারপর বোদলেয়ার হয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এসে শেষ হল কথা। গভীর রাতের নির্জনতায় অনুচ্চ স্বরের কথাগুলো যেন শীতরাতে গাছের পাতা খসার মতো টুপটাপ ঝরে পড়ছিল। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি একসময় ঘুমের চাদর বিছিয়ে দেয় শান্তিদার চোখে। নিঝুম রাতে তখন দূরে কোথাও রাতজাগা পাখি ডাকছিল, আর ছিল ঝিঁ-ঝিঁ-র অর্কেস্ট্রা।

সমাবেশের পরদিন শান্তিদা আমাদের নিয়ে বসলেন। একটু আগেই বেণুপদর সাথে রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়েছে। রুদ্ধদ্বার হলেও শব্দ তরঙ্গকে তো রোধ করা যায় না। আমাদের কানে এলো, শান্তিদা বলছেন, বই পড়ো, তত্ত্ব পড়ো না বলেই তোমার এসব সমস্যা হচ্ছে। পার্টির বইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখো। সামনের বার এসে যেন দেখি, তুমি এসব ত্রুটি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছ। শান্তিদা আমাদের বললেন, এই যৌথ খামার হচ্ছে বিপ্লবী গড়ার কারখানা। এখানে থাকতে হলে কিছু যোগ্যতা প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি তোমাদের সে যোগ্যতা আছে। কিন্তু যোগ্যতার প্রমাণ তো দিতে হবে। দলের ছেলেদের সাথে মিশে, পথে পথে কাজ করতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে নিজের বিশ্বাসকে। আমরা জানতে চাই যে কী কাজ আমাদের করতে হবে। শান্তিদা বললেন, যখন যা পার্টির নির্দেশ থাকবে, তখন সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। আর না হলে নিজের কাজ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে।

এমন সময় বেণুপদ এসে বলল, শান্তিদা আপনার চানের জন্য গরম জল রেখেছি বাথরুমে। শান্তিদা একটা ফিল্টার সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়লেন। যাবার সময় অনুপমদাকে বললেন, অনুপম, আমার জন্য একটা প্লেনের টিকিট করে এনো। এতো লম্বা বাস-জার্নি পোষায় না। কী, পারবে তো? অনুপমদা সানন্দে রাজি হয়। অনুপমদা চলে যায় টিকিট করতে। হরিপদ শিবপদ শান্তিদার জন্য আজ মাংস রাঁধছে। শিবপদ সব সময় শান্তিদার পেছনে ছায়ার মতো খাড়া।

জনশূন্য বারান্দায় বসে আমরা ভাবছিলাম শান্তিদার কথা। আমাদের কাজের কথা। এবার আমাদের পথে নামার পালা। হঠাৎ মনে হল, এখানে সবাই যেন যে যার খাঁচায় ঢুকে গেছে। সবাই যেন কত দূরে। আবার মনে হল, এ আমাদের মনের ভুল। আমরা পায়ে পায়ে বারান্দা ছেড়ে পথে, তারপর খামারবাড়ি ছেড়ে শহরের এক চৌমাথায় এসে দাঁড়াই। বিবর্ণ শহরটা ধুকপুক করে চলছে। আমাদের চারদিকে এখন চারটে পথ। আমরা পরস্পরের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাই। এবার আমরা কোন্‌দিকে যাব?

পরম ভট্টাচার্য

বাঁক

বিমলজ্যোতির হাতে ওকেন-গ্লো'র লার্জ পেগ। নিজের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সুরম্য ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টিটা তিনি সামনে মেলে ধরেন। চওড়া ঝকঝকে মোরাম বিছানো রাজপথ। রাস্তার দু'পাশ থেকে নুয়েপড়া কৃষ্ণচূড়ার বোবা ঝাড়ের আবছায়ার সঙ্গে সোডিয়াম আলোর খেলা দেখছেন। বিমলজ্যোতির এটা নিত্যদিনের কাজ। মানুষটা স্বাস্থ্য সচেতন। ওকেন গ্লো বা ওই জাতীয় কিছু দিলে, বড়জোর লার্জ তিন পেগ।

এই যে তিনি ফাইভ ফাইভ ফাইভ শুষছেন আর ধোঁয়া ছাড়ছেন—সেটা এখন দৈনিক চারটায় দাঁড়িয়েছে। আগে প্রচুর সিগারেট টানতেন বিমলজ্যোতি। কলেজ বা কলেজ পরবর্তী সময়ের কথা। পকেট তখন নির্ভেজাল গড়ের মাঠ। কি পরিমাণ বিড়ি আর চারমিনার যে খাওয়া হত! পয়সা যোগাতেন সেই গৌরী সেন।

বেতের ঝুলন্ত চেয়ার থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান বিমলজ্যোতি। অপরপ্রান্তে রাস্তার সামনের যে বাঁকটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এখন সেই বাঁকটা তাকে অস্বস্তি দেয়। সেই বাঁকটায় গিয়ে তাঁর দৃষ্টি থেমে যায়। প্রতিদিনই চেষ্টা করেন সেই বাঁক ছাপিয়ে অন্য বাঁক অবধি দৃষ্টিটাকে নিয়ে যেতে। বাঁকের ওই জায়গাটা রাস্তায়, কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়ে, সোডিয়াম আলো আর ধূসর অন্ধকারে মিলেমিশে গিয়ে একাকার হয়ে আছে।

সেখানে চোখ রেখে গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বিমলজ্যোতি। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়াটা ফুঁ করে ওই জায়গাটাকে উদ্দেশ্য করে ভেসে যেতে দেন।

বিমলজ্যোতির বয়স বাহান্ন। সুঠাম পেশীর দীর্ঘদেহী শরীর। ক্লিনশেভ। সুন্দর করে ছাঁটা চুল।

ফ্যাট, কোলেস্টেরল, ডায়বেটিস, বিপি—এসব ব্যামোর তাঁর নেই প্রতি সন্ধ্যেতে দু'ঘন্টা জোরে হাঁটেন। সকালে হাঁটেন নিজের বাগানে। বুকের বাঁদিকে হালকা একটা চিনচিন কাঁপুনি আর ব্যথার মিশ্র অনুভূতি হয় মাঝেমধ্যে। মদ, সিগারেট তিনি নিজেই কমিয়ে দিয়েছেন বছর দুই থেকে। চাকরির প্রথম দশ বছর খুব অনিয়ম গেছে বিমলজ্যোতির। বিবাহিত-অবিবাহিত বলে বিমলজ্যোতির জীবনে আলাদা কোনো হিসেব নেই। বউয়ের কথা মদ-সিগারেট ছেড়ে দেওয়া বা ভুঁড়ি কমাবার লোক তিনি নন। আত্মসচেতন, স্বাস্থ্য-সচেতন বিমলজ্যোতি এটা বোঝেন যে কৈশোর থেকে প্রথম ভরা যৌবন পর্যন্ত উড্ডীন অনিয়মে কাটানোর একটা শারীরিক জবাব আছে। শরীর নিরুপায় হয়েই তার নিজের উপর বয়ে যাওয়া ঝড়ের ধকলটা স্মৃতিতে রাখতে বাধ্য হয়। শরীরের নাম মহাশয় নয় মোটেই। তার বিষয়-আশয় জ্ঞান যথেষ্টই আছে।

মদের গ্লাসে হালকা চুমুক দিয়ে সিগারেটে মনের মত টান দিয়ে তার পছন্দের রাস্তাটা দেখছিলেন বিমলজ্যোতি। সত্যি, কৃষ্ণচূড়ার মত আদুল গায়ের গাছ খুব কমই হয়। এই প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার পাশে কৃষ্ণচূড়া, জায়গাটার পরিচ্ছন্নতা, রাস্তার দু'পাশে আধুনিক স্থাপত্যের আরো কয়েকটি বাংলো বাড়ি, নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়ে জায়গাটা খুব মনে ধরে গিয়েছিল বিমলজ্যোতির। বছর পাঁচেক আগের সেই দিনটির কথা মনে হলে ভীষণ পুলকিত হয়ে পড়েন তিনি। তন্দ্রার সঙ্গে কোনো কথা না বলেই বত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে জায়গাটার বায়না হয়েছিল। যেদিন মনে ধরেছিল সেদিনই কাজটা অনেকখানি এগিয়ে ফেলেছিলেন বিমলজ্যোতি। তারপর পর্যায়ক্রমে চারটে পার্টিকে টাকা সংগ্রহের জন্য আন-অফিসিয়াল নোটিশ জারি, জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ, উকিল-মোক্তার সবকিছু অত্যন্ত দ্রুত সেরে নিয়েছিলেন বিমলজ্যোতি। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ—এই হচ্ছে তাঁর কথা। একে জিজ্ঞেস কর, ওকে জিজ্ঞেস কর, প্ল্যান কর, গোছাও, আর সব শেয়ালের যেমন এক রা—'বউকে এনে দেখাও' এসব বিমলজ্যোতির ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। এই বৈকুণ্ঠে জমি যে পাওয়া গেছে সেটাই তো পাঁচপুরুষের পুণ্যির ফল। সত্যি কথা বলতে কি, মধ্যবিত্ত হাড়-হাভাতে ফ্ল্যাটমেটদের দেখতে দেখতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

মাত্র কয়েকটি লাখ টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, কিছু পোশাক-আশাক আর চেহারার মাঝারি চেকনাই এইসব নিয়ে এমন এক ঘ্যামায় এরা ফ্ল্যাটে থাকে যে মনে হয় এককেটি আম্বানি, মিত্তাল! দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কারো সঙ্গে নীচের গ্যারেজে কদাচিৎ যদি দেখা হয়ে যেত তাহলে গোটা দিনটাই অপয়া মনে হত বিমলজ্যোতির। এই শহুরে হাভাতেগুলোর কোনোকিছু করার মুরোদ নেই। দেখা হলেই পথ-ঘাট-বিদ্যুৎ-জল-জেনারেশন এইসব উৎকট সমস্যা নিয়ে জোঁকের মত লেগে কথা বলবেই বলবে। দুর্নীতি রাজনীতি ইত্যাদি হলে তো আর কথাই নেই। একেবারে কাছা খুলে পেছনে লেগে যাবে। বিমলজ্যোতি নিজের অফিসে দেখেছেন এই জাতটি কী দক্ষতার সঙ্গে অফিসের মূল কোরাপ্ট কাঠামোটাকে ধরে রাখে। পুরোদস্তুর

একটা মোসাহেব জাত। সবসময়ই রাজা উজির হওয়ার তালে থাকে কিন্তু সাধ্যে বা সাহসে কুলোয় না।

বিমলজ্যোতির ফ্ল্যাটে দু'জন অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় ছিলেন। সময়কালে এই দুই মহামতি দু'হাতে কামিয়েছেন। এখন সংসার-টংসার গুছিয়ে অখণ্ড অবসরে এই দু'জনের যে কোনও একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আর উপায় নেই। ওদের দুর্নীতি বিরোধী কথা শুনে বিমলজ্যোতির মনে হত তক্ষুণি ওরা জওহরলাল নেহরু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হয়ে সমস্ত দুর্নীতিবাজকে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবেন। এইসব সামাজিক ছেনালি বিমলজ্যোতি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। মুখে কিছু বলতেন না। গান্ধীর একটা পরামর্শ তিনি মনে রাখার চেষ্টা করতেন। অ্যাটাক করো না, ইগনোর করো। এই চিন্তাটার মধ্যে অবহেলা ও অবজ্ঞার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে তাচ্ছিল্য করার রসদ পেতেন তিনি। গান্ধীর কাছে প্রতিপক্ষ বলতে কেউ ছিল না। সেটা গান্ধীর ব্যাপার। কিন্তু ইগনোর করার ব্যাপারটি দারুণ। আবার কাউন্টার অ্যাটাক থিয়োরি যত্রতত্র যথেচ্ছ ব্যবহারে জীর্ণ করে দেবার পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না। ফ্ল্যাটের কারো কোনো কথায় বিমলজ্যোতি ঠোঁট খুলতেন না। ওদের তিনি প্রাণপণে ঘৃণা করতেন।

মুখ না খোলার অন্য একটা কারণও ছিল। বিমলজ্যোতি ছিলেন ওই হাউসিং কমপ্লেক্সের, যাকে বলে, 'ওড ম্যান আউট'। নিজস্ব বাংলো বাড়িতে যাওয়ার আগেকার ট্র্যানজিট ক্যাম্প ছিল ফ্ল্যাটটা। কমপ্লেক্সের সবচেয়ে বড় ও দামী ফ্ল্যাট। বাকি যারা ওই কমপ্লেক্সে ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের অবস্থানের মধ্যে কমবেশী একটা সামঞ্জস্য ছিল। বিমলজ্যোতি বুঝতেন, এই মাঝারি-বিত্তের দামড়াগুলো সুযোগ পেলেই এককাট্টা হয়ে তাঁকে টাইট দিলে তৃপ্তি পাবে। এইসব ঝামেলা পাকিয়ে এদের সামাজিক মনোবাসনা পূরণের কোনো ইচ্ছে তাঁর ছিল না। তাই তিনি গান্ধীকে স্মরণ করতেন।

তাঁর স্ত্রী তন্দ্রা আর ছেলে বাবু খুব মিশুকে।

কাজে ব্যস্ত বিমলজ্যোতি এইসব মেলামেশার সংবাদ পেলে মা-ছেলে দু'জনকেই বলতেন—তোমরা কিন্তু মনে করো না যে আমি মেলামেশার পক্ষপাতী নই। আমি নিজেও মিশুক। তার মানে কি মেলামেশায় বাছ-বাছাই থাকবে না? এই যে যারা এই ফ্ল্যাটে থাকে, এদের যে জাতটা—তারা নিজেরা সমস্ত কিছুতে ছোট হতে থাকে আর অন্যদের ছোট হতে শেখায়। ভারী হীনমন্যতা আর উচ্চমন্যতা। ওদের যত কাছে তোমরা যাবে শুধু সংকীর্ণতার পাঁকে ডুবে যেতে থাকবে। এরা নাইদার ইনডিভিজুয়্যাল, নর সোস্যাল, দে আর অলওয়েজ ডুয়্যাল অ্যাণ্ড ড্যুবিয়াস।

বিমলজ্যোতির হাতে পেগ। এইসব কথা বলতে বলতে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন একদিন। ছেলে কিংশুক মাথা নীচু করে বসে আছে। স্ত্রী তন্দ্রা স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। গ্লাসে চুমুক দিয়ে তারপর বিমলজ্যোতি একটু সুর বদলে বলেন, তার

চাইতে কাজের মানুষ বা ওই পাশের বস্তিবাড়ির লোকজনের সঙ্গে একটু মিশো গিয়ে। দ্যাট উইল বি অ্যান অ্যাসেট। ওরা সমাজের নেসেসারি ইভিল। তলানি খুঁজতে গিয়ে তলানি তো অন্তত পাবে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত জাতটির মধ্যে না পাবে তলানি, না কিনারা, কিচ্ছু না। সুতরাং প্লিজ ... ...।

বিমলজ্যোতি কথা শেষ করার আগেই কিংশুক ধীরপায়ে সেখান থেকে উঠে গিয়েছিল।

তন্দ্রা বিমলজ্যোতিকে থামিয়ে বলেছিলেন, তুমি নিজেকে নিয়ে আছো তাই থাকো না। আমরা, আমাদের সবকিছু তোমার কথায় চলতে পারে না। ছেলে তো দেখতেই পাচ্ছো উঠে গেল। আরও দূরে চলে যাবে। আমার আর কি ... ...।'

বিমলজ্যোতি রাগ ও কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন,

—'তোমার আর কি' মানে? এ আবার কিরকম কথা হল? তুমিও যাও। যেথা মন যায় চলে যাও।

তন্দ্রা এতক্ষণ বসেছিলেন। লম্বা ডাইনিং হল। বিমলজ্যোতির বিদ্রুপমাখা চোখের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে উঠে দ্রুত পায়ে হলের অন্যমাথায় চলে গেলেন। সেখানে শব্দহীন শব্দে একটি ঢাউস টিভি চলছে। ওই জায়গাটায় হাল্কা আলো। দেয়ালে মাটিতে ভেঙে ভেঙে টিভির ছবিগুলো আলো অন্ধকার হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সে জায়গাটা পেরিয়ে তন্দ্রা সশব্দে বিশাল বড় জানালার পর্দাটা একটানে একপাশে সরিয়ে দিলেন। শব্দটা চাবুকের মত বিমলজ্যোতির বুকের বাঁদিক ঘেঁষে চলে গেল। জানালা দিয়ে বাইরের দমকা বাতাসের ঢেউ এসে তন্দ্রার শরীর মনকে আলুথালু করে দিয়ে গেল। বিমলজ্যোতি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে বুকের বাঁদিকে হাত রেখে তন্দ্রাকে দেখছিলেন। আজ তন্দ্রার চুল, শাড়ি, শরীর আদল সমস্তই যেন বেপরোয়া লাগছে তার কাছে। যেন সাক্ষাৎ অশরীরী।

বিমলজ্যোতির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বুকে শব্দ। হাত পা যেন চলৎশক্তিহীন। একেই কি ভয় বলে? পুলিশের তাড়া খাওয়ার সময় ঠিক এরকম অনুভবই যেন তার হত। তিনি কি খুব ভীতু?

হাউসিং কমপ্লেক্সের গ্রাউণ্ড ফ্লোরের গ্যারেজে যখনই কেউ বিমলজ্যোতিকে বিরক্ত করত, তখন তিনি ঠোঁটে হাসির রেশ বজায় রেখে অল্প মাথা দোলাতেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে সেঁধিয়ে যেতেন। কথা বলছিল যে লোকটি সে বাইরে 'হাঁ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। বিমলজ্যোতি কোনো সৌজন্য প্রকাশ করতেন না। ভুঁউস্ করে গাড়িটা বেরিয়ে যেত। ড্রাইভার যাতে কিছু না বুঝতে পারে সেটা মাথায় রেখে তিনি অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় এক লহমায় ঘাড়টা ঘুরিয়ে বাইরে 'হাঁ' হয়ে থাকা মূর্তিটাকে কটমটিয়ে দেখে ভাবতেন, এইভাবে 'হাঁ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো সারাটা জীবন। দ্যাখো আমাকে। আমি চল্লাম। টা-টা।

জমিটা দেখার পর দাঁতে দাঁত লাগিয়ে আরও বেশ কিছুদিন সপরিবারে ওই হাউসিং

কমপ্লেক্সে বিমলজ্যোতিকে কাটাতে হয়েছিল। নতুন প্লটে নতুন বাংলোটা তৈরী হতে ন'মাস সময় লেগেছিল। মুম্বাইয়ের আর্কিটেক্ট। ডিজাইনে জুহু মেজাজ আর গোয়ানিজ আভিজাত্য। সঙ্গে বিমলজ্যোতির কোটি টাকার স্বপ্নের পরিকল্পনা। কনফারেন্স রুম, অ্যাটিক, ড্রিঙ্কস কাউন্টার, গ্লাস-রুফড বেডরুম, আণ্ডারগ্রাউণ্ড এক্সিট এবং আরও যতরকমের যা কিছু হয় বাংলোয় সামিল করেছিলেন বিমলজ্যোতি। তন্দ্রার বলার মত কিছু ছিল কি না বা এখনও আছে কিনা সমস্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখে সেরকম কিছু মনে করার কোনো কারণ নেই। এত ঢালাও ভরপুর এই আয়োজন।

চারবছর হয়েছে বিমলজ্যোতিরা ফ্ল্যাটটা প্রায় জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে নিজেদের এই বাংলো বাড়িতে এসে উঠেছেন। সুদক্ষ মালীর পরিচর্যায় বাড়ির সামনে পেছনে গড়ে উঠেছে ফল ফুলের সুরম্য বাগিচা। লন। পেছনেব লনে রংবেরঙের ছত্রছায়ায় বসার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে টেনিস আর ব্যাডমিন্টন কোর্ট।

বাড়ির সামনাদিকে অনেকখানি জুড়ে লন। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলে বাঁদিকটা পরিপাটি গার্ডেন। কাটা-চাঁছা-ছাঁটা। মাঝখানে বাংলো। বাংলোর দু'ধার দিয়ে পেছনে যাওয়ার সুন্দর বাঁকানো পথ চলে গেছে। ডানদিকটায় আবার বড় বড় ফুল-ফলের অগোছালো ঝাড়। বড় বড় আম, কাঁঠাল আর লিচু গাছ জমি কেনার সময়ই ছিল। গন্ধরাজ, মাধবীলতা, বেলি আর কাঞ্চনও ছিল। সঙ্গে এই চারবছরে ফুলের আরও নতুন গাছ হয়েছে। দেশি ফুল। এই দেড়কাঠা মত জায়গাটা অবিন্যস্ত। একটা দোলনা আছে এখানে। বিমলজ্যোতির পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল যে এই জায়গাটা এরকম ঝোপঝাড়ে ছাওয়া থাকবে। তাহলেই পাখি আর পতঙ্গরা আসবে।

সদর গেট থেকে দু'দিকে দেয়াল ঘেঁষে দেবদারু আর অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকাশিয়ারা একটু একটু করে মাথা আকাশের দিকে তুলছে। গেট পেরিয়ে এই বাংলোয় ঢোকার মুখে যে কারও চোখে পড়বে সাদা মার্বেলফলকে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নকল করে সুন্দর করে কালো অক্ষরে লেখা শান্তিনিকেতন।

শুল্ক বিভাগের উচ্চপদস্থ বিমলজ্যোতি সাংঘাতিক কাজের লোক। কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। শান্তিনিকেতনে ফেরার পর সমস্ত ক্লান্তি তার দূর হয়ে যায় যখন চোখ ভরে নিজের এই বাংলোটাকে দেখেন তিনি। ভাবেন, তন্দ্রাব বলার মত আর কী থাকতে পারে? এ তো রীতিমত অল এনকম্পাসিং ব্যাপার। বিমলজ্যোতি তো আর ফ্ল্যাটওয়ালা স্নব অক্ষম মধ্যবিত্ত মাকড়াগুলোর মত নন। মন্ত্রী, বিধায়ক সকলকেই তিনি বুদ্ধি আর অর্থের যোগবলে কব্জা করেছেন। ফলবতী যতরকম পোস্টিং হতে পারে সে'সব বয়সের সুসময়ে হাতিয়ে নিয়েছেন। স্থানে স্থানে যথাসময়ে কিস্তির টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন পার্টির কাছ থেকে নিজের প্রাপ্যটা সময় মত বুঝে নিয়েছেন। পার্টির দাবিগুলো নিখুঁতভাবে মিটিয়ে দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী মূল্য ধার্য করেছেন। এই কাজগুলো গুছিয়ে করতে পারলে হাড় বদমাশ

মন্ত্রীটন্ত্রীগুলোর মোসাহেবি বেশি করতে হয় না। এই মোসাহেবিটা দূর থেকে টাকা ফেলে করতে পারলে বিমলজ্যোতির স্বস্তি। মাঝে মধ্যে বছরে দু-পাঁচটা অর্ডারি হ্যাংলামো যে হয় না তা নয়। চাকরিতে ঢুকেই তো তিনি দুর্নীতির বাস্তবিক সমান্তরাল রাষ্ট্রব্যবস্থা কাকে বলে সেটা বুঝে নিয়েছিলেন। পুরো কাজটাই ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু ভালবেসে, আন্তরিকতার সঙ্গে করলে আর ঝুঁকি মনে হয় না। একটা সময় একেবারে জলভাত হয়ে যায়।

কে যেন ঝুঁকি সম্বন্ধে মজার একটা কথা বলেছিলেন। ক্রিস্টোফার কডওয়েল না হাসন রাজা?

বিমলজ্যোতির ভেতরে হাসি ধাক্কা দিয়ে যায়।

কথাটা ছিল অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য 'ঝুঁকি'টা আলাদাভাবে কোনো ফ্যাক্টর নয়, টেকিং রিস্ক ইজ দ্য ফ্যাক্টর। মধ্যবিত্ত ঝুঁকি নিতেও পারে না, ঝুঁকিকে সঙ্গে নিয়ে চলে সেই ঝুঁকিকে ভালবাসায় বদলে দিতেও পারে না। অক্ষমতাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি শুধু করে। গুডিগুডি, হাম্‌টিডাম্‌টি হয়ে বেঁচে থাকে।

এই ঝুঁকি নিয়ে বিমলজ্যোতির একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। কলেজের পাট তখন চুকে গেছে। এক মহৎ বন্ধুর ঘরে সিনিয়র কমরেড সুপ্রকাশ সমাদ্দার 'ঝুঁকি' শব্দের মর্ম বোঝাচ্ছিলেন সেদিন। লোকটাকে বিমলজ্যোতির বরাবরই না-পসন্দ। ভীষণ ডেডিকেটেড, ভীষণ ধূর্ত আর ভীষণ কড়া। এই ধরণের অতিরিক্ত 'ত্যাগ-শিকারী'দের সন্দেহ করা (বিমলজ্যোতি কখনও 'ত্যাগ-স্বীকার বলতে চান না) বিমলজ্যোতির আজন্ম স্বভাব। অতিরিক্ত ত্যাগের মধ্যে তিনি আত্মতুষ্টির দুর্গন্ধ পান। কমরেড সমাদ্দারকে নাজেহাল করতে পারলে তাঁর খুব আনন্দ হত। বাকি সবার কাছে এই কমরেড এতটাই প্রশ্নাতীত ছিলেন যে, তাঁর চেহারা দেখলে তাদের মনে কোনও প্রশ্নের উদয়ই হত না। এই বোকাবোকা অভ্যাসের আড় ভাঙার মধ্যেই ছিল বিমলজ্যোতির উল্লাস।

ঝুঁকি সম্বন্ধীয় আলোচনাটা কিছুক্ষণ চলার পর বিমলজ্যোতি সেদিন বলছিলেন, আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। সমাদ্দারকে আগেও বিমলজ্যোতির নানাবিধ উল্লাসের মোকাবিলা করতে হয়েছে। তিনি জানেন এখন তাঁকে কুপোকাৎ করার মতলবে আছে এই হাড়বজ্জাত যুবক কমরেডটি। তিনি কাছা মুড়ে পেছনে গুঁজে দেন। ভেবেছিলেন কোনও ধরণের ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিয়ে ছোকরাকে জন্মের মত তল্লাট ছাড়া করতে। দেশে হাজার হাজার তরুণ যুবক আছে। এক পিস্ উৎপাত খসিয়ে দিলে বিপ্লবের কিস্যুটি হবে না। কিন্তু সুবিধে হয়নি। ছেলেটা পাজির পা ঝাড়া। সময় গময় কিছু ঠিক নেই, কোনও শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা নেই, নিজের মত করে চলে—কিন্তু একটা জায়গাতেই সমস্যা। শহরে কাজকর্ম বুদ্ধিজীবী কমরেডদের দরকার। এই কাজে এই ছোকরাকে শুধু 'বেড়ে' যদি বলা হয় তাহলেও অনেক কম বলা হয়। একেবারে যাকে বলে তুখোড়। ভল্যুম, কোটেশন, থিয়োরি একেবারে ঠোঁটস্থ।

তার বক্তিমে আর বক্তব্য উপস্থাপনার কারিকুরি মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবার মত। নানা ধরণের 'মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতা' থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবের এই গুণটিকে 'কাজে লাগানে'র স্বার্থে বিমলজ্যোতিকে তখন সহ্য করে যেতে হত সমাদ্দারদের। এ শহর শুধু নয়, ছোকরাকে গোটা অঞ্চলের সমস্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি একডাকে চেনে। এই বুদ্ধিজীবিদের পুরো ফোর্সটাই তো বিপ্লবের বন্ধু ফোর্স। অগত্যা ... ...।

কমঃ সমাদ্দারকে বিমলজ্যোতি কখনও এমন বেকায়দায় ফেলেছেন যে কখনও মনে মনে তিনি একাই 'অপারেশন এনিহিলেট : পারসোন্যাল এনিমি' কর্মসূচী প্রায় হাতে নিয়ে ফেলেছিলেন। যখনই এসব কুচিন্তা মাথায় এসেছে সমাদ্দার 'রামো রামো' বলে জিভ কেটেছেন। কারণ, পার্টি লাইন সংশোধিত হয়ে ততদিনে 'ব্যক্তিহত্যা' গর্হিত অপরাধ প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

নিরুপায় হয়ে সমাদ্দার মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বিমলজ্যোতিকে বিপ্লবী বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বল কী তোমার জিজ্ঞাসা?'

বিমলজ্যোতি তৈরী হয়েই ছিলেন। হালকাভাবে বললেন, শব্দটা 'ঝুঁকি'ই তো?

সমাদ্দার : হ্যাঁ, ঝুঁকিই।

বিমলজ্যোতি : বাংলায় ঝুঁকি শব্দের কী অর্থ?

সমাদ্দার : বাংলায়—বাংলায় মানে সে তো রিস্ক-ই. মানে ওই হল আর কি ...।

বিমলজ্যোতি : কী হল?

আরে ঝুঁকি তো ঝুঁকিই হল। কী হল আবার? সমাদ্দার তির্যক রসিকতা দিয়ে সভাকে প্রভাবিত করে বিমলজ্যোতিকে টলিয়ে দিতে চাইলেন। বিমলজ্যোতির সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি আবার বললেন, 'ঝুঁকি' শব্দে বাংলা মানেটা কী?

সমাদ্দার : (প্রথমে বিড় বিড়) এই বলতে পারো বিপদ আছে, দুর্ভাবনা আছে ইত্যাদি জেনেও কোনও কাজ করতে যাওয়া।

বিমলজ্যোতি : হ্যাঁ, আমারও সেরকম কিছুই মনে হচ্ছিল। আপনার কাছ থেকে কনফার্ম না করে তো নিশ্চিন্ত হতে পারি না। যেমন, ধরা যাক 'ভয়'। 'ভয়' মানেও সেরকম। 'ভয়' একটা নেতিবাচক শব্দ। শব্দগুলোর সৃষ্টি হয়েছে কোনও একটা বিশেষ অবস্থাকে বোঝাবার জন্যে। এই যে বলা হচ্ছে—দেশের কাজ করতে গিয়ে 'ভয়' দূর করতে হবে, 'ঝুঁকি' নিতে হবে। কেন? ইতিবাচক কাজে নেতিবাচক শব্দগুলোকে টেনে আনা হচ্ছে কেন? এসব তো কমরেডদের মনোবল ভেঙে দেবে।

বিমলজ্যোতি একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে তারপর বললেন, ভূতের ভয়, পুলিশের ভয়, নেতার ভয়, কনভয় আর ইয়ে মানে বউয়ের ভয় এইসব হচ্ছে গিয়ে 'ভয়'। বিপ্লব করা তো আনন্দের। এ তো বাস্তব চাহিদা। এখানে 'ভয়' দূর করা-টরা এসব কেন? বিপ্লব তো অনিবার্য।

এ হবেই। এসব কেন? বিপ্লবের ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে প্রাতঃকৃত্যের মত। ওটা হবেই, অবশ্যম্ভাবী। মানুষ লড়বেই। এখানে 'ঝুঁকি' শব্দকে টেনে এনে অযথা ঝুঁকিটা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। আমার মনে হয় প্রচলিত বুর্জোয়া অভিধান থেকে এভাবে শব্দ ধার করে আনাটা বিপ্লবের পরিপন্থী। আমি কমরেডদের কাছে বিনীত প্রস্তাব রাখছি, অবিলম্বে বিপ্লব সহায়ক শব্দভাণ্ডারে পূর্ণ একটি অভিধান রচনার উদ্যোগ গৃহীত হোক। এ ব্যাপারে মুখ্য উদ্যোক্তা হিসেবে আমি কমরেড সুপ্রকাশ সমাদ্দারের নাম প্রস্তাব করছি ... ...।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেদিন ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে বিমলজ্যোতি সভা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আর টেকিং রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে সমাদ্দারের কডওয়েল-উদ্ধৃতি যে নির্ভেজাল একটা ঢপ ছিল সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বিমলজ্যোতিরা।

দলের একমাত্র স্বাভাবিক মানুষ নীরেনদা বলেছিলেন, এ সব হচ্ছে গিয়ে মহৎ উদ্দেশ্যে ন্যায্য মিথ্যাচার। এ ধরণের 'কাজ' নাকি ইয়াং কমরেডদের উৎসাহ যোগায়। এসব সমাদ্দার আর সিংজীদের দুর্বুদ্ধি। তিনদশক থেকে দেখছি বিপ্লবের নামে ঢপ দিয়ে আসছে ওরা। এতে নাকি সুফল ফলে। তা কি কচুটা হয়েছে এতে? এখন তো বিপ্লব বলে কোনও শব্দই নেই। দলের সভায় আমি কোনো কথা বলতে চাইলে ওই সমাদ্দাররা থাবড়ে-দামড়ে, হৈ হল্লা করে বসিয়ে দেয়। বিপ্লব! এই মধ্যবিত্ত মাকড়াগুলোর খোয়াব দিয়ে বিপ্লব হবে? কিস্যু হবে না ... ...।

নীরেনদা।

বিমলজ্যোতি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আবার সমস্ত শক্তি দিয়ে দৃষ্টিটা টেনে নিয়ে রাস্তার সেই আবছায়া ঘেরা সীমান্তের ফাঁকটা পেরোতে চান। পেগটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে অনেকদিন পর। নিজের অজান্তেই ডান হাতটা বুকের বাঁদিকটা বুলিয়ে দেয়।

নীরেনদা। এই একটা জায়গায় বিমলজ্যোতির প্রতিভা, স্মার্টনেস সব তুচ্ছ হয়ে যেত—শুধু হয়ে যেত নয়, নিজের তুচ্ছতাগুলিকে তিনি তাঁর নীরেনদার হাতে সমর্পণ করে দিতেন।

একদিন বিমলজ্যোতি নীরেনদাকে বলেছিলেন, মধ্যবিত্ত মানসিকতা মানে তো ভীরুতা, দোদুল্যমানতা, কর্তব্যবিমূঢ়তা, অসুস্থতা, সিদ্ধান্তহীনতা—এ সবকে আপনারা শ্রেণী মানসিকতা বলছেন। বলছেন ঐতিহাসিক। উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের মধ্যে এইসব থাকে না নীরেনদা?

নীরেন উত্তরে বলেছিলেন, থাকবে না কেন, থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থানগত কারণে মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশি থাকে। উল্টোদিকে, অর্থনৈতিক অবস্থানগত কারণেই অন্য শ্রেণীগুলোর মধ্যে এইসবকে অতিক্রম করার প্রবণতা ও সম্ভাবনা বেশি থাকে।

নীরেনের সঙ্গে কথা বলার সময় বিমলজ্যোতির মধ্যে কোনও ফন্দি-ফিকির কাজ করত

না।

নীরেনের এই জবাবে যে বিমলজ্যোতি সন্তুষ্ট হননি তা বুঝতে পেরেই তিনি বিমলের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, তোমার কথাটা কী সেটা বল?

বিমলজ্যোতি নীরেনের ছোট্ট ঘরটিতে পাতা মাদুরে আসন করে বসেছিলেন। এক অজানা সংকোচে মাথাটা না তুলে মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, মানুষকে বোধহয় এভাবে ভাগ করা যায় না নীরেনদা। সব নিয়েই মানুষ। আমার মনে হয় এখানে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। যারা নিজেদের সুবিধের জন্য সমাজে মানুষের মধ্যে শ্রেণী তৈরী করল আমরা আঁটঘাট বেঁধে তাদের তত্ত্বে ঘুরপাক খাবো কেন? এই শ্রেণীতত্ত্ব তো শ্রেণীবাজদেরই সাহায্য করছে। মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোকে—তার লোভ, কাম, ক্রোধ, বাসনা, শুভচেতনা ও সহানুভূতিশীলতার জটিল রসায়নকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণীতত্ত্ব মানুষকে খণ্ডিত সত্ত্বায় দেখে। এভাবে ... ...।

বিমলজ্যোতি আর কিছু না বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন। নীরেনের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দে চমকে উঠে তিনি সেদিকে তাকান।

কী গভীরতা আর মমত্ব দৃষ্টির মধ্যে।

সেই দৃষ্টি অবিচল রেখে নীরেন বিমলজ্যোতিকে বলেন, তুমি যেভাবে ভাবো আমি সেভাবে ভাবতে পারি না। বোধহয়, ভাবতে চাইও না। আসল কথা হল, তুমি মনের ভেতর থেকে সত্যিই মানুষের 'ভাল'টা চাইছ কি না। মানুষের ও সমাজের ভালোর জন্য পৃথিবীর সকল চিন্তার বিকাশ ঘটুক, তুমিও বিকশিত হও।

বিমলজ্যোতি তখনই জানতেন মানুষের ভাল-খারাপ আলাদাভাবে ভেবে বা মেপে তিনি কথাগুলো বলেন নি। যে কথাগুলো তার মনের গহনে ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে চরাফেরা করে সেগুলোই তিনি বলেছেন। মানুষের ভাল নিয়ে বিমলজ্যোতি আদৌ কিছু ভাবেন কিনা তা তিনি নিজে কখনও ভেবে দেখেননি আর ভাবেন কি না বুঝতেও পারেন নি। ব্যাপারটা তিনি সেভাবে বোঝেন কি না তা নিয়ে তাঁর নিজের সন্দেহ ছিল। এই দলে তিনি মানুষের ভালো-র জন্য ছিলেন না নিজের মনের কোনও চাহিদা মেটাবার জন্য জড়িয়ে ছিলেন সে নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।

নীরেনদার সেদিনের কথার মধ্যে বিমলজ্যোতি একটা সূক্ষ্ম নির্দেশের সুরও সনাক্ত করেছিলেন। নীবেনদার কথাটা যেন এরকম : 'যদি মানুষের ভালর জন্য ভাবো ত ভাবো, নইলে নয়।' বিমলজ্যোতির মনে হয়েছিল, এটা বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার। চিন্তাকে চাইলেও সব সময় শাসন করা যায় না। চিন্তা অনেক সময়ই শুধু আদর্শবান নয়। বিমলজ্যোতি মুখে কিছুই বলেন না। ওই মানুষটার ভুলগুলোকেও কোনও সিদ্ধপুরুষের দীর্ঘশ্বাস বলে মনে হত তাঁর।

এই নীরেনদা'র সঙ্গে যুব ছাত্র-সংগঠনের তরুণ যুবকদেরই বেশি দোস্তি ছিল। কদাচিৎ তাঁকে বয়স্ক বা মাঝবয়সী কমরেডদের সঙ্গে গল্প করতে দেখা যেত। খুব একান্ত মুডে থাকলে তিনি বলতেন, রবীন্দ্রনাথের গান শুনিস, জীবনানন্দ পড়িস, বিদেশী সাহিত্য যত পারবি পড়বি, কোনও কিছুকেই সিলেবাস-কারিকুলাম করে তুলবি না। আমরা যে ভুলের গোলকধাঁধায় চলেছি, যে জায়গাগুলো পেয়েও হারাই, দাস ক্যাপিটেল থেকে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই তো সে জায়গাগুলোকে স্পর্শ করার আপ্রাণ চেষ্টা। এ এক বিশুদ্ধ চিত্তশুদ্ধির অভিযান। একেক জায়গায় একেক রকম করে বলা। গান্ধী মানুষটার আর্তিটা বোঝার চেষ্টা করিস। জীবনানন্দকে ... ...

কত কত কথা নীরেনদার। কবেই যেন সেইসব এপিটাফ হয়ে গেছে। বিমলজ্যোতির মনে হ'ত সাংঘাতিক কোনও জোর না থাকলে এমন লোকের পক্ষে কোনও দলভুক্ত থাকা অসম্ভব। নীরেনদার মৃত্যুরও অনেকদিন হয়ে গেল। শেষ অবধি দলে ছিলেন। মানুষটার ছায়ার প্রভাবও যেন কোথাও পড়েনি। এখনকার বেশিরভাগই সমাদ্দারপন্থী। 'সংগ্রামী-কমিউন'-এর দেয়ালে কমঃ নীরেন দাস এখন এক বিবর্ণ ছবি। একটা কথা ভেবে বিমলজ্যোতির হাসি পেয়ে যায়— মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত বিত্তবান, বিত্তহীন নির্বিশেষে মানবচরিত্রের পক্ষে এত সওয়াল করার পরও নীরেনদার মধ্যবিত্ত বিরোধী চিন্তাগুলো তাঁকে ভেতরে ভেতরে ভীষণ অবসেস্‌ড করে রেখেছে — এই অবসেসনের ব্যাপারটা তিনি অনেক পরে বুঝেছেন। এটা কি তবে গুরুদক্ষিণা?

রাতে বিমলজ্যোতির ঘুম বলতে যা বোঝায় তা হলই না একেবারে। এপাশ-ওপাশ করে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে ভোর সকালে লনে পায়চারি করতে লাগলেন। মাথাটা বেশ ভারী। খোয়ারির ঘোর লেগেছে যেন। ওকেন-গ্লো'তে খোয়ারি হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম. কিন্তু এই বয়সে একেবারে ঘুম না হলে যা হয় তা-ই হয়েছে।

কিংশুকটাকে নিয়ে বড্ড চিন্তা হয়। গাড়ি, ওয়াকম্যান, সেলফোন, পড়াশুনো, পোশাক পরিচ্ছদ সব মিলিয়ে কেমন যেন কিম্ভুতাকার ধারণ করেছে। পড়াশোনাতে ভাল। কখনও হৈ হৈ করছে। কখনও একেবারে গুম মেরে গিয়ে নিজের ঘরে হালকা আলো জ্বেলে অল্প ভল্যুমে ওয়েস্টার্ন ফ্লুট শুনছে। ম্যাণ্ডোলিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছে। পারতপক্ষে সে বিমলজ্যোতির সঙ্গে কোনও কথা বলে না। ওর যত ঝগড়া তার মায়ের সঙ্গে। তন্দ্রাও কিংশুককে তার বাবার কাছে বেশি ঘেঁষতে দেন না। এটা বিমলজ্যোতির অনুমা।

একদিনের ঘটনা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হয়ে গেছে। সেদিন দিনের বেলাতেই গাড়িটা ওয়ার্কশপে ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিমলজ্যোতি। অটোরিক্সা চেপে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। সদর গেট পেরিয়ে পায়ে হেঁটে এই সময় বাড়িতে খুব কমই ঢোকা হয় তার। খুব ভাল লাগছিল। সমস্ত গার্ডেন, লন জুড়ে হালকা আলোর সম্ভার। বিমলজ্যোতির রোমাঞ্চ হচ্ছিল এ তার নিজের আকাশ, তার নিজের নক্ষত্রমালিকা। কী

বিশাল, কী সুরম্য। একটা তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে তাঁর অন্তর থেকে। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে বারান্দায় ওঠেন বিমলজ্যোতি। চোখে পড়ে পাতলা মসলিন পর্দায় সামনের ঘরে তন্দ্রা আর কিংশুকের ছায়া দুলছে। হঠাৎ বিমলজ্যোতির বালকবেলা জেগে ওঠে। দেখি তো মা-ছেলেতে মিলে কী কথা হচ্ছে? নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে জানালার কাছে নিজেকে আড়াল করে কান পাতেন তিনি। চোখেমুখে তাঁর সরল দুষ্টুমিষ্টি হাসি।

তন্দ্রা : না, বাপি সম্বন্ধে তুমি এরকম কথা একদম বলবে না বলে দিচ্ছি।

কিংশুক : ভারী আশ্চর্য তো! তুমি নিজের মুখেই কতদিন আমাকে কত কথা বলেছ। গর্ব করে বলেছ ... ...।

তন্দ্রা : কী মাথামুণ্ডু বুঝেছিস কে জানে। বুঝলে তুই এরকম করে ... ...।

কিংশুক : 'প্রাক্তন কমরেড বাড়ি নেই' বলতে পারতাম না তাই বলছ তো? আমার তো মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি বলেই ঠিকঠাক বলতে পেরেছি ... ...।

তন্দ্রা : দ্যাখ বাবু, তুই আর একটি কথাও বলবি না ... ...। তুমি তোমার বাপিকে নিয়ে আর কোনওদিন আমার সামনে এরকম কথা বলবে না ...। কী মানুষটা ... ...।' তন্দ্রা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন হঠাৎ। কিংশুক ছুটে এসে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। তন্দ্রা বাচ্চা মেয়ের মত ছটফট করে ওকে মেরেধরে বেষ্টনী থেকে মুক্ত হতে চান, কিন্তু পারেন না। কিংশুক মায়ের চোখে চোখ রেখে বলে, 'বাব্বা! তলে তলে এত ভালবাসা? এত প্রেম? বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, দেখলে মনে হয় দু'জন দু'জনের অচেনা, দু'টি পাষাণ। কিন্তু তলে তলে এত? তুমি তো দারুণ অভিনয় জানো। আমাকে একেবারে দিল্লিকা লাড্ডু খাইয়ে ছাড়লে!'

যে বালকবেলার মনটি নিয়ে বিমলজ্যোতি আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখবেন ভাবছিলেন সমস্তটা দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করে উঠল। জায়গাটা থেকে সরে আসার শক্তি পাচ্ছিলেন না। কী দেখতে কী দেখলেন বিমলজ্যোতি। তন্দ্রার সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে তাঁর পুরনো পরিচয়, কিন্তু সে যে এত গভীর অনুভবের স্তরে তা যেন প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। কই, তিনি তো তন্দ্রার জন্য এরকম অনুভব করেননি কখনও।

তবে এই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে যে চিন্তায় বিমলজ্যোতি ডুবে ছিলেন---সেটা হচ্ছে কিংশুকের এই 'প্রাক্তন কমরেড' উক্তি। আজ আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে একটা বড় আড়ালের সুলুক যেন পেয়ে গেলেন বিমলজ্যোতি। 'প্রাক্তন কমরেড'। তার মানে তিনি নিজে যেমন ভাবেন সমস্ত কিছু তার অধীনে, এই ঘরে-বাইরে সমস্ত কিছু তার করায়ত্ত--- আসলে আদৌ সেটা নয়। তারও অনেক আড়াল আছে, আবডাল আছে। সেই আড়ালগুলোতে অসংখ্য সত্যের নিজস্ব অস্তিত্ব। বিমলজ্যোতি ঘটে এত বুদ্ধি নিয়ে নিজেকে এত বোকা সাজিয়ে রেখেছিলেন এতকাল? ভীষণ চটে যান তিনি এইসব ভাবতে ভাবতে।

রাতে একটা লার্জ পেগ শেষ করে বেডরুমে গিয়ে বিমলজ্যোতি তন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী কথা বল তুমি বাবুর সঙ্গে এত বলো তো?

তন্দ্রা চুল বাঁধছিলেন। সামনে আয়না। বিমলজ্যোতির এই কথা শুনে তাঁর চোখে রাজ্যের বিস্ময়। হাতটা নিশ্চল হয়ে আছে। আয়নার ভেতর থেকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কথা, কোন্ কথা?

—কত আর বয়স হয়েছে ওর। তাছাড়া ... ...।' বিমলজ্যোতি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

তন্দ্রা আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে বিমলজ্যোতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, কী ব্যাপাব বলো তো? তন্দ্রা ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এই তো আজ রাতেই তো একটা ঘটনা ঘটল। কিন্তু তখন তো বিমল বাড়ি ছিল না। কী বলতে চাইছে বিমল?

বিমলজ্যোতি ততক্ষণে নিজের মেজাজে ফিরে গেছেন, 'শোনো, আমার সাফ কথা—আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনও মধ্যবিত্ত ছেনালি দেখতে চাই না আমি। মধ্যবিত্ত কোনো অবসেসন বা ইনহিভিশনকে গ্লোরিফাই করে বাচ্চাগুলোর মাথা খারাপ করা চলবে না। বিমলজ্যোতি ভয়ানক উত্তেজিত।

তন্দ্রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। তাঁর ধারণা বিমল এরকম করেই নিজের সঙ্গে লড়াই করে। বিমলজ্যোতির চোখে চোখ রেখে খুব শান্ত গলায় তিনি বলেন, তোমার ছেলেমেয়ে এই পৃথিবী থেকে কী কী জিনিস কীভাবে কতটুকু নেবে আর দেবে সে তাদের ব্যাপার। সম্ভার তো ছড়ানোই রয়েছে। আজ তোমার ছেলে ... ...।' তন্দ্রা কথাটা শেষ করতে পারেন না।

বিমলজ্যোতি ক্রোধে ফেটে পড়েন, হ্যাঁ, আজ তোমার ছেলে তোমার বিমলকে 'প্রাক্তন কমরেড' বলেছে। এই তো! এটাই তো বলতে চাইছ তুমি। জানি, আমি সব জানি। এসব আমাকে ছোট করার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি—তুমিই এ সব কিছুর পেছনে ..।'

তন্দ্রা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাত তুলে বলেন, আঃ বিমল চুপ করো, চেঁচিও না। বাবু শুনতে পাবে ... ...।' এতক্ষণে তন্দ্রার চিন্তা থেকে ধোঁয়াশাব পর্দাটা সরেছে। তার মানে বিমল সব শুনেছে। আর কিছু শোনেনি বিমল? শুনলে এখনও তবে তাঁকেই বিদ্ধ করছে কেন? ভীষণ মুষড়ে পড়েন তন্দ্রা। বিমল কেন এরকম করে? বিমলজ্যোতি বুঝতে পারেন তিনি তন্দ্রাকে আঘাত করেছেন। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে সবকিছু তার হাতের বাইরে।

কী হল, কিছু বলছ না যে। বিমলজ্যোতি দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলেন। তন্দ্রা তীব্র বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাঁকে এবারে বলেন, কী বলব তোমাকে বল? আড়ি পেতে মা-ছেলের কথা শোনো তুমি আর মনে রাখো ততটাই যতটা তোমার অর্থহীন যুদ্ধের রসদ। তুমি নিজেও তো এক নির্ভেজাল মধ্যবিত্ত। তোমার অতীত, তোমার বর্তমান, তোমার ভবিষ্যৎ সব মধ্যবিত্ত। যতই নিজেকে বিত্তবান প্রতিপন্ন কর—তোমার মধ্যবিত্ত ছাপটা কোনোদিনও যাবে না ...।'

বিমলজ্যোতি তন্দ্রাকে এরকম তীব্র হতে কমই দেখেছেন। শরীরে তার কালো ভোমরার

হুল ফুটছে। বুকের বাঁদিকটা চিনচিন করছে। মাথায় দাউ-দাউ আগুন। চাপা হিস্‌হিস্ স্বরে তুমি, 'তুমি একটা ..' বলে হাতের গ্লাসটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন সেদিন।

পায়ের স্লিপারটা খুলে হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে বিমলজ্যোতির। একটু একটু কুয়াশা ভেজা ঘাস। মনে হচ্ছে পা লাগলে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। শরীরটা স্বস্তি পাবে। আচ্ছা, তন্দ্রা কি নিয়মিত ঔষধ খায়? ও খুব এনিমিক। এখন লো-প্রেসার। তুতু আর বাবুর জন্মের সময় কী কষ্টটাই না পেয়েছিল তন্দ্রা।

তুতু!

তুতুটা পড়াশোনা নিয়ে যাকে বলে মত্ত। সুবোধ বালিকার মত সে কবেই বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। অবশ্য তুতুর বাড়ি থাকা আব না থাকা সমান। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতো। হাতে বই। আর নয়ত অবিশ্রান্ত টিভি দেখা। মাঝেমধ্যে দু-একটি বান্ধবী আসত। তবে আসাটাই সার। নিজেদের মধ্যে নীরবে শুধু পড়াশোনার কথাই হত। বিদেশ যাওয়া, পড়া, কোথায় যাবে, কোন্ ইউনিভার্সিটিতে, সব তুতু নিজেই ঠিক করেছে। বিমলজ্যোতিকে শুধু টাকাটা যোগাতে হয়েছিল। এয়ারপোর্টে চেক ইন-এ যাবার আগে টুক্ করে পায়ে হাত ছুঁইয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে এক ছুট্। তন্দ্রা নিঃশব্দে কাঁদছিল। কিংশুক একটু দূরে সিঁড়িতে শূন্য দৃষ্টিতে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চেক ইনে যাওয়ার আগে শেষবার ফুলস্লিভ গেঞ্জির বাঁ হাতের আস্তিন দিয়ে তুতুকে কি চোখ মুছতে দেখছিলেন বিমলজ্যোতি? হবে হয়ত।

তুতু আর কিংশুক।

এই সেদিনের ঘটনা। বয়সে দু'জনের তিন বছরের ফারাক। ঘরটাকে হৈ হৈ ঝগড়া, কথা কাটাকাটি আর মারামারি দিয়ে প্রাণবন্ত রাখত দুটিতে মিলে। তন্দ্রা সম্রাজ্ঞীর মত সে'সব সামাল দিত। বদলির চাকরিতে বড় ভাড়াবাড়ি, কোয়ার্টারে একটা জমজমাট ব্যাপার ছিল।

বিদেশ থেকে তুতু মাঝেমধ্যে ফোন করে। সে তার মা'র সঙ্গেও খুব যে কথা বলে তা নয়। তুতুর ফোন এসেছে বললে তাঁর হাতে সেলটা ধরিয়ে দেওয়া হয় তখন তিনি জানেন—ওই প্রান্ত থেকে তুতু তাঁকে বলছে, বাপি, আমার নেক্সট সেশানে স্টাডি মেটিরিয়্যাল সহ ... টাকা লাগবে। মা ওষুধ খাচ্ছে তো? তোমার অফিস আগের মতই আছে? আমি ভাল আছি। ছাড়ি।

এই স্বপ্নের বাংলোবাড়ির লনে চারটি সদস্য একসঙ্গে বসে মজা করছেন, কোনোদিন টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না বিমলজ্যোতির। তিনি নিজে তো সারাক্ষণই ব্যস্ত। ওরা তিনজন কি কখনও একসঙ্গে বসেছে? খেলা করেছে? মা-র সঙ্গে এই স্বপ্নের বাড়িটা ঘুরে বেড়িয়েছে? বিমলজ্যোতি নিজেও কখনও এরকম কোনো সুন্দর মুহূর্ত

উপভোগ করার কথা ভেবেছেন? নাঃ মনে পড়ছে না।

বিয়ের পর প্রথম দশ বছরই সামান্য অর্থকষ্ট আর সবাই মিলে একসঙ্গে কাটানোর অভিজ্ঞতা। পরবর্তী পর্যায় জুড়ে শুধু অর্থ সমাগম আর ব্যস্ততা।

তাহলে কেন এইসব? কেন এই এলাহি সম্ভার? 'বিমলজ্যোতি ইজ নো মোর অ্যা পেটিবুর্জোয়া' এটা চিৎকার দিয়ে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দেবার জন্য?

বিমলজ্যোতির ম্লান হাসিটা একটু শব্দ করে তাঁর ঠোঁটে ভেসে ওঠে।

একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে যায়। 'শান্তিনিকেতন'-এ আসার দু'বছর পেরিয়ে গেছে তখন। সেই দিনটিতে তাঁর 'শান্তিনিকেতন'কে অন্যভাবে উপভোগ করছিলেন বিমলজ্যোতি। শহরে এমন কোনো লোক নেই তখন যে 'শান্তিনিকেতন'-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত নয়। বিমলজ্যোতির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তন্দ্রার পীড়াপীড়িতে তাঁকে একটা শর্টফিল্মের শ্যুটিংয়ের অনুমতি দিতে হয়েছিল। যারা ছবিটি করবে তাদের একজন কিংশুকের পরিচিত। সে নাকি খুব করে ধরেছে। কিংশুক নির্দ্বিধায় সম্মতি দিয়ে দিয়েছে। বিমলজ্যোতি খুঁজে পান না, তাঁর এই বাড়ি না থাকলে শ্যুটিংওয়ালারা কি ছবিটা তৈরী করতই না? এসব কী ধরণের ছেলেমানুষি?

শ্যুটিংয়ের দিনই বিমলজ্যোতি বহুদিন পর অফিস কামাই করেছিলেন। সম্ভবত তুতুর জন্মের পর এই প্রথম। যুক্তিটা তার নিজের কাছে পরিষ্কার ছিল। নিজের স্বপ্নের বাংলোবাড়ি। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। শ্যুটিংওয়ালাদের তো নয়ই। পাঁচঘন্টা ধরে অত্যন্ত বিরক্তিকর সব অঙ্গভঙ্গি সহযোগে যে ক্লাউনিশ কার্নিভাল হল—তাকেই কি শ্যুটিং বলে? বিমলজ্যোতিকে হাসি চাপতে হয়েছিল অনেকবার। সবচাইতে ইন্টারেস্টিং ওই ভাঁড় নির্দেশকটি। ছেলেটা আলবাৎ জিমে যায়—এ ব্যাপারে বিমলকান্তির কোনো সন্দেহ নেই বীভৎস কার্নিভাল একটা সময় শেষ হল। কী কী সব আজগুবি শট নেওয়া হল।

শ্যুটিং চলাকালীন বিমলজ্যোতি ওকেন গোল নিয়ে রঙিন ছত্রছায়ায় বসেছিলেন। সেলফোনে মাঝে মধ্যে অফিসের কাজ আর বিভিন্ন পার্টির লোকেদের ম্যানেজ করছিলেন। তন্দ্রা বাড়ির কাজের দুই সহকারী নিয়ে দফায় দফায় কোল্ড ড্রিঙ্কস্, কেক ইত্যাদি খাবার দাবার পরিবেশন করে যাচ্ছিল। যখনই সেটা হচ্ছিল—শ্যুটিংওয়ালারা সমবেত কণ্ঠে 'বোযা' 'বোয়া' জয়ধ্বনি সহযোগে তন্দ্রার প্রশংসা করছিল। গোটা ব্যাপারটা যতই বিরক্তিকর হোক, বিমলজ্যোতির কাছে দিনটা অন্যদিনের চেয়ে অন্যরকম হয়ে উঠেছিল। তিনি আজ বাড়ি আছেন—এটা তন্দ্রাকে আলাদা ঘোরের মধ্যে রেখেছে সেটা তিনি টের পাচ্ছিলেন।

সব মিলিয়ে বিমলজ্যোতি ওকেন গ্লো একটু বেশিই চড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। বেশ লাগছিল তাঁর। এরকম করে নিজের লনে তো কোনোদিন এত সময় ধরে বসেন নি তিনি। কিন্তু যার কুকর্মে এই শ্যুটিং পর্ব সেই বাবুমশাইটিকে তো একবারও দেখা গেল না এই

কাণ্ডের মধ্যে। বিমলজ্যোতি বেশ অবাক হলেন। বাবুটার ভাবগতিক কিছু বোঝা দায়। নাকি ছেলেটা তার মতই বেয়াড়া হয়ে উঠছে? অজানা আশঙ্কায় বুকটা একটু কেঁপে ওঠে তাঁর।

চিন্তাটাকে খুব প্রশ্রয় দিতে চান না তিনি।

শ্যুটিং পর্ব শেষ। ছেলেমেয়েরা বসে তন্দ্রার তৈরি খাবার-দাবার খাচ্ছে। ভালই যেন লাগছে বিমলজ্যোতির। তুতুটাও নেই, বাবুর কথা তো ভেবে লাভ নেই। তন্দ্রাকে যেন অনেকদিন পর দেখাচ্ছেও ভাল। একবার এদিকে ছুটছে—তো আরেকবার ওদিকে। কাজের মানুষেরা হিমশিম খাচ্ছে। কিন্তু ক্লান্তির বা বিরক্তির কোনো ভাব নেই ওদের মুখে। বরং একটু যেন চনমনে। বিমলজ্যোতির মনে হল, বহুদিন পর একটা মরচে-পড়া পরিত্যক্ত যন্ত্র হঠাৎ সচল হয়েছে। তখনই বিমলজ্যোতির কানে এল জোকার টাইপের নির্দেশকটি 'আহা-ইস্, অপূর্ব, এক্সসিলেন্ট, রুচি, স্পেনডিড, বুর্জোয়া টেস্ট ইত্যাদি ভূষণ সহযোগে বাংলা বাড়িটার প্রশংসা করছে আর তার সঙ্গে দোহার দিচ্ছে গোটা টিমটি।

বিমলজ্যোতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ভেতরে ভেতরে। হাভাতে কতগুলো এখানে এসে বুর্জোয়া টেস্ট বোঝাচ্ছে। অনুমতি পেয়েছ, কাজ সেরে মানে মানে কেটে পড়। তৈলমর্দন আর নিজের রুচির বিজ্ঞাপনকে একাকার করে বুদ্ধি দেখাতে যেও না। এসব ছেনালি কবেই পরিত্যক্ত।

এই সময়ে নির্দেশক ছেলেটি দু'হাত জোড় করে বিমলজ্যোতির সামনে এসে দাঁড়ায়। পেছনে সাগরেদরা। তন্দ্রা তখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

বিমলজ্যোতি ওদের দিকে তাকিয়ে মুখে কিছু না বলে একটু সময় নিয়েই একটা পেগ বানাতে থাকেন। নির্দেশকটি ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেছে। হাতজোড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরাও দাঁড়িয়ে। বিমলজ্যোতি পেগটা হাতে নিয়ে ওদের মুখোমুখি হয়ে একটা চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, কাজ শেষ হয়েছে তো—এবারে এসো।

নির্দেশক ছেলেটি এবার হাত নামিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আসলে আমাদের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী এরকম মানানসই বাড়ি যে ... ...।'

—ঠিক আছে, এসো এখন। কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে কিংশুককে জানিও। আমি আগে জানলে অনুমতি দিতাম না। থাক্-গে, যা হওয়ার হয়েছে। আগামীতে এখানে অন্তত চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাসনা নিয়ে এসো না। কাউকে আসতেও বলো না। আর তোমাদের স্ক্রিপ্ট যাঁরা করেন তাদের বলো যে যেন তাঁরা যার যার মাপ অনুযায়ী করেন। একটা কাজ করবে—তা একে ধরো, ওকে বলো, ওখানে হাত কচলাও, ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর নয়? এই যে আমার কথাগুলো তোমাদের শুনতে হচ্ছে—সে তোমাদের শুনতে হবেই। এটা হচ্ছে পিওর বুর্জোয়া সেটআপের ব্যাপার ... ... আইদার ইউ আর টু অ্যাকসেপ্ট ইট অর টু ডিনাউন্স টোটালি। দেয়ার ইজ নো মিডওয়ে। পেটিবুর্জোয়া হলে কি হত জানো? বাইরে তোমাদের

সঙ্গে আমি 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করতাম আর পেছনে বলতাম—ক্লাউন কতগুলো এসে সার্কাস করে গেল।

নির্দেশক ছেলেটি তখন অপমানে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিমলজ্যোতি আড়চোখে শুধু দেখে নেন তন্দ্রা কোথায় আছে, তারপর বলেন, এখন তোমরা এসো। আমার এখন কাজ আছে। কথাগুলো মনে রেখো—ও হ্যাঁ, বাই দি ওয়ে, তুমিই তো বোধহয় ডায়রেক্টর অব দ্য ফিল্ম? আচ্ছা একটা কথা, নির্দেশকের অ্যাকটিভিটিস ও মুভমেন্টগুলোর কি কোনো সিলেবাস ক্যারিকুলাম আছে যা ইউনিভার্সাল? সকলের যেন একই রকমের ভাবভঙ্গি? কেমন একটা যেন—কী আর বলব—নাও এসো তোমরা।

পুরো দলটা পেছন ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই বিমলজ্যোতি এবারে একটু হেসে বললেন, যদি ছবিটা সত্যি সত্যিই তৈরি হয় তাহলে একবার দেখিও তো, কেমন? ঠিক আছে?

হ্যাঁ সত্যিই, কোনোকিছুকেই ক্যারিকুলামে বেঁধে দেওয়া উচিত নয়। শুটিংয়ের দলটিকে ঠিক এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন বিমলজ্যোতি।

তুতু আর বাবুর মধ্যবিত্ত হ্যাংলা চেহারাটা তিনি মোটেই দেখতে চান না। এখন কর্পোরেট মহাকাল। ফিউডাল ভ্যালুজ, বুর্জোয়া ভ্যালুজ অবলুপ্ত।

সবাই মিলে লনে বসা হল কি না হল সেটা বড় কথা নয়। আসল কাজ ক্যারিয়া আর উন্নতি।

উন্নতি আর উন্নয়ন।

মা-বাবা নিয়ে এত হ্যাংলামো করার তো কোনো মানে নেই। বিমলজ্যোতি তো ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছেন। মাঝেমধ্যে অন্য ভাইবন্ধুদের মায়ের আদরযত্ন দেখলে মনটা ভারী হয়ে উঠত। কিন্তু 'মা-মা' বলে তার জৈবিক অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠত—সেরকম তো মনে পড়ে না। এ সমস্তই সামাজিক অভ্যেসের সম্পর্ক। সব সম্পর্ক মানুষের চর্চার ফল। তার অর্জন। আর অর্জন বলেই তার বর্জন সম্ভব।

বিমলজ্যোতি বাবা বলতে যাঁর সঙ্গে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তাঁর হাবেভাবে মনে হত তিনি তাঁর স্ত্রী-পরিত্যক্ত এই মাংসপিণ্ডটিকে নিয়ে এক মহা ঝামেলায় ফেঁসে আছেন। কেমন একটা বিচলিত অসহায় চোখে বিমলজ্যোতিকে দেখতেন। আদর যত্ন সবই করতেন। বিমল শুধু বুঝতেন মানুষটার হাত তাঁর শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে শুধু, মনকে স্পর্শ করতে পারত না। বড় হওয়ার পর মানুষটার জন্য করুণাই হত বিমলজ্যোতির। অদৃষ্টের ফেরে কি এক আজব দায়িত্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন মানুষটা। জ্যেঠামশাইয়ের কাছে শুনেছেন, মানুষটা ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতেন। বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। কোনো এক বিপদে পড়া পরিবারকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে হয়। প্রথম প্রথম কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত নতুন

বউটি মানুষটার ভবঘুরেপনা মেনে নিতেন। কিন্তু মাস ছয়েক যাওয়ারপরই বউয়ের অধিকার প্রবণ স্ত্রী-স্বভাব মানুষটার স্বভাবেও হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হল। বিমলজ্যোতির জন্মের আড়াই বছর পর তাঁর মা'র মৃত্যু হয়। বাবা কোনোদিনই এসব নিয়ে কিছু বলেন নি। জ্যেঠামশাইয়ের কাছ থেকেই শুনেছেন বিমলজ্যোতি যে, বাবা পুরুষটির তখন না-সংসারী/না ভবঘুরে অবস্থা। মা-মহিলাটি স্বামীর ঔদাসীন্যে দিশেহারা। সারাক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করতেন। ভবঘুরে মানুষটি তাঁকে বলতেন, তুমি তো সন্তানটি পেয়েছ। ওর ভরণপোষণের চিন্তা করো না। তুমি শুধু ওকে নিয়ে পড়ে থাকো। ওর মধ্যে আমাকে আর টেনো না। স্বাভাবিকভাবেই এই জায়গাটা 'মা' মহিলাটির বরদাস্ত হয়নি। একসময় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বাচ্চার প্রতি অমনোযোগী হয়ে স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার কাজে মন দিলেন। এই করতে করতে মহিলা বিছানার সঙ্গে মিশে গেলেন একদিন। শাস্তিপর্বের শুরুয়াতের পর থেকেই হতভম্ব বিমূঢ় স্বামীটির ভ্রূজোড়া ও চক্ষুদ্বয় উর্দ্ধগামী ও বিস্ফারিত হয়ে থাকত।

বিমলজ্যোতি মনে করেন তার নিজের জীবনের ঘটনা পরম্পরার যুক্তির জন্য নয়, 'মা-বাবা আলাদা ব্যাপার' এটা মানুষের অর্জন। তার বেশি কিছু নয়। অর্জন বলেই তার মা নিজের ছেলের প্রতি অমনোযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে বাবাটি এত ভবঘুরে হয়েও স্বভাবজাত দায়িত্ববোধের বাতিকে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে সত্তর বছর বয়স অবধি ফালতু টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাবু তুতুদের মধ্যে এই অহেতুক দায়িত্ববোধের ঝক্কি যেন কোনোভাবেই চেপে না বসে। বাবু তুতু কর্পোরেট জেনারেশন। কর্পোরেট-করিৎকর্মাদের ক্ষেত্রে প্রফেশন্যাল সম্পর্কের বাইরে যে কোনো দায়িত্ব উটকো ঝামেলার মত। তার নিজের যে মেজাজ, যে টেম্পারামেন্ট তাতে তিনি কর্পোরেট-বিশ্বে রাজ করতে পারতেন। এ-এক এমন দুনিয়া যার মধ্যে শুধুই বিজনেস আর বিজনেস। আবেগ বা ওয়েলফেয়ারের ছেনালি নেই। এ এক নির্ভেজাল সেই 'সেফেয়ার': বিজনেসের সঙ্গে মাইণ্ডকে যুঁতে দিয়ে 'মানবিক' করার ফন্দি-ফিকির এর মধ্যে নেই। টোটাল প্রফিট (টোটাল বিজনেস) এখন সর্বত্র এই টোটাল বিজনেসের টোটালিরিয়ানিজম। বেড়ে লিখেছিলেন বুড়ো 'প্রমোদে ঢালিয়া দিমু মন ... ...।'

সেদিন অফিসে এই নিয়েই কথা হচ্ছিল বিমলজ্যোতির সঙ্গে তাঁর সহকারী চক্রবর্তীর। বিমলজ্যোতির ধারণা, চক্রবর্তী সাদা রক্ত, লালরক্ত দু'ধরণের রক্তের অধিকারী। বিমলজ্যোতির নেতৃত্বে চক্রবর্তী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যখন শুল্ক বিভাগীয় সমান্তরাল ব্যবস্থাটি চালায় তখন তাব শরীরে সাদা রক্ত প্রবাহিত হয়। চক্রবর্তী ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও জায়গা জমির মালিক। বিমলজ্যোতির তুলনায় অনেক কম কামিয়েও চক্রবর্তীর সঞ্চয়ের অনুপাত বেশি। সংসারী লোক। দু'দুটো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং-এ সে বেশ ভাল পজিশনে রয়েছে। বিমলজ্যোতি একদিন অফিসে বসে বঙ্গদেশের বুদ্ধদেবের বিভিন্ন নিত্যনতুন কর্মসূচীর প্রশংসা করছিলেন। কিছুক্ষণ পর বিমলজ্যোতি বুঝলেন তাঁর এই কথাগুলো শুনে চক্রবর্তীর

লালরক্ত টগবগ করছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না রক্তের ফিন্‌কি ছুটল, না স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না। সানন্দবাজার পড়লেই বুঝতে পারবেন সমালোচনার নাম করে ওরা বুদ্ধদেবীয় পুঁজিবাদকে কেমন তোল্লা দিয়ে চলেছে। বৃদ্ধদেবেরা এখন বুক ফুলিয়ে বাজার অর্থনীতিবিদ্‌দের বলছেন, তোমরাই এখন আমাদের 'উন্নয়ন'কে সমর্থন করে কলাম লিখবে।

বিমলজ্যোতি চেয়ারে দোল খাচ্ছিলেন। তাঁর মজাও লাগছিল, মেজাজও চড়ছিল। তিনি চক্রবর্তীকে মাঝপথে থামিয়ে বললেন, দেখুন ভাই, বুদ্ধদেব বাস্তব বুদ্ধির মানুষ। আদর্শ ভেঙে খাওয়ার লোক নন। শাসনে থেকে বুদ্ধি দিয়ে যেমনভাবে চলতে হয় লোকটা সেভাবেই চালাচ্ছে। 'জনগণ' ব্যাপারটাকে তিনি আপনাদের মত ফাঁপা মনে করেন না। আমি বলছি—দেখে নেবেন তিনি অনেকগুলো বেনিফিট এনে দেবেন। বেনিফিট মানে বেনিফিট অব আণ্ডারডগস্, বেনিফিট অব অল—এভাবে ভাবলে চলে না। শাসনে থেকে এরকম করে ভাবলে চিলি আলেইন্দের মত হাল হবে। বা ধরুন ওই আপনাদেরই তত্ত্ব অনুযায়ী পারি-কমিউন। অ্যানার্কিস্টদের ব্যাখ্যা আর আপনাদের ব্যাখ্যা তো আলাদা। না কি? বুদ্ধদেবের দল দেরিতে হলেও বাজার আর অর্থনীতি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছে অনেক আগে থেকে। ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ফাইলকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে তো। আজ নয় কাল আপনারাও লাইনে আসবেন নয়তো গোঁয়ার গোবিন্দ হয়েই থেকে যাবেন। বুদ্ধদেব এখন দক্ষভাবে এই পরিবর্তিত চিন্তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দারুণ কাজটা করছেন ... ...।

এসব কথায় চক্রবর্তী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, দারুণ কাজ না ছাই? এটা একটা অরগ্যানাইজড্ লালরং মাখানো লেই 'সেফেয়্যার' নীতি। সব বানিয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে উন্নয়নের নামে। কৃষিজমি থেকে শুরু করে নগর উন্নয়ন সব। দেখবেন কী হাল হয় দেশের। অবশিষ্ট লাল রং অচিরেই গিয়ে গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে যাবে ... ...।

বিমলজ্যোতি কৌতুকের সুরে বলেন, তা যদি হয়ই চক্রবর্তী তাহলে তো আমার আপনারই তো লাভ। কেন বলুন তো মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন? বুদ্ধদেবেরা তো আপনার আমার সুবিধের পরিসরটাই তৈরী করে দিচ্ছেন। তাছাড়া, আপনি যে গলা ফাটিয়ে মরছেন একবারও কি ভেবে দেখেছেন—নিজের চাকরির ক্ষেত্রে যে কারবারগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন, নেতা মন্ত্রীদের ভাগ সমঝে দিয়ে হ্যাংলামো করে বেড়াচ্ছেন, ব্যবসায়ীদের পাইয়ে দিচ্ছেন—তারপর আবার বহুজাতিক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং-এ আছেন—এসব কি বাজার নয়? বানিয়াগিরির লেজুড়বৃত্তি করা নয়? জায়গাটা কেমন জায়গা একবার ভেবে দেখেছেন? নিজে আছেন সবকিছু গুছিয়ে মানিয়ে আর পড়েছেন সুদূর বঙ্গদেশ নিয়ে। এসব কি হিস্টিরিয়া অ্যাটাক?

চক্রবর্তী জানেন বিমলজ্যোতি কেন এবং কোন অবস্থানের সুযোগে আপারহ্যাণ্ড নিচ্ছেন। এরকম প্রায়শই ঘটে। বিমলজ্যোতির মুখে কিছুই আটকায় না।

লোকটাকে কোনোদিন বাগে পেলে হয়। দাঁতে দাঁত ঘষেন চক্রবর্তী। আরও অসংখ্য দিনের মতই সেদিনের জন্য তিনি বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দেন।

বিমলজ্যোতি চক্রবর্তীর অসহায় ফোঁসফোঁসানি ঠিক ধরতে পারেন। মনে মনে বলেন, আছো বাপু তোফা। এটা বুঝতেও পারছ নাড়ির আসল টানটা ব্যক্তিগত মৌজমস্তির সঙ্গেই যুক্ত। তাও নিজেকে ফাঁকি দিয়ে এইসেই ভেবে চলেছ। বোগাস! চক্রবর্তীরাই যে এই ভূতে পাওয়া জেনারেশনের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসা শেষ নাভিশ্বাস সে ব্যাপারে বিমলজ্যোতির কোনো সন্দেহ নেই। এরা ভুষি, র‍্যামনেন্টস।

অত্যন্ত ধীরে পায়চারি করছেন বিমলজ্যোতি। সাধারণত তিনি জোরেই হাঁটেন। আজ আপনা থেকেই এরকম করে হাঁটছেন।

কিংশুকটা এত সুযোগ পেয়েও গা লাগাচ্ছে না কেন?

বি.কম./এম.কম দুটোতেই ভাল করল। এম.বি.এ-তে চমকে দিল। বিমলজ্যোতির ইচ্ছে কিংশুক এম.এন.সি কর্পোরেটের টপ লেভেলে জাঁকিয়ে বসুক। বিমলজ্যোতি সিংহের ছেলে কিংশুক সিংহ যে কিং অব দি কর্পোরেট জাংগল হওয়ার এলেম রাখে সে কথা বিমলজ্যোতির চাইতে বেশি আর কে জানে?

বিমলজ্যোতি আর পায়চারি করার জোর পান না। মাথাটা বেশ ধরেছে। পা-টা আর যেন চলছেই না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হেমন্তের সকাল। পেছনের লনের দিকটা এখনও যথেষ্ট ন্যাড়া। বড়জাতের গাছগুলো এখন ততটা বড় হয়নি যে সূর্যের আলো শরীরে ধরে রাখতে পারে। আলোয় তাপ তেমন নেই কিন্তু সহ্য হচ্ছে না। বিমলজ্যোতি পেছনের লনটা চোখ মেলে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করেন। চোখ জ্বালা করছে। টেনিস কোর্ট, বিভিন্ন জাতের ছোটবড় হেজ, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, কত রকমের সাজানো ফুলের গাছ। কিন্তু কোনো গন্ধ নেই।

সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে বাতাস-মাটি-হাওয়া মিলেমিশে পুরানো দিনের সেই হেমন্তের গন্ধই নাকে লাগছে। বাংলো বাড়িটায় সমস্তটা পিঠ ছেয়ে সূর্যের আলো এলিয়ে পড়েছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। বাংলার রং গাঢ় নীল আর হালকা নীলের কনট্রাস্ট। বিমলজ্যোতির পছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ কি নীর রঙ পছন্দ করতেন?

বিমলজ্যোতির আর সহ্য হচ্ছে না। একটু জিরোতে হবে। ধীরপায়ে হেঁটে তিনি বাংলোর সামনে দিকে সেই অগোছালো অবিন্যস্ত গাছপালা ঝোপঝাড়ের সামনে চলে আসেন। হালকা হাওয়ায় সেই দোলনাটা দুলছে। তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে : আয়, আয়, এখানে এসে বোস। শান্তি চাই তো এখানে আয়।

এরকম কোনোদিনও হয়নি, বিমলজ্যোতির ভেতরে যেন বাঁধভাঙা কান্না গুমরে উঠল।

মনে হল রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নীরেনদা সকলে মিলে একসঙ্গে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। ওদের সুরের প্রতিধ্বনি করে পাখিগুলোও তাকে ডাকছে। একটা নাম-না-জানা পতঙ্গ তাঁর শরীরকে ঘিরে নাচতে শুরু করেছে। দোলনাটা সমানে দুলতে দুলতে তাকে ডেকে চলেছে। সূর্যের আলো, গাছের ছায়া, লতার খসে পড়া আঁচল মিলেমিশে আছে এখানে।

বিমলজ্যোতি দোলনার কাছাকাছি এসে পড়েছেন। শরীর মন জুড়ে তাঁর ক্লান্তি, অবসাদ, আর প্রশান্তির বিষণ্ণ সমাবেশ। এই দোলনায় তাঁর কোনোদিনই দোলা হয়নি। তবে কি তিনি জানতেন একদিন না একদিন তাঁকে এই দোলনায় দুলতে হবেই? নাঃ, সেরকম কিছু ভেবেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

'টুই-ই টুই-ই' করে একটা পাখি একটানা করুণ শিস দিয়ে চলেছে। কোন গাছের কোন ডাল থেকে ডাকছে পাখিটা? বিমলজ্যোতি পাখিটাকে দেখতে পান না। এটা কি ভোম্বল সর্দারের দেখা কোনো পাখি তাকে 'আয়-আয়' বলে কাছে ডাকছে?

বিমলজ্যোতি অনেক কসরৎ করে দোলনায় উঠে বসেন। বসার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটা যেন জুড়িয় যায় তাঁর। আঃ। চোখে রাজ্যের ঘুম আর ক্লান্তি এসে আসর জমিয়েছে। জোর করে দৃষ্টিটা মেলে ধরার চেষ্টা করতে সবকিছু হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসে বিমলজ্যোতির চোখে।

বুকের বাঁদিকটা টনটন করে ওঠে। পাখির ডাক শুনতে পান না। কানের ভেতর শুধু বোঁ-বোঁ শব্দ। বিমলজ্যোতির চোখে অন্ধকার। সর্বশক্তি দিয়ে দোলনার একটা দড়ি দু'হাতে ধরে থাকেন। দোলনাটা একটু জোরে বিশৃঙ্খলভাবে পাক খাওয়ার মত দুলতে থাকে।

কোনোকালে কোথাও পড়া একটা কথা তাঁর আবছাভাবে মনে পড়ে—প্রতিটি গৃহের সঙ্গে শ্মশানের দূরত্ব খুব অল্পই। অথচ এত পরিব্যাপ্ত ব্যবস্থা। এত আড়ম্বর, এত দিগ্‌বিজয়ী জায়গীর!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার ঝাড় আর সোডিয়াম আলো-আঁধারি ছাওয়া ক্লান্ত-ধূসর সেই বাঁকটা পেরোতে চান বিমলকান্তি। শরীরের অতল থেকে একটা বিচ্ছিরি কাতর শব্দ উঠে আসে। বাঁকটা পেরিয়ে কি আছে দেখতেই হবে কমরেড বিমলকে। দোলনাটা এলোমেলোভাবে দুলতে থাকে। দড়ির একদিকে বিমলজ্যোতির মাথাটা হেলে পড়ে। একটা শব্দ রচনা করে দোল খেতে থাকে দোলনাটা।

পরম ভট্টাচার্য

ডেটলাইন লাস্টগেট

লক্ষ্মী ওরাং ছুটছেন। উর্দ্ধনেত্র, পরিত্রাহি। সজ্ঞানে পূর্ণ সুচেতনা লক্ষ্মী ওরাং—ছুটছেন। ছুটছেন পৃথিবীর 'লাস্টগেট' পেরিয়ে। LOST GATE

কৃষ্ণকলি লক্ষ্মী ওরাং, ছুটছেন। পেছন পেছন ছুটছে বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা। রাজধানী Lust gate অভিমুখে জঙ্গি সঙ্গিন উঁচিয়ে বর্ণ-প্রখর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীবের দঙ্গল ধাওয়া করছে আদিমাতা লক্ষ্মী ওরাংকে। মা লক্ষ্মী আদিম জননীর শরীরে ছেলেপুলেরা যে লজ্জা নিবারণী আচ্ছাদন চাপিয়ে দিয়েছিল, উদগ্র রাগের বশে সেই আড়াল তারা প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছে। আদিম জননীর শরীর বরাবর ছেলে ছোকরাদের জঙ্গি সঙ্গিন। ছুটছেন মা জননী, লক্ষ্মী ওরাং। লক্ষ্মী ওরাং ছুটছেন। আদম থেকে আদিম কৃষ্ণকলি। শরীর-শুচিতায় নয়, আবিলতার ডরে রাজধানীর 'Lust gate' পেরিয়ে ছুটছেন লক্ষ্মী ওরাং।

ফুটপাতের পথচারী। ফোর হুইলার, টু হুইলার। দোকান-পাট। বাজার। অফিস। গমগম করছিল স্বাভাবিকতা। শুধু কিছু সময়ের জন্য নাগরিক স্বাভাবিকতার এই আবশ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফ্রিজ হয়ে গিয়েছিল।

না, লক্ষ্মী ওরাং বিবস্ত্র হয়ে ছুটছেন বলে নয়। তাঁর পেছনে যারা ছুটছিল সেই বস্ত্রাবৃতদের ভয়ে।

অধিকার আদায় করতে পাল পাল আদিবাসী রাজধানীতে এসে 'রাজনীতি' হয়ে গিয়েছিলেন। আদিবাসী চা-জনজাতি আর তাদের বেতালা-বেমানান অধিকার রাজধানী লাস্টগেট পয়েন্ট বরাবর এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তখনও তারা জানেন না দ্য গেট ওয়াজ লস্ট। সবসময়ই 'উপরি'-র দশাগ্রস্ত থাকেন এই জুলুসওয়ালারা।

বাপ-ঠাকুরদা, গাঁওবুড়া, পঞ্চায়েত নেতা পাণ্ডা। সবসময়ই উপরি-দশা। মাথা ফাঁকা থাকে না। কোনো-না-কোনো পাণ্ডা থাকেই মাথার ওপর। লাস্টগেট বরাবর এসে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। মাথার ওপর এসে সব দেওতা একসাথে ভর করল। সরকার কথা শুনবে না, দাবি থাকব না তো হৈ হৈ হৈ হামলা বোল।

পৃথিবীর হাজার-হাজার হিতাকাঙ্ক্ষী আন্দোলনের মতো এই জুলুসও 'আত্ম-সমালোচনা' সম্ভাবি এবং হঠকারী হল।

তারপর থেকেই লক্ষ্মী ওরাং-এর ছোটা। ছুটছেন তো ছুটছেনই। তাঁর শরীর থেকে হিঁচড়ে ছিনিয়ে নেওয়া পোশাক সভ্যতার হাতে দোল খাচ্ছে। ছুটছেন লক্ষ্মী ওরাং।

গণতন্ত্র নেই, একনায়কতন্ত্র আছে সে-রকম পৃথিবীর কোনো অখ্যাত বা খ্যাতিবহুল দেশে অথবা কোনো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বেআদবদের রাজপথে প্রখর রোদে নিলডাউন করে বসিয়ে রেখেছে পুলিশ—? সঠিক মনে করতে পারেন না হাজারিকা। রাজধানীর লাস্টগেটে বেআদব আদিবাসীদের কানে হাত দিয়ে বসে থাকার কড়া নির্দেশ দিয়েছিল বর্ণবাদী পুলিশ। দ্য লস্ট গেট। মনোবিদের চেম্বারে বসে হাজারিকা ডাক্তারের ডাকের অপেক্ষায়।

লক্ষ্মী ওরাং ছুটছেন হাজারিকার সমস্ত শরীর মাড়িয়ে। দু-বছর চারবছর কয়েক হাজার বছর ধরে হাজারিকার সর্বস্ব ধেয়ে ছুটছেন লক্ষ্মী ওরাং। ৩২ থেকে ৩৭ ডিগ্রি উত্তাপ। হাজারিকার গায়ে পর পর কাপড়ের আস্তরণ। দেখলে মনে হয় এই বোধ হয় মানুষটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। থেকে থেকেই নিজের শরীর হাতড়াতে থাকেন অস্থিরভাবে।

যেন হঠাই আবিষ্কার করেছেন শরীরে তার কিছুই নেই।

দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরে কবি নামজপ করতে থাকেন হাজারিকা।

বাঁচাও বাঁচাও কবি। টুনুনান্টাং। বাঁচাও লুইত—টুনুনান্টাং।

ছুটছেন লক্ষ্মী ওরাং।

রাজধানীর লাস্টগেট। প্রত্যাশার শেষ প্রবেশপথ। ছুটছেন লক্ষ্মী ওরাং। দ্য গেট ইজ Lustful।

LAST BUT LOST.

জলপাই রঙের প্রিয় জিপসিটা মাঝপথেই থামিয়ে দেন হাজারিকা। পরিণীতা অবাক হয়ে চারদিকটা দেখে নেন। হু-হু করে গাড়িটা চলছিল। জিপসি ভ্যান জোরে চালালে শূন্যে ভাসে। বাতাসের বিপরীতে ছুটে চলা জিপসির ড্রাইভিং সিটে বসা হাজারিকাকে প্রায় চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কথাক'টি বলেছিলেন তিনি। কিন্তু বরাবরই হাজারিকা দু-রকম। হয় ক্লাইমেক্স, নয় অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স। এর মধ্যেই নিজের চোখের জল শুকিয়ে গেছে দেখে অবাকও হন পরিণীতা। চারদিকে তাকিয়ে দেখেন একটি মাত্র গুমটি মতো কালচেপনা চা-বিস্কুটের দোকান।

বিশাল হাইওয়ে। জিপসিটা যেখানে থামল ঠিক তার উল্টোদিকে গুমটি। চোখের কোণটা এখনও ভিজে, এঁটেল। শরতের সন্ধে-বিকেলের সঙ্গমকালটি অতুলনীয়। হাজারিকা তাঁকে অনুসরণ করার ইশারা করে কাঁচাপাকা চুল-দাড়ির অবিন্যস্ততাকে সন্ধে-শরতের বাতাসের কাছে সঁপে দিয়ে হাইওয়ে পেরোচ্ছে। অসাধারণ কষ্ট গচ্ছিত রেখেও তামাম ভুলভুলাইয়া।

সন্তর্পণে হাইওয়ে পেরোন পরিণীতা। তাকিয়ে দেখেন হাজারিকা বিলোল দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছেন। সপ্রতিভ অস্বস্তি নিয়ে পরিণীতা যখন কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন, হাজারিকা আলতো স্তন-চুম্বনের করুণ আনন্দে বলেন, 'সুগন্ধী পাখিলা'! তোমার চুড়িদারটা তো দারুণ। ওড়নাটা আরও সুন্দর। না-ও চা খাও। বিস্কুট খাবে?

পরিণীতা মুখে কিছু না বলে দোকানিদের কাছ থেকে বিস্কুট চেয়ে নিয়ে হাজারিকার কাছে এসে দাঁড়ান। হাজারিকার সিগারেটের এক দলা ছাই জিন্‌সে পড়েছে। বাতাস। একটা ধু-ধু ব্যাপার আছে হাইওয়েতে। দূরে পাহাড় থেকে ইতস্তত কারখানায় ছাওয়া বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত থেকে একটা হাওয়ার দমক। না, নিত্য তুমি যাদের কথা বলেছ তারা তো আছেই। কিন্তু আমার মনে হয় আরেকটু নির্দিষ্ট করে বলা ভাল। ভদ্র গোল গোল, তীক্ষ্ণধী ভাল মানুষগুলোর কথা। সংস্কৃতিজীবি, বুদ্ধিজীবি, পুলিশ, সেনা, সন্ত্রাসবাদী, আদর্শবাদী, প্রকল্পবাদী শিক্ষক আমলাদের কথা। লক্ষ্মী ওরাং-এর পেছনে ধাওয়া করছে এরা সকলে। সর্বশক্তি-যুক্তি দিয়ে ধাওয়া করেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওই দঙ্গলে ছিলেন না আমার কবি। আমার কবি নিত্য, তুমি জানো। যে কবি কবিতার লাইনের কবি নন, কাব্যগ্রন্থের নন, সাজানো নন, সরেস নন—। মন জ্যোৎস্নার ছবি আঁকেন যিনি, যিনি সব পাপে নীলকণ্ঠ, যিনি উৎসবের জৌলুসে ম্রিয়মাণ থেকে মনকে প্রসারিত করে দেন মনের ওপারে। আমার সেই কবি শুধু ওই দঙ্গলে ছিলেন না সেদিন।

আমি আর বসু দু'জনেই হেঁটে আসছি। জিপসিটা সেদিন ওয়ার্কশপে। অফিস যাব। অটো স্ট্যাণ্ডে যাচ্ছি।

অটো স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌছতে পারিনি, একটা শব্দ না একটা গরম হাওয়ার ধাক্কা গায়ে এসে লাগল। মুহূর্তের জন্য থমকে গেলাম। হুটোপুটি-ছুটোছুটি কাছাকাছি চলে আসতেই সম্বিৎ ফিরে এল। কিছু বুঝে ওঠার চেষ্টা নয়, পরিবেশটাই তখন 'ভাগ্‌, ভাগ্‌ শালা' আওয়াজ দিয়েছে। তখন মানুষ নামক জীবটির গাত্রবর্ণ জাতধর্ম কিছুই আলাদা করে বোঝা যাচ্ছিল না। যে-যেমন পারে পরিস্থিতির ধাতানি খেয়ে পালাচ্ছিল।

অজানা ভয়ে তখনও এলোপাথারি ছুটোছুটি করছে জনতা। ধাতস্থ হয়ে জাতেবর্ণে ভাগাভাগির বাকি আছে। বসু টানতে টানতে আমাকে নিয়ে ঢোকালো একটা শাটার ওয়ালা দোকানের ভেতর। আতঙ্কে গাদাগাদি জনা পঞ্চাশ নারীপুরুষ। বাইরে কী-সব চলছে তা দেখার জন্য দোকানের লোহার পুরু ওয়েভ শাটারের একটি মাত্র ছিদ্রে কয়েকজোড়া ত্রাশতাড়িত

কৌতূহলী চোখ। হঠাৎ জনৈকা মহিলা মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। বিচিত্র ভয়াবহ গোঙানি। উল্টে দিয়েছেন চোখ। সঙ্গের বাচ্চা মেয়েটি পরিত্রাহি কান্না জুড়ে দিয়েছে। সে কান্না শুনে আরও কয়েকটি বাচ্চাও কাঁদছে। বাইরের সমস্ত রাস্তা এলাকা জুড়ে তুমুল কিছু একটা চলছে। ষাঁড়ের মতো ঘোঁত ঘোঁত আর কুকুরকে মহানন্দে প্যাঁদানি দিলে যে তীক্ষ্ণ প্রাণবিদারী কুঁই-কুঁই ধ্বনি ওঠে তেমনি শব্দ। লক্ষ্মী ওরাং তখনও লক্ষ্মী ওরাং হননি। আদিবাসী যুবক-যুবতীর ছোপ ছোপ ভাগুগুলোর কোনো একটির একজন তিনি। তিনি এবং তাঁর সঙ্গের কেউই জানেন না পত্র-পত্রিকা-রাজনীতি-নেতা বগেরা লক্ষ্মী ওরাং নিয়ে লাচবে আগামী ক'টা দিন। ভোটে দাঁড়াবেন লক্ষ্মী ওরাং।

লক্ষ্মী ওরাং-এর গায়ে তখনও পোশাক। এলোপাথারি মারটা তখন চলছে সেই বজ্জাতদের ওপর যে কুলির বাচ্চারা চড়েছে তাদেরই মাথায়, সমাজের-ই যারা মাথা। লক্ষ্মী ওরাং এবং সঙ্গের আরও অসংখ্য কামিনরা তখনও বস্ত্রাবৃতা। কোথা দিয়ে কোথায় পালাবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

আক্রমণটা ছড়ানো, ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত হলেও বৃত্তাকার চক্রাপাক খেতে খেতে কানুনি ক্রেতায় এগিয়ে আসছে, ঘিরে ফেলছে অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো।

পরিণীতা সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেললেন দূরে নালায়। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন আগুনটা নিভেছে কি না। ধীর পায়ে দুলতে দুলতে হাজাবিকার খুব কাছে এসে চোখে চোখ রেখে বললেন, আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে আনন্দ। বাবার কথা। এমই সেকশনের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদেব মারধোর করা ধাতে সইত না তাঁর। বাবার মধ্যে দুটো জিনিসের অপরূপ মিশ্রণ ছিল যা আমি আমার পরিচিতি বৃত্তে আর দেখিনি। একই সঙ্গে সুবুদ্ধি আর সারল্য। বাবার কোমল স্বভাব, বিনয় ও সারল্য নিয়ে 'সামাজিক চালাক মানুষদের' নির্বোধ মস্করা চলতেই থাকত। বাবা সে-সব বুঝে খুব মজা পেতেন। আমাদের বোঝাবার জন্যে অন্যভাবে গল্প করতেন। একদিন বোধ হয় স্কুলের অতি নির্বোদ কোনো ছাত্র বাবার অদৃশ্য মাত্রাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাবার জীবনের একমাত্র এবং সবচেয়ে কঠিনতম শাস্তি পেয়েছিল সেদিন সেই ছাত্রটি। জুলপিতে ধরে একটা টান। থরথর করে কাঁপছিলেন বাবা। ছল ছল করছিল চোখ। ঘটনার পর ওই 'শাস্তি' নিয়ে বাবা কোনো অনুশোচনা করেননি ঠিকই, কিন্তু কেন তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন, কেন তিনি অল্প সময়ের জন্য ছাত্রের জুলফি টেনে 'নৃশংস হতে বাধ্য হয়েছিলেন'—তার ব্যাখ্যা ও যুক্তি দিয়ে গেছেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। আমরা বুঝতাম বাবার মতো একজন স্বাভাবিক সংবেদনশীল মানুষ নিজের বিচ্যুতি-কে ভুলতে না পেরে অন্য যুক্তি দিয়ে নিজের কৃতকর্মের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। এক ধরণের নৈতিক সমর্থন চাওয়ার মতই ব্যাপার। নিজের কাছে যা অনুচিত কাজ—সেরকম কাজের ন্যায্যতা খোঁজা। আনন্দ, বাবার মতো একজন মানুষ যদি 'অপকর্মে'র নৈতিক সমর্থন খোঁজার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন, তাহলে অপরাধপ্রবণ, প্রতিহিংসাপরাণ দুর্বৃত্তমনস্ক আস্ত একটা হীনমন্য সমাজ নিপীড়ন-আগ্রাসনের নৈতিক সমর্থনে

দাঁড়াবে না।

বস্ত্রাবৃতা লক্ষ্মী ওরাং-কে বিবস্ত্র করার আগে থেকেই তিনি ছুটছিলেন। গণ-উন্মাদনার মাঝখানে পড়লে একটা সময় একা হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকেই তখন হাজার মাথার হিসেবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ একক সত্তা। যারা ধাওয়া করে, পক্ষান্তরে তারা তখন একাই একশোজন। যারা তাড়া খায় তারা ছিটকে ছিটকে যায়, দলচ্যুত হতে থাকে।

বসু ও হাজারিকা যেখানে আত্মগোপন করেছিলেন তার খুব কাছাকাছি দূরত্বে লক্ষ্মী ওরাং-কে জাতপ্রেমী বেজা বিদ্বেষীরা বিবস্ত্র করেছিল। কিছুই দেখতে পাননি হাজারিকা। রাজধানীর Lust Gate-এ বিকৃত শীৎকারে চোখের সামনে বিবস্ত্র হচ্ছিল সভ্যতা। সর্বগ্রাসী ত্রাস আর লজ্জার মিলিত প্রহার সোচ্চাব ছিল বাতাসের আর্তনাদে। বসু কিছুতেই হাজারিকাকে হাতছড়া করবেন না। শক্ত করে ধরে আছেন হাত। চোখে ব্যাকুল মিনতি। ইচ্ছে করলেই হাত ছাড়িয়ে অকুস্থলে ছুটে যেতে পারতেন হাজারিকা। স্ব-জাতির লোকেরা যখন স্বজাত্যাভিমানী হয়ে গণ পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন ভিন্নমতের স্ব-জাতিকে তাদের শত্রুজাতের থেকেও অসহ্য ঠেকে। সাহস দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেননি হাজারিকা। চোখকে আড়ালে রেখেও রেহাই পাননি। আদিবাসী মেয়ের লক্ষ্মী ওরাং ততক্ষণে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়েছেন। ছুটছেন পাগলিনীর মতো। পেছন পেছন ছুটছে দলা দলা প্রতিহিংসার বীভৎস লালসা।

ডাকাত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী অথবা জাত-ধর্ম-শ্রেণী দাঙ্গাবাজিতে মহার্ঘ্য অস্ত্র হিসেবে উঁচিয়ে ধরা হয় ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গিন পুরুষাঙ্গ। সেইরকম একদঙ্গল তীক্ষ্ণ সুঁচলো সঙ্গিন তখন লক্ষী ওরাংদের পিছু ধাওয়া করছে আর ছুটছেন লক্ষ্মী ওরাং প্রাণের অবশিষ্ট বোধ বুকে নিয়ে, আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ফিরিয়ে নিতে নিতে।

সবচাইতে লাগসই যুক্তিটা দিয়েছিলেন হাজরিকার পরিচিত ব্যাঙ্ক অফিসার। আদিবাসী চা-জনজাতিরা তাঁদের অধিকার দাবি করতেই পারেন। শুধু এ-রাজ্যে নয়, দুনিয়ার সকল রাজ্যেই 'আদিবাসী'-রা আদিবাসী। হ্যাঁ, আদিবাসীদের রাগও হতে পারে। সে-দিন তাদের খুব মাথা গরম করা ছিল। হাম্‌লা বোল্, মাথা গরম। তা আন্দোলন করবি, দাবি আদায় করবি, শাসকের টনক নড়াবি। নড়া। তাই মাথা গরম করে পাবলিকের গাড়িতে দোকানে হামলা বুলিয়ে দিয়ে পার পেয়ে যাবি ভেবেছিলি?

ব্যাঙ্ক অফিসার বন্ধুটির সঙ্গিনও সহসা উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছে। লোকটার পাতলা চাপা ঠোঁট। অসম্ভব তুখোড় চেহারা। চোখদুটো খিঁচিয়ে উঠেছে ক্রোধে আর উল্লাসে। কোথায় যাবেন? তবু লক্ষ্মী ওরাং এবং আরো মা-লক্ষ্মী মেয়ে তাবৎ আদিবাসী লক্ষ্মীমতিরা ছুটছেন উর্দ্ধনেত্রে।

ব্যাঙ্ক অফিসারের প্রশ্ন, হাজরিকা, তুমি কি মনে করো, তুমি কি প্রত্যাশা করো সাধারণ মানুষ গান্ধী?

তোরা তোদের দাবি জানাবি, জুলুম করবি, সদর দপ্তরে হামলা করবি কর—কিন্তু পাবলিক প্রপার্টিতে হাত দিবি কেন? ইউ কান্ট এক্সপেক্ট হেভেন। পাব্লিক রিঅ্যাক্ট করবেই। মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে থাকে পাবলিকের। দৈনন্দিন কত হুজ্জোত।

দু-এক পিস সাহস করে এগিয়ে এলেই শুরু হয়ে যায় রামকেলানির কীর্তন ... ...।

হাজারিকা এক চুমুকে গ্লাসের অবশিষ্ট মদ চোঁ-টানে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, বুদ্ধিজীবি থেকে শুরু করে বাপ-মা-বউ, বাড়ির কাজের লোক, মার্কসবাদী, জাতীয়তাবাদী, মরমী সঙ্গীত প্রেমী সেই ছোটবেলা থেকে বড়বেলা সকলেই বলেছেন ভেবেছেন একটাই কথা—আমি কাঁহাতক সহ্য করব? কাঁহাতক? আমাকে উত্যক্ত করা হলে কাঁহাতক সহ্য করব? কাঁচের সেন্টার টেবিলে হাতের গ্লাসটা চ্যালেঞ্জিং মেজাজে রেখে ব্যাঙ্ক অফিসার বললেন, এগজ্যাক্টলি কাঁহাতক? কিস হদ্ তক্? ইউ কান্ট এক্সপেক্ট গান্ধী। দিস ইজ সামথিং ইমপোসিবল। পড়াশোনা না করলে কথা না-শুনলে বাচ্চাকে পেটাচ্ছি, কোনো কাস্টমার বেশি বেগড়বাই করলে কায়দা করে টাইট দিলে প্রতিশোধ নিচ্ছি, আমাদের প্র্যাকটিসই বদলা নেওয়া। ইউ কান্ট ... ...।

গান্ধী যদি অসম্ভব কিছু হোন তাহলে ভুলভুলাইয়ার সংস্কৃতি উৎসব মানে কী? কবিতার আসর, বিবাহের বাসর, পুরস্কার, সম্মান?

অফিস যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন হাজারিকা। নাটকের বিষয় নিয়ে বাইরের ঘরে সকাল থেকেই তুলিকা আর তার বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা-বিতর্ক চলছে। প্রশ্নটা করেছে জিতুল বলে একটা ছেলে। খুবই উত্তেজিত আলোচনা।

'গান্ধী মানে ভুলভুলাইয়ার সংস্কৃতি উৎসব'—এই বাক্যটা সংলাপে রাখতেই হবে। এটা একটা ইন্টারেস্টিং মিস ইন্টারপ্রিটেশন। হাজারিকার মেয়ে তুলিকা।

সংগীত নামে অন্য আরেকটি ছেলে বলে, এটা একটা প্যারাডক্সও। অহিংস চর্চা ও সহনশীলতার জন্যই গান্ধী প্রসঙ্গ আসছে—। আবার সর্বংসহা অতিসহনশীল মানুষের প্রসঙ্গেও গান্ধীর রেফারেন্স। না প্যারাডক্সও নয়। আমরা আক্রমণের ক্ষেত্রে সক্রিয় আর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়—বাবার ঘটনা থেকে আমার সে-রকমই মনে হয়েছে। বাবা বার বারই বলেছে যে ইচ্ছে করলেই বোস আঙ্কলের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে পারত অকুস্থলে। কিন্তু যায়নি। পারেনি। সাহসে কুলোয়নি। এই স্বীকারোক্তি আমাদের নাটকের সম্পদ।

এক ভয়ংকর অপরাধবোধেই আঙ্কল চোখ খুললেই যত্রতত্র লক্ষ্মী ওরাং-এর ছুটে যাওয়া দেখতে পান ... ...। জিতুলের কথাটা শেষ হতে না হতেই তুলিকা প্রতিবাদ জানায়—না, কোনো অপরাধবোধ থেকে নয়। আমি জানি কোনো অপরাধবোধ থেকে নয়। মানুষের পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক এই উপলব্ধিই বাবাকে নিজের কাছে ভ্রষ্ট করেছে। বাবা নিজেই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেছে। কাউন্সেলিং করিয়েছে। কাউকে নিয়ে যেতে হয়নি।

ডাক্তাররাও হাল ছেড়েছে।

লক্ষ্মী ওরাং বিবস্ত্র হয়ে উর্দ্ধনেত্রে উন্মাদিনীর মতো ছুটছেন—প্রতিটি সংবাদপত্রের ফ্রন্টপেজ পর পর কয়েকদিন দখল করল এই ছবি। টেলিভিশনের সেই স্টিল কাট। বসুই বলেছিল, চলো হাজরিকা, একটা সমীক্ষা করি। তোমার প্রিয় জলপাই জিপসিটা ম্যানেজ করো। সকাল ৯টার মধ্যেই সমীক্ষা হয়ে যাবে।

আঠারোটি স্টল ও এজেন্সিতে সমীক্ষা চালিয়ে ফল প্রকাশে সময় লাগল সাকুল্যে চারঘন্টা। অফিসে বসেই হিসেব।

হট নিউজ শুধু নয়, হট ছবির জন্যও দশদিনের বিক্রি চতুর্গুণ। শুধু কিছু আত্মাভিমানী জাত্যাভিমানী জায়গা থেকে জাতের এমন 'বেধড়ক বদনাম' নিয়ে ব্যবসা করতে সমালোচনা করা হয়েছে, সাবধানবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। এজেন্সির কর্মচারী, মালিকরা পরোক্ষে এসব খবর পেয়েছেন। তবে জাতভাষাধর্মশ্রেণী নির্বিশেষে অগুণতি পাঠক লক্ষ্মী ওরাং-এর দেহবল্লরী উপভোগে সামিল হয়েছিলেন—এই স্বীকারোক্তি বিভিন্ন এজেন্সির।

হাজরিকা বসুকে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে বলেছলেন, লক্ষ্মী ওরাংদের পেছন উলঙ্গ হয়ে দৌড়েছে এমন লোকেব সারিতে তুমি আমিও আছি বোস।

জাতের আহ্লাদ-আহাম্মকি ভুলে নিজস্ব রিফ্লেক্সে এক তরুণ সেদিন লক্ষ্মী ওরাং-এর লজ্জা ঢাকতে এগিয়ে এসেছিলেন। নিজের গায়ের জামাটি খুলে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মী ওরাংকে।

হাজার লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে এই ঘটনা ব্যতিক্রম বলেই হাজরিকা তা পুনরুচ্চারণের সাহস পান না। পাছে কেউ এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে নিয়ম ভেবে ভরসা করে ফেলে এই ভয়ে। তুলিকাদের যৌথ নাট্য শুরুই হচ্ছে ওই দৃশ্য দিয়ে। মানুষের বিপদে মানুষের এগিয়ে আসার দৃশ্য। এক ব্যক্তির প্রবণতাকে মানুষের ভালর জন্য সাধারণীকৃত করা হয়েছে নাটকে। ওই ব্যক্তিটির প্রবণতা আগামীদিনে হাজার মানুষের মধ্যে চারিয়ে গেছে এমনই বার্তা তুলিকাদের যৌথ পাণ্ডুলিপির নাটকে : রিহার্সাল শুরু হবে আগামী সপ্তাহে। ডিসেম্বরের ভেতরেই মঞ্চস্থ হবে নাটক।

হাজারিকা ও পরিণীতার ছেলে রুদ্র গ্যাংটক থেকে ফিরে এসেছে। শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। পরের দিন রাতে পরিণীতা ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোরা পড়াশুনো করতে গেছিস। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের ছেলেমেয়েরা একটা উদ্দেশ্যে ওখানে গেছিস। পড়াশুনো ছাড়া বড়জোর আড্ডা, মদ, প্রেম, সিগারেট এসব হতে পারে। তোদের মধ্যে রাজ্য-ভাষা, ধর্ম এসব কী করে আসে?

সকলে একসঙ্গে বসে রাতের খাওয়া খাচ্ছিলেন। তুলিকা পরিণীতার চোখে চোখ রেখে